

মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা

ড. মোঃ আনোয়ারুল হক
এম শফিউল্লাহ
মোঃ নাজিম উদ্দিন
ড. সত্যব্রত রায়
ড. ক্ষণদা মোহন দাস

সম্পাদনা

ড. হাফেজ আহমেদ
মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন
জাহান আফরোজ বেগম হাবিবা
ড. মোঃ সিরাজুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচুদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুবীজ্ঞ ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই মানবিক ও ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীরা যাতে বিজ্ঞানের জীবন ঘনিষ্ঠ ও জনপ্রিয় বিষয়সমূহ সহজে জানতে ও বুঝতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান বইটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে সাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	বিজ্ঞান জগৎ	১
দ্বিতীয়	জনসংখ্যা ও পরিবেশ	৮
তৃতীয়	পুষ্টি, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস	২৪
চতুর্থ	খনিজ পদার্থ	৩৬
পঞ্চম	গৃহ নির্মাণ সামগ্রী	৪৪
ষষ্ঠ	শক্তি	৫৬
সপ্তম	জ্বালানি	৬০
অষ্টম	জীবের কৌশিক গঠন ও প্রকৃতি	৭০
নবম	উদ্ভিদের বিভিন্নতা	৭৯
দশম	উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	৮৯
একাদশ	প্রাণীর বিভিন্নতা	১২২
দ্বাদশ	মানব দেহ বৈচিত্র্য	১৩৮
ত্রয়োদশ	শব্দের কথা	১৬৯
চতুর্দশ	বিদ্যুৎ শক্তি ও গৃহে বিদ্যুতের ব্যবহার	১৭৫
পঞ্চদশ	সংবাদ আদান-প্রদান	১৯২
ষোড়শ	পরিষ্কারক সামগ্রী	২০৪
সপ্তদশ	প্রসাধনী সামগ্রী	২১১
অষ্টাদশ	তত্ত্ব ও বস্তু	২২২
উনবিংশ	রঞ্জক সমগ্রী	২৩৩
বিংশ	বাস্তুসংস্থান	২৩৭
একবিংশ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ	২৪৯

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞান জগৎ

মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা লাভ করেছি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের বিপুল ক্ষমতা। সবার জন্য প্রচুর খাবার আবাসগৃহ ও দীর্ঘ সুস্থ জীবন অর্জন করা এখন সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞান দিয়েছে নানা ধরনের নতুন নতুন সামগ্রী, অভিনব সব শক্তির উৎসের সন্ধান এবং স্থাপন করেছে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির বিচিত্র উদ্ভাবনের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির কয়েকটি বিস্ময়কর উদ্ভাবন হচ্ছে—কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাশূন্যযান; কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন ও জিন প্রযুক্তি; ট্রানজিস্টার ও কম্পিউটার; পারমাণবিক শক্তি ও সৌরশক্তির আধুনিক ব্যবহার।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

আমাদের আশেপাশের জীব ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত যে বিশেষ জ্ঞান মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে তাকে আমরা বিজ্ঞান নামে অভিহিত করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতের অজানা রহস্য সম্পর্কিত সুসংবদ্ধ জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান।

আমরা অনেকেই আমাদের চারদিকের পরিবেশের বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ অহরহ পর্যবেক্ষণ করে থাকি। কিন্তু সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা এসব ঘটনা শুধু পর্যবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হন না। এঁরা প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সব ঘটনা কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল এসব ব্যক্তিবর্গকে আমরা বিজ্ঞানী বলি। উদারতা, বিনয়, সত্যানুসন্ধানে আপোষহীন মনোভাব, সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি মানবপ্রেম বিজ্ঞানীদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব সেবায় এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অগণিত মানুষ বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী। তাই এঁরা আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি

বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা সমাধান করেন তাকে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম গাণিতিক যুক্তি, গভীর বিশ্লেষণ, যত্ন উদ্ভাবন নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি জটিল কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিজ্ঞানীরা এ ধাপগুলো মেনে চলেন। পাশাপাশি আমরা এটাও লক্ষ করি যে, কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের আশায় একজন সাধারণ মানুষও অনেক সময় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ একজন উদ্যোগী কৃষকের কথা ধরা যাক।

কৃষক তাঁর জমিতে বোরো ধানের ফলন বাড়াতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যায় পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন সবগুলো সমস্যার সমাধান একবারে করা সম্ভব নয়। তাই তিনি একটি সমস্যা চিহ্নিত করে কাজ শুরু করলেন। তাঁর চিহ্নিত প্রথম সমস্যাটি ছিল কীভাবে ফলন বাড়ানো যায়।

কাজ শুরু করার আগেই সমস্যা চিহ্নিত করাকে বলা হয় ‘সমস্যা নির্দিষ্টকরণ’। সমস্যা নির্দিষ্ট করার পর কৃষকের মনে দুটি প্রশ্ন দেখা দিল—

– জমিতে সার দিলে ধানের ফলন বাড়ে কি?

– জমিতে বেশি সার দিলে ধানের ফলন বেশি হয় কি?

এ সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে কৃষক ধান চাষের একটি প্রদর্শনী খামার দেখতে গেলেন। সেখানে তিনি জানলেন জমিতে সার প্রয়োগ করলে ধানের ফলন বাড়ে। এ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ কয়েকজন কৃষকের সংক্ষেপে আলাপ করে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলেন। কোনো সমস্যা সম্পর্কে এভাবে খবরাখবর যোগাড় করাকে বলা হয় ‘তথ্য সংগ্রহ’।

কৃষক তাঁর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন–

– জমিতে সার দিলে ফলন বাড়ে।

– জমিতে সার বেশি পরিমাণে দিলে ফলন বেশি হয়।

এভাবে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই বলা হয় ‘আনুমানিক সিদ্ধান্ত’ বা ‘অনুকল্প’।

কৃষক তাঁর অনুকল্পের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা পরিচালনার পরিকল্পনা করলেন। এজন্য তিনি একই রকম এবং কাছাকাছি একই মাপের তিন খন্ড জমি নির্বাচন করে একইভাবে চাষের জন্য প্রস্তুত করলেন। প্রতি খন্ড জমিতে তিনি একই সময়ে একই বীজ ব্যবহার করে ধান বুনলেন। তিনটি জমির একই রকম পরিচর্যা করে একই সময়ে ফসল কাটলেন।

তিনি পরীক্ষণটি নিম্নরূপে সম্পাদন করেছিলেন এবং নিম্নে বর্ণিত ফলাফল পেয়েছিলেন :

১ম খন্ড জমিতে কৃষক এক বস্তা সার প্রয়োগ করে অনেক বেশি ধান পেলেন।

২য় খন্ড জমিতে কৃষক অর্ধবস্তা সার দিয়ে প্রায় একই পরিমাণ ধান পেলেন।

৩য় খন্ড জমিতে তিনি কোনো সার দিলেন না। এ জমিতে ধান অনেক কম পেলেন। এ পরীক্ষণ থেকে তিনি অনুধাবন করলেন যে সার দিলে ফলন বাড়ে। কাজেই তাঁর প্রথম অনুকল্পটি সঠিক।

বেশি সার দিলে ফলন বেশি হবে এ ধারণা ঠিক নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং তাঁর দ্বিতীয় অনুকল্পটি ঠিক নয়।

তৃতীয় খন্ড জমিতে কৃষক যে পরীক্ষণ করেছিলেন তাকে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ বলে। কেননা এ জমিতে কোনো সার ব্যবহার না করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছিল, পরীক্ষার ফলাফল তুলনা করার জন্য।

কৃষক পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অনুকল্প গ্রহণ, বর্জন বা সংশোধন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ থেকে পরিষ্কার হল যে, উদ্যোগী কৃষক একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কী পরিমাণ জমিতে ঠিক কত পরিমাণ সার একটি বিশেষ ঋতুতে বোরো ধানের জন্য প্রয়োজন। সমস্যা শনাক্তকরণের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা মন নিয়ে কৃষক একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন। এটি ছিল একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি কেননা তিনি সচেতনভাবে সমস্যা চিহ্নিত করেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন, অনুকল্প স্থির করেছেন, পরীক্ষণ/পরীক্ষা করেছেন, ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব

বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সকল জাতি সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য। অনু, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প–কলকারখানা, যাতায়াত ও পরিবহণ, যোগাযোগ ও তথ্যের আদান–প্রদান, তথ্য–ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণ, মহাকাশ–গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সভ্যতার ক্রমোন্নতি বিধানের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এসব ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্যের ফলেই আজ প্রকৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বিশাল জনসমষ্টি টিকিয়ে রাখা এবং অজানা ভবিষ্যতের মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞানের নতুন নতুন সফলতা ঘটাতে হবে। এখানে বিগত কয়েক শতকের বিজ্ঞানের সফলতার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল:

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও অন্যান্য নানা ধরনের কল বা মেশিনের সহায়তায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শিল্পের এই নবযুগকে বলা হয় শিল্প বিপ্লবের যুগ। উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার ফলে মালামাল সর্বত্র বণ্টন সম্ভব হয়। এতে জিনিসপত্রের চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যায়। এ চাহিদার মোকাবিলার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানে বিকাশ লাভ করে পরমাণু তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্ব।

আকাশ ভ্রমণ, মহাশূন্য ভ্রমণ, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার এবং বিচিত্র ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি মানব সভ্যতার জন্য নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে। মহাশূন্য সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। চাঁদে মানুষের পদার্পণ ঘটে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে রকেট ছোটে। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে।

ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ, সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে উঠছে।

নতুন ও উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন, পেনিসিলিন আবিষ্কার, প্রচলিত ওষুধের উন্নতিসাধন করা, কীট ও ছত্রাকনাশক ওষুধ তৈরি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনন, প্রতিষেধক তৈরির কাজে অনুজীবের ব্যবহার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-করণে নতুন কৌশল প্রয়োগ সবই বিজ্ঞানের দান।

আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে কৃষি কাজের জন্য কলের লাঙল, পানি সেচের জন্য সেচযন্ত্র, ওষুধ ও কীটনাশক ছিটানোর স্প্রে-মেশিন, এমন আরও অনেক কিছু। এভাবেই উদ্যানতত্ত্ব, পশুপালন, রেশম চাষ, মৌমাছি চাষ, মৌমাছি পালন, লাঙ্গা চাষ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে।

প্রাণ রসায়নবিদ্যার উৎকর্ষের ফলে জীব কোষের রাসায়নিক গঠন ও কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান তথা কোষতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে ক্যান্সার নিরাময়ের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

জিনতত্ত্বের সাহায্যে জীবের বংশধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে, এর ভিত্তিতে উন্নত জাতের ধান ও পাট উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

শস্য ও পশু সম্পদের উন্নতির মূলে রয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও জীব নির্বাচন এবং তাদের বংশ বিস্তার ঘটানো। এর ফলে উত্তম খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

গো-সম্পদ উন্নয়নের ফলে দেশি ও বিদেশি পশুর সমন্বয়ে উন্নত জাতের গবাদিপশু উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে যা প্রতিকূল অবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে।

সুতরাং জড় ও জীব জগৎ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে, দেশকে ফসলের প্রাচুর্যে ভরে তুলতে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমাণু লাভের মানসে তরুণদের আরও বেশি করে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে।

সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার চলে আসছে। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার কখনও প্রয়োজন, কখনও অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য আবার কখনওবা আকস্মিকভাবে ঘটেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ কাঁচা মাংস খেত এবং কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কালক্রমে আগুনের আবিষ্কার ঘটে এবং মানুষ রান্না করা খাবার খেতে শেখে। সুতা ও কাপড় আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ গাছের পাতা ও বাকল দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে শেখে। পাথর, লৌহ ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহারও পরবর্তী যুগে শুরু হয়। যখন ভোঁতা পাথরকে শানদিয়ে ধারালো অস্ত্র বানানো সম্ভব হল তখন থেকে শুরুর হল প্রযুক্তির ব্যবহার।

আজকাল ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ এ দুটি শব্দ বহুল প্রচলিত। বলাবাহুল্য, বর্তমানে যে কোনো দেশ ও জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ব্যবহার। কিন্তু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে পার্থক্য কী?

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন, যেমন করেন একজন পদার্থবিজ্ঞানী, একজন রাসায়নবিজ্ঞানী, একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী বা একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। প্রযুক্তিবিদরা বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন। যেমন- করেন একজন চিকিৎসক বা একজন প্রকৌশলী বা একজন আবহাওয়া বিজ্ঞানী। চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জ্ঞান, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের চিকিৎসা করে থাকেন।

তবুও প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি শুধু মানুষের কল্যাণই করে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ-সাধন করার পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অধিকাংশ সমস্যা সৃষ্টি হয় এগুলোর অপপ্রয়োগের ফলে যার বেশিরভাগই যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব।

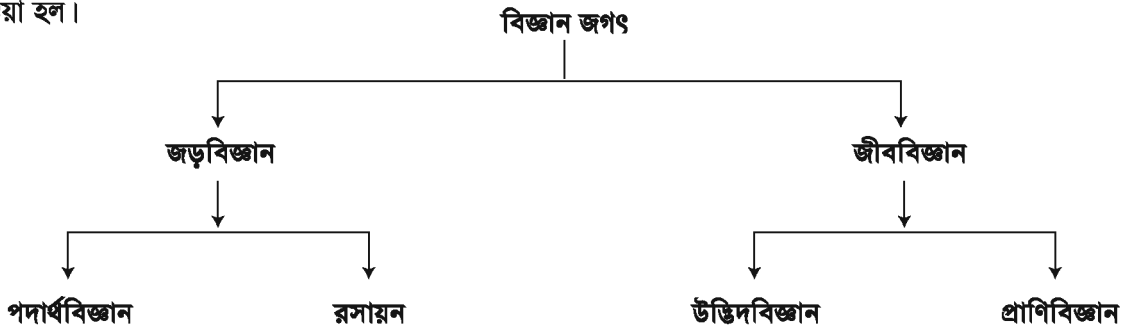
চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে জরাব্যাধি থেকে মানুষ মুক্তি পাচ্ছে, মৃত্যুর কমছে। কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়েনি বলে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, অবিবেচনাপ্রসূত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলেই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর সম্পদ ও শক্তির অপচয় হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আমাদের এ সমস্ত সমস্যা যেন সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে জড় ও জীবনের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের সীমা অনেক বেড়েছে। তাই জ্ঞান অন্বেষণের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় সাজানো হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি প্রধান শাখা-জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান।

জড়বিজ্ঞানে জড়বস্তুর গুণাগুণ, বস্তুর ওপর শক্তির প্রভাব এবং বস্তু ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জড়বস্তু ও শক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা এ শাখার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। জড়বিজ্ঞানের দুটি মৌলিক শাখা-পদার্থবিজ্ঞান ও রাসায়ন। প্রকৃতপক্ষে জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অর্জিত নানাবিধ সফলতা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতি ও বিকাশে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে জীববিজ্ঞান। এটি প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি প্রাচীনতম শাখা। উদ্ভিদ ও প্রাণী হচ্ছে এ শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বিজ্ঞানের অন্য কোনো বিষয় জানার আগে নিজেকে রক্ষার তাগিদে প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই প্রাথমিক জ্ঞানলাভ জীববিজ্ঞান পাঠের মূল উদ্দেশ্য। মানুষসহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন, কার্যপ্রণালি, উৎপত্তি, অভিযোজন, অভিব্যক্তি, বংশগতি প্রভৃতি জীববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। জানার সুবিধার্থে জীববিজ্ঞানকে মৌলিক দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে- উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলোকে ছক আকারে নিচে দেওয়া হল।



বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রাচীনযুগে বিজ্ঞানকে যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা হত তা এখনও চালু আছে। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা যখন কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন তখন তাঁরা কদাচিৎ এ বিভাগগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন। কোষবিজ্ঞানী যখন কোষ সম্পর্কে পরীক্ষা চালান, তখন তিনি উন্নত ধরনের প্রাণরাসায়নিক কৌশল অবলম্বন করেন। পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান একত্রে অধ্যয়ন করলে প্রাণের শক্তি ও গতিপ্রবাহ এবং পরিচালনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যায়। আবার অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে জীববিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

জ্ঞান অন্বেষণের কাজে বিজ্ঞানের এক শাখা অন্য শাখা কিংবা একাধিক শাখা থেকে প্রযুক্তিগত কৌশল গ্রহণ ও প্রয়োগ করে থাকে। এমনকি একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা একটি সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এক যোগে কাজ করে থাকেন।

পরিমাপ যন্ত্র

বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পরিমাপ সঠিক ও নির্ভুল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে শুধু কোনো জিনিসের অস্তিত্ব জানলে হবে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে তার পরিমাণও জানতে হবে। লোকটি বেশ লম্বা, এই বালতির পানি খুব গরম, ট্রেনটি খুব জোরে ছুটছে, ধানের চারাগুলো তেমন বাড়ছে না, এই পাথরটি বেশ ভারী— বিজ্ঞানীদের শুধু এ রকম মোটামুটি বা ভাসা ভাসা কোনো তথ্য জানলে চলবে না। তাই দূরত্ব, ওজন, সময়, তাপমাত্রা প্রভৃতি রাশির পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে জানার জন্য নানা প্রকার পরিমাপ যন্ত্র তৈরি হয়েছে। স্কেল, নিক্তি, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ঘড়ি ইত্যাদি হচ্ছে কয়েকটি পরিমাপ যন্ত্রের উদাহরণ।

পরিমাপের একক ও পদ্ধতি

কোনো কিছু পরিমাপ করতে হলে কোনো বস্তুর বিবেচ্য রাশি যথা দৈর্ঘ্য বা ভরকে যথাক্রমে একটি প্রমিত দৈর্ঘ্য বা প্রমিত ভরের সাথে তুলনা করতে হয়। এই প্রমিত দৈর্ঘ্যকে দৈর্ঘ্যের একক এবং প্রমিত ভরকে ভরের একক বলে।

যে সব ধরনের রাশি নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজ করতে হয় তার মধ্যে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময় প্রধান। এসব পরিমাপের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। মেট্রিক পদ্ধতির সুবিধা হল দশমিক ভিত্তিতে এসব হিসেব করা যায়। এ সুবিধার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সাধারণ কাজকর্মেও আজকাল এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড (M.K.S) ও সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড (C.G.S) এ দুই ধরনের একক ব্যবহৃত হয়। সব ধরনের পরিমাপের জন্য M.K.S পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (S.I বা System International) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

দৈর্ঘ্য : দৈর্ঘ্যের একক এস. আই পদ্ধতিতে মিটার। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে “ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস”-এর অফিসে ২৭৩°K (কেলভিন) অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম মিশ্রিত (৯০:১০) সংকর ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের ওপর দুটি নির্দিষ্ট দাগের মাঝের দূরত্বকে ১ মিটার (m) বলা হয়। এক মিটারের এক শতাংশকে এক সেন্টিমিটার (cm) বলা হয়। এক মিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে এক মিলিমিটার (mm) বলে। আবার কিলো (kilo) অর্থ সহস্র গুণ। কাজেই এক হাজার মিটারের সমান এক কিলোমিটার (Km)। এক মাইল প্রায় ১.৬১ কিলোমিটার। মনে করি কোন দণ্ডের দৈর্ঘ্য ২.৫ মিটার। এ কথার অর্থ এই যে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ ১ মিটারের আড়াই গুণ।

ভর : এস. আই পদ্ধতিতে ভরের একক কিলোগ্রাম (Kg)। ফ্রান্সের প্যারিসে ‘ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস’ অফিসে রক্ষিত প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি নিরেট চোঙের ভরকে ভরের আদর্শ একক হিসেবে গণ্য করা হয়। চলতি কথায় একে এক কিলো বা এক কেজি (Kg) বলা হয়। এক কিলোগ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে এক গ্রাম (g) বলা হয়। এক শত কিলোগ্রামে এক কুইন্টাল এবং এক সহস্র কিলোগ্রামে এক মেট্রিক টন হয়। কোন বস্তুর ভর যদি ১০০ কেজি হয় তবে এর অর্থ হল এই যে বস্তুটির ভর একক ভরের অর্থাৎ ১ কেজির ১০০ গুণ।

সময় : এস. আই পদ্ধতিতে সময়ের একক সেকেন্ড। ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট ও ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা। ২৪ ঘণ্টায় এক দিন। প্রাচীন বেবিলনে সময় পরিমাপের এ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।

আয়তন : মেট্রিক পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘনমিটার। এক মিটার দৈর্ঘ্য, এক মিটার প্রস্থ ও এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট বস্তুর আয়তন এক ঘনমিটার। এক ঘনমিটারকে (মিটার)^৩ এভাবেও লেখা যায়। কখনও কখনও ঘন সেন্টিমিটারকেও (অর্থাৎ ১ সে. মি. দৈর্ঘ্য, ১ সে. মি. প্রস্থ, ১ সে. মি. উচ্চতা) আয়তনের এককরূপে ব্যবহার করা হয়। একে (সেন্টিমিটার)^৩ বা (সেমি)^৩ এভাবে লেখা যায়।

তরল পদার্থের আয়তন অনেক সময় লিটার (Litre) এককে প্রকাশ করা হয়। এক লিটার ১০০০ ঘন সেন্টিমিটারের সমান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি MKS পদ্ধতির একক?

- (ক) কিলোগ্রাম
- (খ) গ্রাম
- (গ) সেন্টিমিটার
- (ঘ) মিলিমিটার।

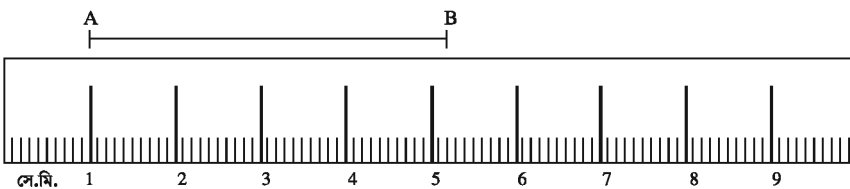
২। বিজ্ঞানের অধিকতর সম্পর্কযুক্ত শাখাগুলো হল

- (i). ইলেকট্রনিক্স, প্রাণরসায়ন ও কোষতত্ত্ব
- (ii). সুপ্রজননবিদ্যা, উদ্যান তত্ত্ব, লাক্ষা চাষ।
- (iii). অনুজীব বিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii | ঘ. ii ও iii |

৩।



A বিন্দু হতে B বিন্দুর দূরত্ব কত মিলিমিটার?

- | | |
|----------|----------|
| ক. ৫৫.৫০ | খ. ৫৫.০০ |
| গ. ৫২.৫০ | ঘ. ৫০.০০ |

৪। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে তুমি নিচের কোন প্রক্রিয়াটি বেছে নিবে?

ক. সমস্যা চিহ্নিত করা → আনুমানিক সিদ্ধান্ত → পরীক্ষণ →
→ ফলাফল → সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খ. সমস্যা চিহ্নিত করা → পরীক্ষণ → আনুমানিক সিদ্ধান্ত →
→ ফলাফল → সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ. সমস্যা চিহ্নিত করা → তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ → আনুমানিক সিদ্ধান্ত
→ পরীক্ষণ ও ফলাফল → সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঘ. সমস্যা চিহ্নিত করা → আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ → তথ্য বিশ্লেষণ →
পরীক্ষণ ও ফলাফল → সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা পেয়েছি বর্তমান সভ্যতা। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং মানব কল্যাণে এর ব্যবহারের ফলে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী, উন্মুক্ত হচ্ছে অভাবনীয় সৃষ্টি রহস্য।

ক. বিজ্ঞান কী?

খ. একজন বিজ্ঞানী এবং একজন প্রযুক্তিবিদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখ।

গ. একজন চিকিৎসক কীভাবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জন্য অপরিহার্য—বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা ও পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

সম্প্রতি বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির ফলে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক পরিবেশসহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে জীব জগতের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কোনো ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আবার কোনো ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক পরিবেশের যেসব বিষয়ের ওপর সরাসরি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে সেগুলো হল :

- (ক) মাটি, বায়ু, গাছপালা ও পানির ওপর প্রভাব
- (খ) প্রাকৃতিক চক্রের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
- (গ) গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া
- (ঘ) দুরারোগ্য রোগ এবং
- (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ সচেতনতার প্রভাব।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাব ফেলছে তার বিবরণ ও আলোচনা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(ক) মাটি, বায়ু, গাছপালা ও পানির ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

১। মাটির ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মাটি পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার। এর বিশেষ গুণ হল পরিত্যক্ত পচনশীল জিনিসকে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিশোধিত করে মাটিতে রূপান্তরিত করা। কিন্তু কোনো স্থানে এরূপ পরিত্যক্ত জিনিসের পরিমাণ মাটির শোধন ক্ষমতার চেয়ে বেশি হলে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধন করা মাটির পক্ষে সম্ভব হয় না। স্থানান্তরে কোথাও ঘনবসতি গড়ে উঠলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিত্যক্ত ময়লা আবর্জনা মাটিতে ভালোভাবে শোষিত না হয়ে জমে থাকার ফলে মাটি দূষিত হয় এবং আশেপাশের বায়ু ও পানি দূষিত করে ফেলে।

২। বায়ুর ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে বায়ুমন্ডলের ওপর। আমরা শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাই বায়ুমন্ডল থেকে। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাড়তি যানবাহন ও শিল্প কারখানায় জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমন্ডল থেকে প্রচুর অক্সিজেন খরচ হচ্ছে। একই সঙ্গে বায়ুমন্ডলে মিশে যাচ্ছে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড। এক হিসেবে দেখা গেছে এক গ্যালন পেট্রোল পোড়ালে যে পরিমাণ অক্সিজেন বায়ুমন্ডল থেকে খরচ হয় তা একদিনে তৈরি করতে দশটি গাছের প্রয়োজন হয়। তোমরা পড়েছ, গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করতে গিয়ে এ অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়ে।

৩। গাছপালার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বিপুল খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি জমির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। এদের বাসগৃহ ও আসবাবপত্র তৈরি এবং জ্বালানির চাহিদা মেটানোর জন্য সংগ্রহ করা হয় কাঠ। আর এর জন্য আজকাল ব্যাপকভাবে বন উজাড় করা হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে গত ৪০ বছরে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের প্রায় ৪০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। আর এ বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা দিচ্ছে অনাবৃষ্টি এবং খরা। তোমরা কি জান একটি গাছের মূল্য কত? দুশ বা তিন শ টাকা নয়। ১৯৮৭ সালে এক জরিপে দেখা যায়,

বাংলাদেশে এক একটি গাছ কাটার আগ পর্যন্ত মানুষের জীবনের যতটুকু উপকার করে তা সম্পদে রূপান্তর করলে দাঁড়ায় গড়ে প্রায় দু লাখ টাকা। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটানো, পরিবেশ দূষণমুক্ত করা এবং খরা, বাড়-ঝাপটা, ভূমি ক্ষয়রোধ করতে একটি গাছের সার্বিক অবদানের মূল্য দু লাখ টাকা। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ মহামূল্যবান বৃক্ষ আমরা ধ্বংস করে ফেলি।

৪। পানির ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বর্ধিত জনসংখ্যার প্রভাব পড়ছে নদী-নালা, খাল-বিল ও সমুদ্র নিয়ে গঠিত জলজ বাস্তুসংস্থানের ওপর। বিশ্বের পানি মজুদের পরিমাণ ১৪১ বিলিয়ন ঘনলিটার। কিন্তু এর মাত্র ২ শতাংশ স্বাদু পানি। আবার এ পানির ৮৭ শতাংশ বরফ, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ, মাটি এবং আবহাওয়া মণ্ডলে বিভিন্নভাবে রয়েছে। মানুষের ব্যবহারের জন্য রয়েছে মাত্র ২০০০ ঘন কিলোমিটার পানি। অথচ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বাদু পানির চাহিদাও বেড়ে গেছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে সেচের পানির চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্যও পানির চাহিদা বাড়ছে। এর ফলে স্বাদু পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দূষণও। গার্হস্থ্য ও শিল্পজাত কঠিন এবং তরল বর্জ্য পদার্থ পানিকে দূষিত করে চলছে অবিরামভাবে। আমাদের এ উপমহাদেশে শুধু গঙ্গা নদীর পানি একদিকে যেমন রোগ মহামারী ছড়ায় অন্যদিকে পানিতে দ্রবীভূত বর্জ্য পানির স্ফুটনাজক বাড়িয়ে বাষ্পীভবনের হার কমিয়ে দেয়। এর দরুন বৃষ্টিপাত অনেক কমে যায়।

(খ) প্রাকৃতিক চক্রের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

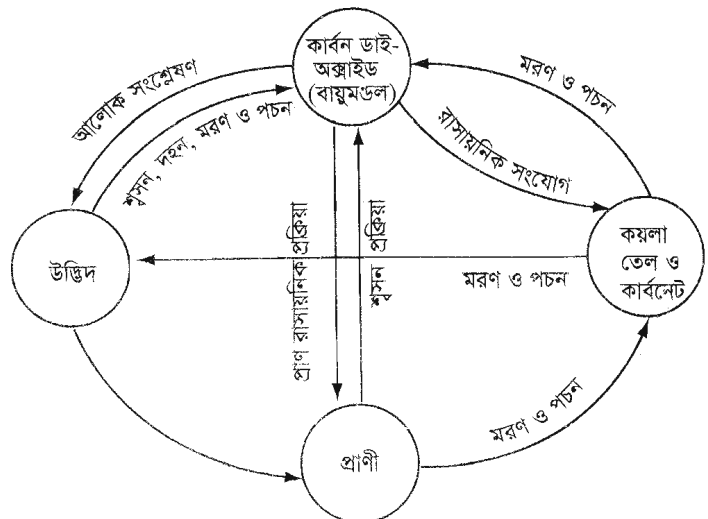
সৃষ্টির শুরু থেকেই জীব ও জড়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জীবের অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সকল পদার্থই জড় জগতের ভৌত পরিবেশ থেকে আসে। জীবের জীবন ও মৃত্যু প্রক্রিয়ায় এগুলো আবার জড় জগতে ফিরে যায়। আবার সেগুলো অন্য জীবের কাজে লাগে। এসব আদান প্রদান চলে প্রকৃতিতে কতকগুলো পদার্থের চক্রাকারে আবর্তন দ্বারা। এসব চক্র প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক চক্র হল :

- (১) কার্বন চক্র
- (২) নাইট্রোজেন চক্র ও
- (৩) পানি চক্র।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এসব চক্রের ভারসাম্য দারুণভাবে নষ্ট হচ্ছে। আর এতে বিশ্বে পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে।

(১) কার্বন চক্র

জীবনের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম। এর সবচেয়ে অপরিহার্য মৌল কার্বন। কার্বনের তিনটি প্রধান উৎস হল বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠের কার্বনেট শিলা এবং কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। এসব উৎস থেকে কার্বন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীব জগতে আসে। তারপর শ্বসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবদেহের কার্বন দ্বারা গঠিত যৌগগুলো বায়ু দ্বারা জারিত হয়ে প্রাণীদেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে কার্বনকে বায়ুতে ছেড়ে দেয়। আবার ভূ-ত্বকের শিলা বা



চিত্র : কার্বন চক্র

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসকে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে পোড়ালে তা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে তাও বাতাসে ফিরে যায়। এভাবে কার্বন আসা যাওয়ার প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে চলতে থাকে। একেই কার্বন চক্র বলে।

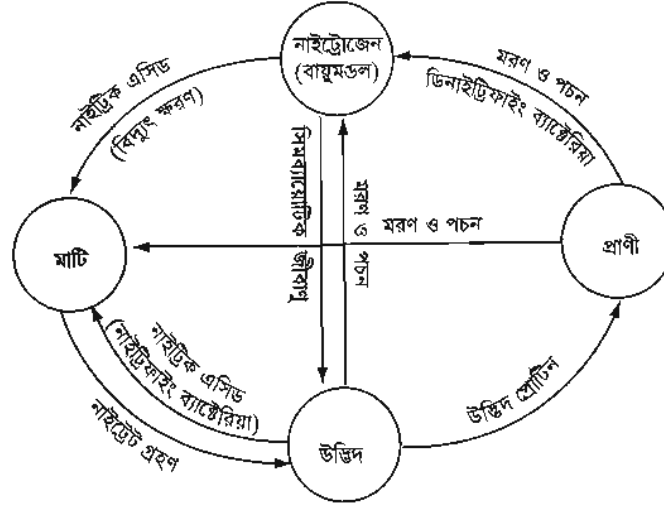
কার্বন চক্রের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

আমাদের জীবন ধারণের জন্য দরকার বিশুদ্ধ বায়ুর। বিশুদ্ধ বায়ুতে সাধারণত ০.০৩ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। বায়ুর ৩ শতাংশ পর্যন্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্ষতিকর নয়। তবে এর বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড মানুষের শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করে এবং বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ যদি ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় তবে সে পরিবেশে মানুষতো দূরের কথা কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। যেখানে এ অবস্থা, সেখানে প্রতিনিয়ত আমাদের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আর বায়ু থেকেও কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে ৬০০ কোটিরও বেশি লোক বাস করে। এ হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ১২০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে মিশে যাচ্ছে। আর যে হারে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে এর পরিমাণ দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। আবার বাড়িঘরে, শিল্প-কারখানায় এবং যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়েও বছরে ১৫০০ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে মিশে যাচ্ছে। ফলে দিন দিনই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণত যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হয় তা আবার সালোকসংশ্লেষণের জন্য সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে। এতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণে ভারসাম্য রক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গাছপালা কেটে যে হারে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হওয়ার কথা তা আর হচ্ছে না। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্বের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব খুব মারাত্মক। কারণ, কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্যালোকের ক্ষতিকর রশ্মি বিকিরিত হয়ে যাওয়ার সময় তাকে শোষণ করে। এতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ১০০ বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ২৮৩ পি,পি,এম (প্রতি মিলিয়নে অংশ) থেকে ৩৩০ পি,পি,এম-এ বৃদ্ধি পায়। এতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। গত ৪০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ হার আরও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানীদের মতে এর ফলে মেরু প্রদেশের জমানো বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। হিসেব করে দেখা গেছে এভাবে তাপমাত্রা বাড়লে এক সময় এন্টার্কটিকা মহাদেশের সব বরফ গলে পৃথিবীর বিরাট অংশ পানিতে ডুবে যাবে।

(২) নাইট্রোজেন চক্র

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ প্রোটিন অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রোটিনের মূল উপাদান নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হল বায়ু। বায়ুর নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মরণ এবং পচনের পর নাইট্রোজেন আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এভাবে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণে একটি ভারসাম্য রক্ষা হয়।



চিত্র : নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন চক্রের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বিশ্বব্যাপী বিপুল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার খাদ্য উৎপাদন বাড়তে হচ্ছে। এর জন্য নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। আশির দশকের শুরুর দশ বছরেই এ সারের উৎপাদন ১০০% বৃদ্ধি করতে হয়। এ সার প্রকৃতিতে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তা পরবর্তীতে বিয়োজিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড হিসেবে বায়ুতে ফিরে আসে। এ নাইট্রিক অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে নষ্ট করে। এতে সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশের সুযোগ পায়। এর প্রভাবে এক ধরনের চর্ম ক্যান্সার রোগ বেড়ে যেতে পারে, মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং চোখের ছানি পড়া ও তা থেকে অন্ধত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।

(৩) পানি চক্র

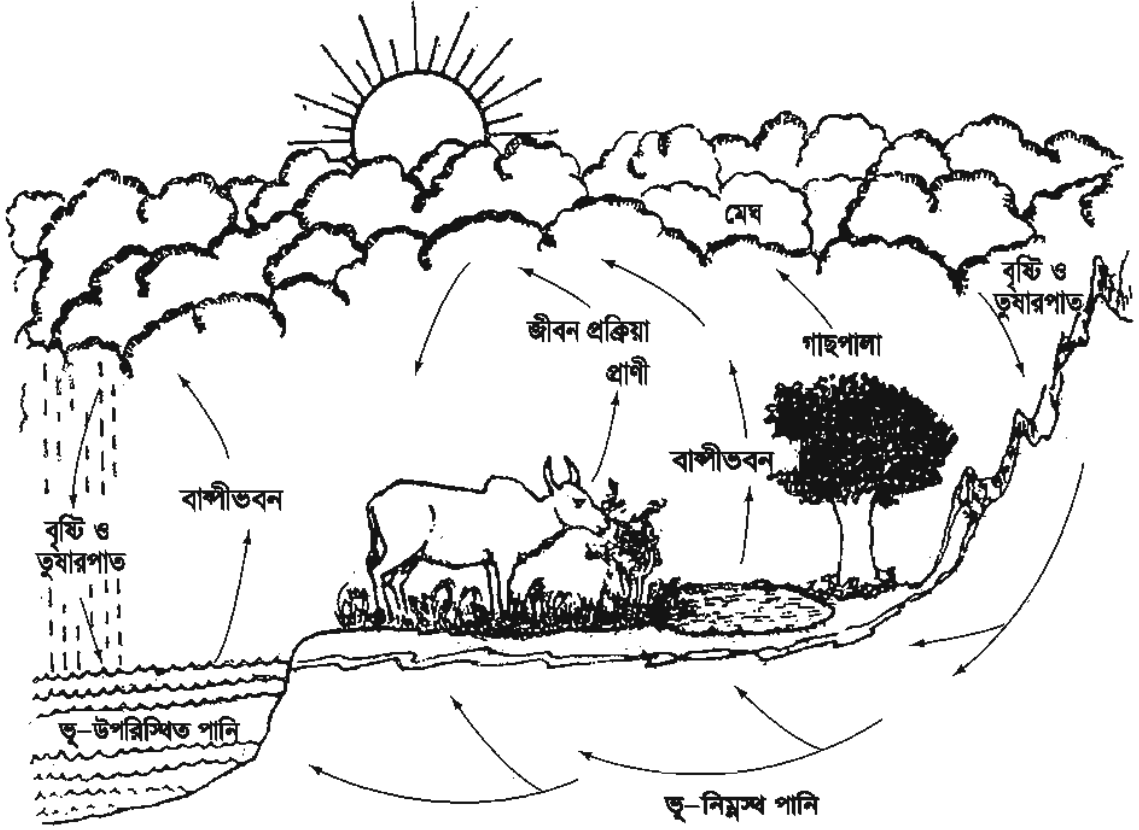
পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পানি যে শুধু জীবদেহের গঠন বা পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্যই অপরিহার্য তা নয়, আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ওপরও এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

পৃথিবীর বিশাল বারিমণ্ডলের মহাসাগর, সাগর, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে সূর্যতাপে পানি বাষ্প হয়ে অবিরাম বায়ুমণ্ডলে যায়। এই জলীয় বাষ্প পরে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি আকারে বা তুষারপাত হিসেবে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

পানি চক্রের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পরিবেশের ওপর পানির প্রভাব অপরিমিত। পানি জলবায়ুকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বাড়লে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। এতে পরিবেশ শীতল থাকে কৃষিকাজ ভাল হয় বনাঞ্চল সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এবং লোকালয়ে রোগের প্রকোপ কমে যায়।

আমরা জানি প্রকৃতি যে পানি গ্রহণ করে তার এক বিরাট অংশ বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিয়ে বায়ুর আর্দ্রতা বাড়ায়। এ জন্যই বনাঞ্চল বা উদ্ভিদপ্রধান এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়। এছাড়া উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ায় বায়ুতে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে এবং তাপ বৃদ্ধিকারী কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে শীতল করে। এর ফলে সাগর, মহাসাগর, জলবায়ু থেকে বাষ্পীভূত পানি শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।



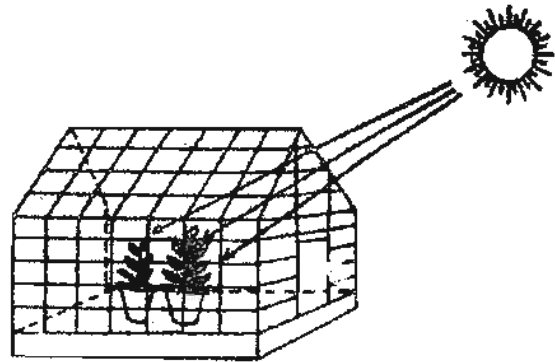
চিত্র : পানি চক্র

যে উদ্ভিদের কারণে পরিবেশের পানি চক্র এত সচল-জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায়, কৃষি জমির পরিমাণ বাড়তে গিয়ে এবং নগরায়ন সুবিধা দিতে গিয়ে সে উদ্ভিদকে ব্যাপকভাবে নিধন করা হচ্ছে। এতে বায়ুমন্ডলে আর্দ্রতা কমে যায় এবং তার ফলে বৃষ্টিপাতও কম হয়। প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় চক্রগুলোর মধ্যে যে কয়টি এখানে আলোচিত হল অর্থাৎ কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ও পানি চক্র তার সবকটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপুল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর প্রভাবে নগরায়ন ও উদ্ভিদ নিধনের ফলে মানব জাতি এক বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং, বিশ্বকে বসবাসের উপযোগী করতে হলে সবার আগে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার রোধ করা দরকার। এর সঙ্গে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করলে এবং পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালালে হয়তো ধ্বংসের হাত থেকে জীবজগৎ রক্ষা পেতে পারে।

গ্রিন হাউস

গ্রিন হাউস কী তোমরা অনেকেই হয়ত তা জান। গ্রিন হাউস হচ্ছে কাচের তৈরি একটি ঘর যার ভেতরে গাছপালা লাগানো হয়। শীত প্রধান দেশে তীব্র ঠান্ডায় অনেক গাছপালা মরে যায়। ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে প্রয়োজনীয় গাছপালা বাঁচিয়ে রাখার জন্যই গ্রিন হাউস তৈরি করা হয়ে থাকে।

তোমরা জান যে, কাচ তাপ কুপরিবাহী। কাচের ভেতর দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে না। কিন্তু আলো খুব সহজেই কাচের ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারে। গ্রিন হাউসের দেয়াল এবং ছাদ-কাচের তৈরি হওয়াতে সূর্যের আলো খুব সহজেই কাচের ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। যার দরুন ঘরের ভেতরে গাছপালা স্বচ্ছন্দে জন্মাতে পারে। অন্যদিকে বাইরের ঠান্ডা ঘরের ভেতরে আসতে পারে না। কিংবা ঘরের ভেতরের গরমও বাইরে যেতে পারে না। এতে গ্রিন হাউসের ভেতরটা বেশ গরম থাকে।



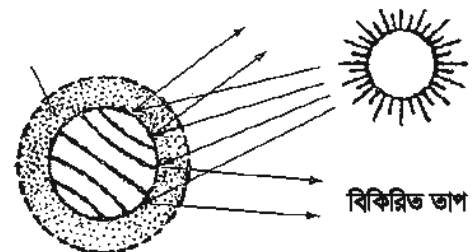
চিত্র : গ্রিন হাউস

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া

তোমরা জান যে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীকে গরম রাখে। এই আলো ও তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে এসে ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। উত্তাপের অনেকটাই আবার বিকিরিত হয়ে ফিরে যায় মহাশূন্যে। এ কারণে পৃথিবী খুব বেশি উত্তপ্ত হয় না। পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডল কিছুটা তাপ ধরে রাখে বিধায় পৃথিবী তাপ হারিয়ে বেশি ঠান্ডা হতেও পারে না।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে অবস্থা কিছু এরকম থাকে না। পৃথিবীর তাপ মহাশূন্যে বিকিরিত হবার পথে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড অধিক তাপ ধরে রাখে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায় বলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও তখন বৃদ্ধি পায়। গ্রিন হাউসের ভেতরের তাপ কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে যেতে পারে না ফলে ঘর গরম থাকে। পৃথিবীর তাপও একইভাবে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভেতর দিয়ে মহাশূন্যে যেতে না পারার কারণে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। গ্রিন হাউসের সাথে মিল রেখেই বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির এই ঘটনার নাম দিয়েছেন গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া। মানব বসতির ওপর গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাব খুব বিপজ্জনক। তোমরা জান যে, পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে সব সময়ই প্রচুর বরফ জমা হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক নিচু জায়গা বর্তমানে যা শুকনা রয়েছে, তখন সে সব জায়গা পানিতে ডুবে যাবে। সমুদ্রের অনেক দ্বীপ, সমুদ্রোপকূলের অনেক দেশ ও শহর সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবে। আমাদের বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলই বঙ্গোপসাগরের অধি পানিতে তলিয়ে যাবে।

বিপন্ন হবে জীব বসতি, বিপন্ন হবে জীবন। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ঘটান জন্য কিছু মানুষই দায়ী। তোমরা জেনেছ যে,

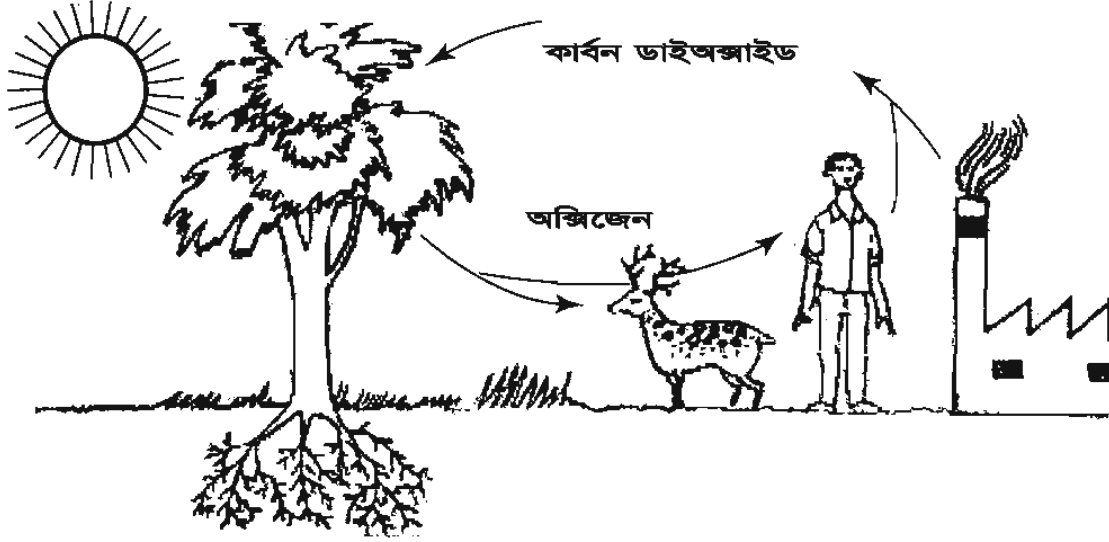


চিত্র : ভূ-পৃষ্ঠের তাপ মহাশূন্যে হারিয়ে যায়



চিত্র : কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তর তাপ বিকিরণে বাধা দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেড়ে গেলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কিছু মানুষই দায়ী। তোমরা জেনেছ যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেড়ে গেলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ঘটে, মানুষের বিভিন্ন কাজ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বালানি হিসেবে আমরা সাধারণত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করি। জ্বালানি পুড়িয়ে আমরা তাপ ও শক্তি পাই কিন্তু এর সাথে তৈরি হয় বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড। মানুষ যত বাড়ছে জ্বালানির ব্যবহারও তত বাড়ছে। জ্বালানি এবং অন্যান্য কাজে কাঠের চাহিদা মিটাতে গিয়ে গাছ কাটার



চিত্র : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা

ফলে বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তোমরা জান যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছপালা ও বনাঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছপালা খাদ্য তৈরি করতে বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়ে। উদ্ভিদের এই কাজের জন্যই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন কমে যায় না, কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় না। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে কোনো দেশের স্থল ভাগের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ মাত্র শতকরা প্রায় ৯ ভাগ। ১৯৭৪ সালে বনের পরিমাণ ছিল ১৬.৭%। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এ বনভূমি যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সামান্য বনভূমিও দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। অবশ্য সরকার ব্যাপকভাবে নতুন নতুন বন সৃষ্টি করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জনসংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে যে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বনাঞ্চল তত দ্রুত বাড়ছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোনো বনাঞ্চল হয়তো থাকবে না।

যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে আমরা কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল ব্যবহার করি। কলকারখানায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হয়। এসব জ্বালানি জীবাশ্ম থেকে সৃষ্ট বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। জনসংখ্যা বাড়লে যানবাহন, কলকারখানা বাড়ে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে মানুষই পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করছে। জনসংখ্যা যদি আরও বাড়ে তাহলে পরিবেশ দূষণও বেড়ে যাবে। আমরা সবাই চাই দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে। কাজেই পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার জন্য আমাদের সবার সক্রিয় হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পারলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

দুরারোগ্য রোগ

চারটি ইংরেজি শব্দ—Acquired Immune Deficiency Syndrome এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল AIDS (এইডস)। আবার তিনটি ইংরেজি শব্দ Human Immunodeficiency Virus এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল HIV (এইচআইভি)। এইচআইভির কারণে এইডস হয়। কোন রোগ বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে এইচআইভি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে দেয়। তাই, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই যে কোন রোগে (যেমন : নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া) আক্রান্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এইডস—এর কোন প্রতিষেধক বা কার্যকর ওষুধ এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। ফলে নিশ্চিত অকাল মৃত্যুই এইডস—এ আক্রান্ত ব্যক্তির শেষ পরিণতি। তাই, এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত।

মানবদেহে এইচআইভি প্রবেশ করার সাথে সাথেই শরীরে এইডস—এর লক্ষণ দেখা যায় না। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার ঠিক কতদিন পর একজন ব্যক্তির মধ্যে এইডস—এর লক্ষণ দেখা দেবে তা ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এবং অঙ্গলভেদে ভিন্নতর হয়। তবে এটা মনে করা হয়ে থাকে যে, এইচআইভি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস—এ উত্তরণ পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তি সাধারণত ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বৎসর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫–১০ বৎসর অথবা তারও বেশি। এই দীর্ঘ সুস্থাবস্থার তাৎপর্য হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিত একজন ব্যক্তি (যার শরীরে এইডস—এর কোন লক্ষণ দেখা যায় নি বা যে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ) তার অজান্তেই অন্য একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে এইচআইভি ছড়িয়ে দিতে পারে।

এইডস—এর প্রধান লক্ষণসমূহ

এইডস—এর নির্দিষ্ট কোন লক্ষণ নেই। তবে, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় সে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (১) শরীরের ওজন অতি দ্রুত হ্রাস পাওয়া (২) দীর্ঘদিন (দুমাসেরও বেশি সময়) ধরে পাতলা পায়খানা (৩) পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া (৪) অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করা (৫) শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কারো মধ্যে উপরিউক্ত একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যাবে না। তবে, কোন ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ বা দক্ষ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি কীভাবে সংক্রমিত হয়

বায়ু, পানি, খাদ্য অথবা সাধারণ ছোঁয়ায় বা স্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি মানবদেহের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তরল পদার্থে (রক্ত, বীর্য, বুকের দুধ) বেশি থাকে। ফলে, মানবদেহের এই তরল পদার্থগুলোর আদান-প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে, তা হল :

- ১) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত কোন ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে
- ২) আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোন ব্যক্তি ব্যবহার করলে
- ৩) আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে
- ৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে)

তার শিশু এই রোগে সংক্রমিত হতে পারে।

- ৫) নৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন করলে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ

এইচআইভি সংক্রমণের উপায়গুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারি। এইডস প্রতিরোধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হল :

- ১) আমাদের সকল আচরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা,
- ২) অন্যের রক্ত গ্রহণ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের আগে রক্তে এইচআইভি আছে কি-না তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নেয়া,
- ৩) ইনজেকশন নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারই নতুন সুচ/সিরিঞ্জ ব্যবহার করা এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করে নেয়া,
- ৪) অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা,
- ৫) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ বা সন্তানকে বুকের দুধ দানের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া,
- ৬) কোন যৌনরোগ থাকলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

এইডস প্রতিরোধ : ‘না’ বলা

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ‘না’ বলা একটি বড় কৌশল। অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা প্রায়ই আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যুক্তি দ্বারা নয়। জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেককেই ‘না’ বলার প্রয়োজন হয় এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যা অল্পবয়সীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এমন হতে পারে যে, একজন শিক্ষার্থী তার সহপাঠী বা প্রিয় বন্ধুর একটি প্রস্তাব পেল যা তাকে যৌন আচরণ করতে প্ররোচিত অথবা মাদকে আসক্ত হতে প্রভাবিত করতে পারে। শিক্ষার্থী কিছুতেই এই প্রস্তাব মানতে চায় না, আবার বন্ধুত্বও নষ্ট করতে চায় না। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ‘না’ বলতেই হবে। একবার এবং বারবার। সহপাঠী বন্ধুটি এবং অন্যরা তাকে জোর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দৃঢ়চেতা হতে হবে।

‘না’ বলার জন্য— (১) যুক্তি দেখাতে হবে, (২) প্রস্তাবটির ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরতে হবে, (৩) নিজ অবস্থানের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে হবে এবং ‘না’ বলতে হবে।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

প্রতিকারবিহীন এইচআইভি/এইডস রোগের চরম পরিণতি মৃত্যু, তাই সকলকে বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে, নতুন এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী। অন্যদিকে, এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এ বয়সী মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে : (১) আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান, (২) মেয়েরা এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত, (৩) নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগূহীত হওয়া, (৪) মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দানের ক্ষমতার অভাব, (৫) মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং যৌন কৌতূহল ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি। মেয়েদের মতো অল্পবয়সী ছেলেরাও ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকার জন্য ছেলেমেয়েদের যেমন শিক্ষিত হতে হবে, তেমনি তাদের সুরক্ষার জন্য পরিবার ও সমাজকে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় সমগ্র জাতি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

যৌনরোগ এবং এইচআইভি

ইংরেজি শব্দাবলি Sexually Transmitted Disease এবং Sexually Transmitted Infection এর সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে এসটিডি (STD) এবং এসটিআই (STI)। এসব রোগ বা সংক্রমণ সাধারণত অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। কিছু কিছু যৌনরোগ যৌনমিলন ছাড়া অন্যান্য উপায়েও সংক্রমিত হতে পারে। যৌন রোগসমূহ ভাইরাসঘটিত অথবা ব্যাকটেরিয়াঘটিত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রধান রোগগুলো হল : গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্যামিডিয়া, এইচআইভি, জননেন্দ্রিয়ের চর্মরোগ ও ফোঁড়া, হেপাটাইটিস-বি ইত্যাদি। এই রোগসমূহের প্রধান লক্ষণগুলো হলো : যৌনোজ বা এর আশেপাশে ঘা/চুলকানি হওয়া, প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালা করা, যৌনোজ থেকে পুঁজ পড়া ইত্যাদি।

যৌনরোগ এবং এইচআইভি সংক্রমণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যাদের কোনো যৌনরোগ রয়েছে তাদের এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চাইতে অনেকগুণ বেশি।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচর্যা

মরণব্যাদি এইডস-এর পরিণতি আমরা জানি। একজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যকে সংক্রমিত করে না এবং আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না। তাই আমাদের লক্ষ রাখা প্রয়োজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের করণীয় হবে :

- ১) এইডস আক্রান্তদের সঙ্গে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা।
- ২) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া।
- ৩) এইডস আক্রান্তদেরকে অন্যান্য সবার মতো সমান সুযোগ দেওয়া।
- ৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ থেকে বঞ্চিত না করা
- ৫) পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক এদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এইচআইভি/এইডস : বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ

এইডস এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় ও একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এইডস মানবসভ্যতা এবং উন্নয়নের ক্রমাগত বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা UNAIDS-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ সালের শেষ অবধি বিশ্বে এইচআইভি/এইডস সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩ কোটির বেশি। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০০৭ সালেই এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এবং ঐ বছরেই এইডস-এ মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ২১ লক্ষ লোক। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১১,০০০ লোক এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী এইচআইভি/এইডস-এর ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে। প্রায় সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ মারাত্মকভাবে এইচআইভি/এইডস কবলিত। পূর্ব ইউরোপ এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে এর দ্রুত বিস্তার হচ্ছে। তবে এশীয় দেশসমূহেরও নিশ্চিত থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমারসহ চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডেও এইচআইভি/এইডস-এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে যদিও এখন পর্যন্ত এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেনি, তবুও বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো অবকাশ নেই। এ দেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে (২০০৭) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (মাদক গ্রহণকারী, মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মী এবং তাদের খদ্দের, সমকামী, পেশাগত রক্ত বিক্রেতা, ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠী ইত্যাদি) মধ্যে সামগ্রিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ১% এর নিচে। ২০০৭ সালে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ৭,৫০০, এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ১২০৭, এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬৫ এবং এইডস-এ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ১২৩। অর্থাৎ বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। একই সূচ ও সিরিজ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার প্রায় মহামারী পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ৩৩৩ জন নতুন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখনই এইডস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়গুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহ

কোনো দেশ বা এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ জানার আগে প্রথমেই জনসংখ্যা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা প্রয়োজন। যেমন, সেখানে কত জন লোক বাস করে, কত জন পুরুষ, কত জন নারী তাদের বয়স কাঠামো কী, প্রতি বছর কত জন জন্মগ্রহণ করেছে, কত জন মারা যাচ্ছে। তাছাড়াও তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি শারীরিক অবস্থা। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে—

- (১) আদমশুমারি
- (২) আবশ্যিকীয় তালিকাভুক্তি
- (৩) নমুনা জরিপ।

কোনো দেশে কত জন লোক বাস করে তা জানার সরাসরি উপায় হচ্ছে প্রতিটি লোককে গণনা করা, আদমশুমারিতে প্রকৃতপক্ষে তাই করা হয়। অবশ্য লোক গণনার সাথে সাথে উপরোক্ত তথ্যসমূহকে সংগ্রহ করা হয়। প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ১৯৭৪, সালে, তারপর ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিদিনই কিছু শিশু জন্মগ্রহণ করছে আবার কিছু লোক মারা যাচ্ছে। দেশ বা কোনো এলাকা থেকে অনেকে হয়তো বাইরে চলে যাচ্ছে, অনেকে আবার বাইরে থেকে সেখানে আসছে। এ সব তালিকাভুক্তি করাকেই বলে আবশ্যিকীয় তালিকাভুক্তিকরণ। এ সব তালিকাভুক্তিকরণের মাধ্যমেই আদমশুমারির মধ্যবর্তী কোনো সময়ের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। আদমশুমারি এবং তালিকাভুক্তিকরণ ব্যয় সাপেক্ষ। তাই আজকাল নমুনা জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। নমুনা জরিপে দেশের প্রতিটি মানুষকে গণনা করার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষকে গণনা করা হয় এবং তা থেকে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এতে কিছুটা ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এলাকা বাছাই করার সময় তা যেন প্রতিনিধিত্বকারী হয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এই ভুলের পরিমাণ কমানো যায়। তুমি যে এলাকায় বাস কর সেই এলাকা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য একটি জরিপ সহজেই করতে পার। তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক ব্যবহার করতে হয়। নিচে একটি নমুনা ছক দেওয়া হল :

- ১। পরিবার প্রধানের নাম :
- পেশা :
- আয় :
- বয়স :
- শিক্ষাগত যোগ্যতা :
- ধর্ম :
- বৈবাহিক অবস্থা :
- ২। পরিবারের সদস্য সংখ্যা :
- নাম বয়স সম্পর্ক শিক্ষা আয়
- (ক)
- (খ)
- (গ)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির শূন্য হার

তোমরা জান যে, কোনো বছরে মোট জীবন্ত শিশু জন্মের সংখ্যা এবং সেই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যার অনুপাতকে স্থূল জন্মহার বলে। এই অনুপাতকে সাধারণত ১০০০ দিয়ে গুণ করা হয়।

অর্থাৎ,

$$\begin{aligned}\text{স্থূল জন্মহার} &= \frac{\text{কোনো বছরে জীবন্ত শিশুর জনসংখ্যা}}{\text{একই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা}} \times 1000 \\ &= \frac{B}{P} \times 1000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{স্থূল মৃত্যুহার} &= \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{একই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা}} \times 1000 \\ &= \frac{D}{P} \times 1000\end{aligned}$$

যখন B = কোনো বছরে জীবন্ত শিশুর জনসংখ্যা
 D = কোনো বছরে মৃত্যু সংখ্যা
 P = একই বছরে মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা

স্থূল জন্মহার এবং স্থূল মৃত্যুহারের পার্থক্যকে বলা হয় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার। কিন্তু কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির আরেকটি প্রক্রিয়াও রয়েছে, যাকে দেশান্তর বলে। একটি দেশ থেকে অনেক সময়েই অনেকে অন্য দেশে চলে যায়। আবার অন্য দেশ থেকে কেউ কেউ আগমনও করে। যেমন বাংলাদেশ থেকে অনেকেই মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চাত্য দেশে চলে যাচ্ছে। দেশ থেকে বাইরে চলে যাওয়াকে বলে বহির্গমন এবং অন্য দেশ থেকে আসাকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমন থেকে বহির্গমন বিয়োগ করে নিট দেশান্তর পাওয়া যায়। আর জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার থেকে দেশান্তর হার যোগ অথবা বিয়োগ করে পাওয়া যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। বহিরাগমন কম হলে যোগ করতে হবে অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার থেকে বেশি হবে। অপরপক্ষে, বহির্গমন বেশি হলে বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে কম হবে।

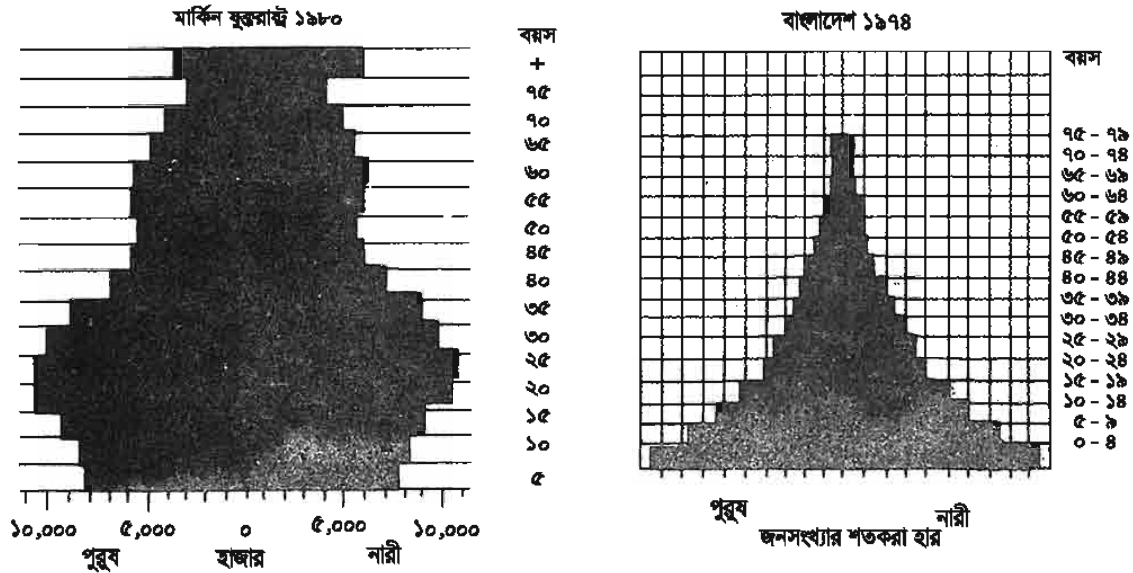
দেশান্তর যদি উল্লেখযোগ্য না হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার একই হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বছরে যদি জনসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যা সমান হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে শূন্য। একেই বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শূন্য হার। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বহিরাগমন থেকে বহির্গমন বেশি, সেখানে জনসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা থেকে আনুপাতিক হারে বেশি হলেও শূন্য বৃদ্ধিহার বজায় থাকতে পারে। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যেখানে বহির্গমন থেকে বহিরাগমন বেশি সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শূন্য হার বজায় রাখতে হলে জনসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা থেকে কম হতে হবে।

আজকের দিনে সকল দেশের লক্ষ্য শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার অর্জন করা। বহু উন্নত দেশ ইতোমধ্যেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

জনসংখ্যার পিরামিড

কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা জানাটাই যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যার মধ্যে কত জন নারী, কত জন পুরুষ, কোন বয়সের কত জন লোক এবং একটি বয়ঃক্রমের মধ্যে কতজন পুরুষ, কত জন নারী তা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো নিয়ে জনসংখ্যা কাঠামো গঠিত। এই কাঠামো থেকে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জন্মহার, মৃত্যুহার, কর্মক্ষম জনসংখ্যা, নির্ভরশীল জনসংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। ১৫ বছরের কম এবং ৬৪ বছরের উর্ধ্বের জনসংখ্যা সাধারণত কর্মক্ষম নয় অর্থাৎ অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যে দেশে এই দুই বয়ঃক্রমের জনসংখ্যা বেশি সে দেশে নির্ভরশীলতার অনুপাত বেশি (নির্ভরশীল জনসংখ্যা এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতকে নির্ভরশীলতার অনুপাত বলে)। জনসংখ্যার মধ্যে সন্তান ধারণে সক্ষম বয়সের (১৫-৪৯ বছর) নারীর সংখ্যা যদি বেশি থাকে তবে জন্মহারও বেশি হবে। জনসংখ্যার এ সব বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যা কাঠামো থেকে জানা যায়। জনসংখ্যা পিরামিড হচ্ছে নারী পুরুষের সংখ্যা এবং তাঁদের বয়স কাঠামোকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা। এই চিত্র অঙ্কন করার জন্য সমগ্র জনসংখ্যাকে ৫ অথবা ১০ বছর বয়সের ব্যবধানে বিভক্ত করা হয় যেমন ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪ ইত্যাদি। অথবা ০-৯, ১০-১৯, ২০-২৯ ইত্যাদি।

প্রতিটি বয়স কাঠামোতে নারী-পুরুষের সংখ্যা আনুভূমিক 'বার' (BAR) দ্বারা দেখান হয়। 'বার'-এর দৈর্ঘ্য সংখ্যা আনুপাতিক জনসংখ্যার শতকরা হার হিসাবেও দেখান যেতে পারে। সাধারণত কেন্দ্রের ডান পাশে নারী এবং বাম পাশে পুরুষ সংখ্যা দেখান হয়। এইভাবে বয়ঃক্রম অনুযায়ী 'বারগুলো' নিচ থেকে উপরে সাজান হয়। বয়ঃক্রমকে সাধারণত 'বার' এর কেন্দ্রবিন্দু বরাবর লম্বাভাবে দেখা হয়। আবার বয়ঃক্রমকে বারের ডান অথবা বাম পাশেও দেখান যেতে পারে। চিত্রে বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পিরামিড দেখান হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, এটি দেখতে অনেকটা মিশরের পিরামিডের মতো। এজন্যেই এই চিত্রকে পিরামিড বলে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, এদেশে ০-১০ বছরের বয়সের জনসংখ্যা বেশি, যার অর্থ জনসংখ্যার বেশি। অপরপক্ষে ৬৪ বছরের উর্ধ্বের জনসংখ্যা খুবই কম, যার অর্থ মৃত্যুহারও বেশি। বর্তমান শতাব্দীর আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, এ রকম উচ্চ জন্ম এবং মৃত্যুহার ছিল, যার ফলে প্রায় সব দেশের জনসংখ্যা পিরামিড একই রকম ছিল। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই কমে গেছে। ফলে জনসংখ্যা পিরামিডের চেহারাও কিছুটা পাল্টেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পিরামিডটি লক্ষ করলে তা বোঝা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, যার অর্থ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। আবার ৬৪ বছরের উর্ধ্বের জনসংখ্যার অনুপাতও বাংলাদেশের তুলনায় বেশি, অর্থাৎ মৃত্যুহারও কম। এই রকম কম জন্ম এবং মৃত্যুহারই আজকের দিনে সকল দেশের কাম্য। যুক্তরাষ্ট্রের পিরামিড থেকে আবার দেখা যায় যে, ৬৪ বছরের বেশি বয়সের নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা থেকে বেশি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের চাইতে নারীদের আয়ুষ্কাল বেশি। বাংলাদেশের পিরামিড থেকে কিন্তু এর বিপরীতটা দেখা যায় অর্থাৎ নারীদের চাইতে পুরুষের আয়ুষ্কাল বেশি।



চিত্র : জনসংখ্যা পিরামিড

জনসংখ্যা পিরামিড থেকে কোনো দেশের ১৫ বছরের কম এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়সের নারী-পুরুষের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়, যা থেকে নির্ভরশীলতার অনুপাত বের করা যায়। যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড থেকে বের করা যায় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের কম এবং ৫ শতাংশের বয়স ৬৪ বছরের বেশি যারা নির্ভরশীলদের দলে। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ১৫-৬৪, এর মধ্যে যারা কর্মক্ষম। সুতরাং, নির্ভরশীলতার অনুপাত হচ্ছে ৫০ : ৫০ বা যার অর্থ প্রতি উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর ১ জন নির্ভরশীল। তুলনামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পিরামিড থেকে বের করা যায় যে সেখানে মোট জনসংখ্যা ২৩ শতাংশের বেশি ১৫ বছরের কম এবং ১১ শতাংশ ৬৪ বছরের বেশি। অবশিষ্ট ৬৬ শতাংশ কর্মক্ষম। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভরশীলতার অনুপাত ৩৪ : ৬৬ বা ০.৫২। এই অনুপাত বাংলাদেশের অনুপাত থেকে অনেক কম, প্রায় অর্ধেক।

জনমিতিক অবস্থান্তর

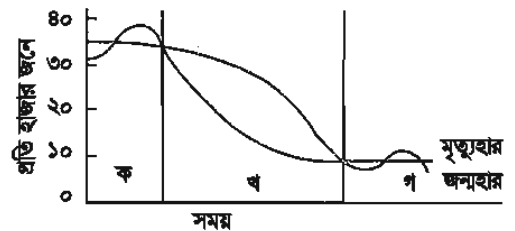
পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের হার কিছু সকল দেশে সকল সময়ে এক রকম নয়। ১৬০০ সাল পর্যন্ত এই হার ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু তারপর থেকেই তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায় যে ১৬৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ কোটি যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয় ১৮৫০ সালে, অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ২০০ বছর। তারপর কিছু জনসংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০০ কোটি হতে সময় লেগেছে ৮০ বছর, পরবর্তীতে সেই জনসংখ্যাও দ্বিগুণ হয়ে ৪০০ কোটি হয়েছে মাত্র ৪৫ বছরে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি। ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১০০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ গুণ। ২.৬৫ কোটি থেকে ১১.১৫ কোটিতে জনসংখ্যা পরিবর্তন একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম জনমিতিক অবস্থান্তর (Demographic transition) জনমিতিক অবস্থান্তরকে সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তরে জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই অত্যন্ত বেশি। দ্বিতীয় স্তরে প্রথমে মৃত্যুহার কমে কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার কমে না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই স্তরে শেষের দিকে জন্মহারও কমেতে থাকে, যদিও মৃত্যুহার প্রায় স্থির থাকে। তৃতীয় স্তরে জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই কমে এবং প্রায় সমান হয়ে যায়। ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারও কমে যায়। চিত্রে বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে জনমিতিক অবস্থান্তরের স্তরগুলো দেখান হয়েছে। প্রথম বা ‘ক’ স্তরের জন্ম এবং মৃত্যু উভয় হারই বেশি থাকে বলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার কমই থাকে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তেমন বৃদ্ধি থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সকল দেশে (এবং বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশে) এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। দ্বিতীয় বা ‘খ’ স্তরের প্রথম ভাগে মৃত্যুহার দ্রুত কমে যায় কিন্তু জন্মহার প্রায় স্থিতিশীল থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায়। একে জনসংখ্যা বিস্ফোরণও বলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমেতে থাকে। মহামারী আকারে যেসব রোগ দেখা দিত যার ফলে বহুলোক প্রাণ হারাত, যেমন—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, প্রেগ ইত্যাদি। এই রোগগুলো দমিত হওয়ায় মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে দেশ শিল্পায়িত হয়, কৃষির উন্নতি হয় এবং শহরায়ন

সারণি : পৃথিবীর জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যা (কোটিতে)	মন্তব্য
১৬৫০	৫০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ২০০ বছর
১৮৫০	১০০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ৮০ বছর
১৯৩০	২০০	
১৯৬০	৩০০	
১৯৭৫	৪০০	
১৯৮৬	৫০০	
২০০১	৬১৩.৭০	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ৪৫ বছর

বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশু মৃত্যুর হার কমে যায় বলে পরিবারের অধিক শিশু জন্মদানের প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে আস্তে আস্তে জন্মহারও কমেতে থাকে এবং এই স্তরের শেষ প্রান্তে জন্ম এবং মৃত্যুহার উভয়ই কমে যায়। তৃতীয় বা ‘গ’ স্তরে জন্ম এবং মৃত্যুহার কমে গিয়ে স্থিতিশীল হয়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায়। এমনকি অনেক সময় প্রায় শূন্য হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক উন্নত দেশেই এই অবস্থা বিরাজমান। এই পর্যায়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। মানুষ স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী হয়।

দ্বিতীয় বা ‘খ’ স্তরকে জনমিতিক অবস্থান্তর স্তর বলে। প্রথম স্তরটি প্রাক অবস্থান্তর এবং তৃতীয়টি উত্তর অবস্থান্তর স্তর। বর্তমানে জাপান বাদে এশিয়ার দেশগুলো জনমিতিক অবস্থান্তর পর্যায়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের অবস্থাও এই পর্যায়ের শেষার্ধ্বে।



চিত্র : জনমিতিক অবস্থান্তর

জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় অধিক এবং তার প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অধিক জনসংখ্যা যে সকল সমস্যা সৃষ্টি করছে তা তোমরা পূর্বের ক্লাসগুলোতেই জেনেছ। এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্পর্কে তোমাদেরকে সংক্ষেপে কিছু বলব। জনসংখ্যা সমস্যা দুইভাবে সমাধান করা যেতে পারে। (১) পরিবারের সদস্য সংখ্যা কাম্য সংখ্যায় রেখে এবং (২) যে সব দেশে বহিরাগমনের সংখ্যা বেশি সেসব দেশে বৃদ্ধি রোধের জন্য বহিরাগমন নিয়ন্ত্রণ করে, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার ওপর। শিল্পোন্নত, কৃষিপ্রধান, উন্নত ও উন্নয়নশীল, শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত সমাজের জন্য এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। যুক্তরাষ্ট্র একটি উন্নত দেশ, সেখানকার জনগণ শিক্ষিত। সুতরাং পরিবারের সদস্য সংখ্যা কাম্য সংখ্যায় রাখার বিষয়ে সেখানকার জনসাধারণ নিজেরাই সচেতন এবং উদ্যোগী। যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাগমনের সংখ্যা অধিক বলে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সমস্যা ভিন্ন। এই দেশগুলো উন্নয়নশীল, দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। অধিক সন্তান না হওয়ার জন্য বাংলাদেশে আইন করে আঠার বছরের কম বয়সের মেয়েদের এবং একুশ বছরের কম বয়সের ছেলেদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা, আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দেশের লোক শিক্ষিত হলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কাম্য সংখ্যায় রাখতে উৎসাহিত হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। বিশ্বে পানি মজুদের পরিমাণ কত?

ক. ১৪১ বিলিয়ন ঘনমিটার

খ. ১৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার

গ. ১৪১ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার

ঘ. ১৪১ হাজার ঘনমিটার।

২। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির প্রধান কারণ কী?

ক. গাছপালা কমে যাওয়া।

খ. যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া

গ. ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

ঘ. ভূ-পৃষ্ঠের কার্বনেট শিলার ভাঙন।

৩। খুলনা শহরের ২০০৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মূল জন্মহার ২০ এবং ঐ বছরে জনগ্রহণকারী জীবন্ত শিশুর সংখ্যা ২০ হাজার। ২০০৭ সাল শেষে ঐ শহরের মোট জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ১০ লক্ষ

খ. ২০ লক্ষ

গ. ৪০ লক্ষ

ঘ. ৫০ লক্ষ

৪। HIV থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় কোনটি?

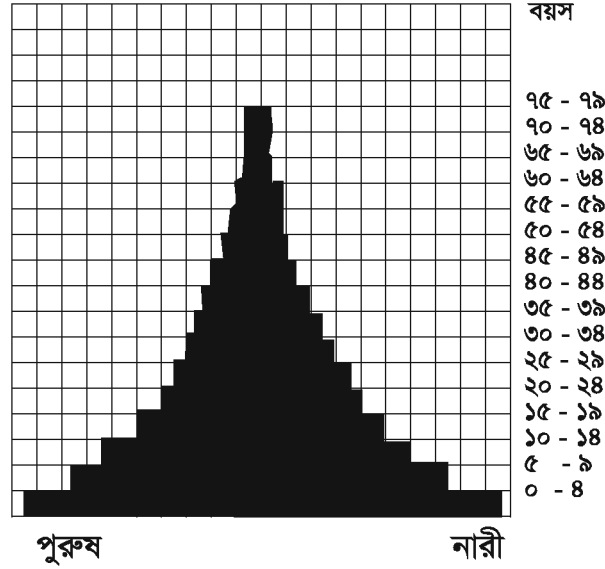
ক. ধর্মীয় বিধি নিষেধ মেনে চলায় উৎসাহিত করা।

খ. HIV সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপক প্রচার।

গ. নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ।

ঘ. একই সুই ও সিরিঞ্জ একাধিক জনে ব্যবহার না করা।

নিচের পিরামিড চিত্র থেকে ৫ এবং ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বাংলাদেশ ১৯৭৪



৫। উপরের পিরামিড চিত্র থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নিচের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়?

- ক. নির্ভরশীল জনসংখ্যা কম, মৃত্যুহার বেশি, জন্মহার কম, দেশটি উন্নয়নশীল।
- খ. নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি, জন্মহার বেশি, মৃত্যুহার বেশি, দেশটি উন্নয়নশীল।
- গ. নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি, জন্মহার কম, মৃত্যুহার কম, দেশটি উন্নত।
- ঘ. নির্ভরশীল জনসংখ্যা কম, জন্মহার কম, কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি, মৃত্যুহার কম, দেশটি দরিদ্র।

৬। ১৫-৬০ বয়ঃক্রমের জনসংখ্যা পিরামিড যদি প্রায় সমান প্রশস্ত হত তাহলে বাংলাদেশ—

- i. একটি উন্নত রাষ্ট্র।
- ii. একটি দরিদ্র রাষ্ট্র।
- iii. একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চিকিৎসার জন্য রক্ত নেওয়ার পর গত বছর হঠাৎ আজমল সাহেব লক্ষ করেন তাঁর দেহের ওজন কমে যাচ্ছে, শুকনো কাশি হচ্ছে, মুখমন্ডল, চোখ, নাক, চোখের পাতা ফুলে যাচ্ছে, তিনি এমতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন এবং ডাক্তার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে জানানেন তাঁর এমন একটি রোগ হয়েছে যার কোনো চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার হয়নি। বিষয়টি তাঁর সহকর্মীরা জেনে যায়। তাঁরা আজমল সাহেবকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন।

- ক. আজমল সাহেবের আক্রান্ত রোগটির নাম কী?
- খ. রোগটিকে ঘাতক ব্যাধি বলা হয় কেন?
- গ. আজমল সাহেবের প্রতি তাঁর সহকর্মীদের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় কেন ব্যাখ্যা কর?
- ঘ. বাংলাদেশ এ ধরনের রোগের সংক্রমণের ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ—তোমার মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

পুষ্টি, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

খাদ্য কী?

আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার বস্তু দেখতে পাই। এই বস্তুগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—অজৈব বা জড়বস্তু এবং জৈববস্তু। জৈববস্তু বলতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যতীত কার্বন মিশ্রিত যৌগ বস্তুগুলোকে বুঝায়, যেমন—আমিষ, শর্করা, চর্বি, নিউক্লিওপ্রোটিন, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি। এ জৈব বস্তুগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বস্তুকে আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, যেমন—আমিষ, চর্বি, শর্করা ইত্যাদি। খাদ্য বলতে সেই সমস্ত জৈব উপাদানকে বুঝায় যেগুলো জীবের দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যের কাজ

- ১। খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।
- ২। খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।
- ৩। খাদ্য শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।

পুষ্টির সংজ্ঞা

পুষ্টি জীবের একটি সার্বিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে পরিপাক, খাদ্যসার পরিশোধন, কোষে আত্মীকরণ, দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি উৎপাদিত হয় এবং অপাচ্য খাদ্যাংশের নিষ্কাশন ঘটায়।

খাদ্য উপাদান

উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অধিকাংশ খাদ্যবস্তুতে একাধিক উপাদান উপস্থিত থাকে এবং এক বা একাধিক কাজ করতে পারে। কেননা খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক বস্তুগুলোকেই খাদ্যের উপাদান বলা হয়। কেবলমাত্র একটি উপাদানে গঠিত এমন খাদ্যবস্তুর সংখ্যা খুবই কম, যেমন—চিনি, সরিষার তেল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, আটা ইত্যাদি মিশ্র খাদ্য অর্থাৎ একাধিক খাদ্য উপাদান এসব খাদ্যে উপস্থিত। যে খাদ্যে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে তাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসেবে গণ্য করা হবে, যেমন—মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রধানত আমিষবহুল খাদ্য। আমিষের অভাব পূরণ করার জন্য আমরা এ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। ভাত, আটা, ময়দা, আলু, ইত্যাদি খাদ্যের প্রধান অংশ শর্করা। অতএব এগুলো শর্করাবহুল খাদ্য। এভাবে উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :

- ১। আমিষ : বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।
- ২। শর্করা : শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
- ৩। স্নেহ ও চর্বি পদার্থ : তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া তিন প্রকার অন্যান্য উপাদানও শরীরের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

- ১। খাদ্যপ্রাণ : রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়ায় এবং বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদ্দীপনা যোগায়।
- ২। খনিজ লবণ : বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- ৩। পানি : দেহে পানির সমতা রক্ষা করে কোষের গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ এবং কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

খাদ্যের গঠন, প্রকৃতি, উৎস, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ

১। **আমিষ বা প্রোটিন :** আমিষের চারটি মৌলিক উপাদান। যথা—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন—এর সমন্বয়ে গঠিত। কখনও কখনও ফসফরাস, লৌহ এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদানও আমিষে উপস্থিত থাকে। আমিষ অ্যামিনো এসিড এর জটিল যৌগ। পরিপাক প্রক্রিয়ায় এটি সরল শোষণ উপযোগী অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়।

আমিষ খাদ্যের উৎস

প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় জগৎ থেকেই প্রচুর পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। উৎপত্তিগতভাবে আমিষ

দুই প্রকার যথা :

১। **প্রাণিজ আমিষ :** যে সমস্ত আমিষ প্রাণী হতে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ আমিষ বলা হয়। যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির ইত্যাদি।

২। **উদ্ভিজ্জ আমিষ :** যে সমস্ত আমিষ উদ্ভিদ হতে পাওয়া যায় তাদেরকে উদ্ভিজ্জ আমিষ বলে। যথা : ডাল, বাদাম, মটর, ছোলা ইত্যাদি।



ডাল



দুধ



মাছ



দই

চিত্র ৩.১ : কতকগুলো আমিষ জাতীয় খাদ্য

আমিষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা

আমিষের প্রয়োজনীয়তা বয়স ও নারীপুরুষ ভেদে বিভিন্ন রকমের হতে দেখা যায়। আমাদের দেহের বৃদ্ধি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময় আমিষের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এক জন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ, কর্মক্ষম ব্যক্তির দৈনিক ৬৫ গ্রাম আমিষের প্রয়োজন এবং এক জন নারীর প্রয়োজন ৫৫ গ্রাম। ৬ থেকে ৯ বছর শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ৪০-৫০ গ্রাম। একজন বাড়ন্ত শিশুর খাদ্য তালিকায় আমিষের পরিমাণ বেশি হওয়া দরকার।

আমিষের কাজ

- ১। আমিষের প্রধান কাজ হল দেহের কোষ গঠনে সহায়তা করা। দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র, রক্তকণিকা ইত্যাদি অধিকাংশই আমিষ দ্বারা তৈরি।
- ২। আমাদের দেহে কোষগুলোর বিপাক ক্রিয়া অবিরামভাবে চলে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোষগুলোর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং নষ্ট হয়ে যায়। নতুন কোষ উৎপাদনে আমিষ প্রধান ভূমিকা পালন করে।
- ৩। এন্টিবডি দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। আমিষ এন্টিবডি উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- ৪। দেহের অভ্যন্তরস্থ জারক রসমূহ, যেমন—পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি এবং হরমোন আমিষ দ্বারা তৈরি।
- ৫। আমিষ রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। হিমোগ্লোবিন একটি আমিষের যৌগ।
- ৬। আমিষ কোষীয় বিপাকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে।
- ৭। সুস্থ মানসিকতা বিকাশে আমিষ অপরিহার্য। আমিষের অভাব হলে শিশুদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

খাদ্যে আমিষের অভাবের ফল

আমিষ দেহগঠনের ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। শিশুর খাদ্যে আমিষের অভাব হলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ওজন হ্রাস পায়, ত্বক ও চুলের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়। সজ্ঞে সজ্ঞে মানসিক দিক থেকেও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সাধারণত ২-৪ বছর বয়সে শিশুদের আমিষের অভাব হলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। এ রোগে শিশুর বৃন্দ্রি হ্রাস পায়, পেটের গীড়া দেখা দেয়, পেশি ক্ষয় হতে থাকে, পানি জমে শরীর ফুলে যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে আমিষের অভাবে শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। রক্তস্ফল্লতা, ম্যারাসমাস প্রভৃতি রোগ হয়। দরিদ্র শ্রেণীর মায়েদের আমিষের অভাবে মৃতবৎস, গর্ভপাত, অসময়ে অপরিণত শিশুর জন্ম ইত্যাদির হার বেড়ে যায়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি এ জাতীয় খাদ্য। সব শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ তিনটি মৌলিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত।

রাসায়নিক গঠন অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :

ক) মনোস্যাকারাইড : এক অণু বিশিষ্ট শর্করা। যেমন-গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি। মধু, পাকা মিষ্টি ফলের রসে এ ধরনের শর্করা পাওয়া যায়।

খ) ডাইস্যাকারাইড : দুই অণু বিশিষ্ট শর্করা। যেমন-সুক্রোজ, মলটোজ, ল্যাকটোজ প্রভৃতি। চিনি, আখ, নানারকম সবজিতে এ ধরনের শর্করা উপস্থিত।

গ) পলিস্যাকারাইড : বহু অণু বিশিষ্ট শর্করা। যেমন-স্টার্চ বা শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন। চাল, আটা, বীজ, শাক-সবজি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের শর্করা পাওয়া যায়। উদ্ভিদে শর্করা থাকে শ্বেতসাররূপে এবং প্রাণীদেহে, বিশেষ করে যকৃতে শর্করা থাকে গ্লাইকোজেনরূপে।

শর্করার উৎস

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শর্করা (চিত্র-৩.২) সাধারণত উদ্ভিদ থেকে আসে। যেমন-চাল, গম, আলু, সবজি, বীজ প্রভৃতি। মাছ এবং প্রাণীর যকৃৎ ও বৃক্ক থেকে অতি সামান্য শর্করা পাওয়া যায়।



ভাত



আলু



গম



চিনি

চিত্র ৩.২ : কতকগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য

কাজ

- ১। দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই শর্করার প্রধান কাজ।
- ২। স্নেহজাতীয় পদার্থের দহনে সহায়তা করে।
- ৩। শর্করা আমাদেরকে কিটোসিস নামক রোগ হতে রক্ষা করে।
- ৪। অতিরিক্ত শর্করা দেহে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে, খাদ্যে শর্করার অভাব হলে গ্লাইকোজেন দেহে কর্মশক্তি উৎপন্ন করে।
- ৫। শর্করা, আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে।
- ৬। সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

খাদ্যে শর্করার অভাবের ফল

- ১। শর্করার অভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থের দহন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। ফলে শরীরের এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং 'কিটোসিস' রোগের সৃষ্টি হয়।
- ২। খাদ্যে শর্করার স্বল্পতা থাকলে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন এবং অবশেষে সঞ্চিত চর্বি ও আমিষ ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়। এর ফলে দেহের ওজন কমেতে থাকে, ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

স্নেহ পদার্থ

খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। স্নেহ পদার্থ, ফ্যাটিএসিড ও গ্লিসারল সমন্বয়ে গঠিত। স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। ফ্যাটিএসিড ও গ্লিসারল ক্ষুদ্রান্তের লসিকানালীর মাধ্যমে শোষিত হয়।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :

১) উদ্ভিজ্জ স্নেহ এবং ২) প্রাণিজ স্নেহ।

উদ্ভিজ্জ স্নেহ উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত। যেমন নারকেল তেল, সরিষার তেল, বাদাম তেল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি। প্রাণী থেকে প্রাপ্ত স্নেহকে প্রাণিজ স্নেহ বলে। যেমন—ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি।

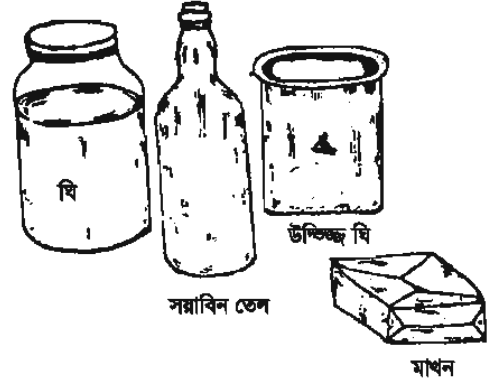
স্নেহ পদার্থের উৎস

১। প্রথম শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে থাকে শতকরা ১০০ ভাগ স্নেহ।

যেমন—ঘি, মাখন, বিভিন্ন ধরনের তেল যথা—বাদাম, সরিষা, কডমাছের তেল ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে স্নেহ উপাদান থাকে শতকরা ৪০-৬০ ভাগ। বিভিন্ন ধরনের বাদাম। যেমন—চিনাবাদাম, পেস্তাবাদাম, আখরোট ইত্যাদি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ খুবই কম থাকে। যেমন—দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৩ : কতকগুলো স্নেহ জাতীয় খাদ্য

কাজ

স্নেহ পদার্থ নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে—

- ১। দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।
- ২। অতিরিক্ত স্নেহ চর্বিরূপে দেহে সঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে এসব চর্বি দেহে শক্তি যোগায়।
- ৩। স্নেহ, দেহ থেকে তাপ অপচয় রোধ করে।
- ৪। চর্মরোগ প্রতিরোধ করে এবং ত্বককে মসৃণ রাখে।
- ৫। স্নেহ ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', ও 'কে' দ্রবীভূত করে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিণত করে।

স্নেহ পদার্থের অভাবের ফল

- ১। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাবে চামড়া শুষ্ক ও খসখসে ভাব ধারণ করে।
- ২। ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', এবং 'কে' স্নেহ পদার্থে দ্রবীভূত হয়ে দেহের মধ্যে প্রেরিত হয়। স্নেহ পদার্থের অভাব হলে এ ভিটামিনগুলোর অভাব দেখা দিতে পারে।
- ৩। আমাদের দেহকে সুস্থ রাখতে হলে কতকগুলো ফ্যাটিএসিড প্রয়োজন। এসব এসিড দেহে প্রস্তুত হতে পারে না। স্নেহ জাতীয় খাদ্যবস্তুর সাথে এগুলো দেহে সরবরাহ হয়। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাব হলে এ সকল এসিডেরও অভাব হয় এবং চর্মরোগ দেখা দেয়।

খাদ্যে স্নেহ পদার্থের আধিক্যের ফল

অতিরিক্ত চর্বি কোলেস্টেরল বাড়ায়। হৃদযন্ত্র ও ধমনীর অন্তঃআবরণীতে চর্বি জমে শক্ত হয়ে যায়। ফলে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। হৃদযন্ত্রে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হয়ে হৃদরোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া মেদবহুল দেহ সহজে এ রোগে আক্রান্ত হয়।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্যে আমিষ, শর্করা, স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণসমূহ ছাড়া আরও এমন কতকগুলো সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন যার অভাবে শরীর সহজেই বেরিবারি, স্কার্ভি, রিকেটস, রাতকানা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় অথবা বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রবণতা দেখা দেয়। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলতে আমরা খাদ্যের এসব সূক্ষ্ম উপাদানকে বুঝি। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না। জীবদেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ এদের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ভিটামিন সমূহকে ‘জৈবিক প্রভাবক’ বলে।

ভিটামিনের প্রকারভেদ : দ্রবণীয়তা গুণ অনুসারে ভিটামিনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

- ১। স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন—ভিটামিন ‘এ’, ‘ডি’, ‘ই’ এবং ‘কে’;
- ২। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন— ভিটামিন ‘বি’ কমপ্লেক্স এবং ‘সি’।

ভিটামিন ‘এ’

উৎস : কড ও শার্ক মাছের তেল, বিভিন্ন ধরনের তেলজাতীয় মাছ যেমন— ইলিশ, ডিমের কুসুম, ঘি, মাখন, যকৃৎ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি, যেমন—লালশাক, পুইশাক, পালংশাক, টমেটো, গাজর, বিট, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন—পেঁপে, আম ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ উপস্থিত।

কাজ

- ১। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে।
- ২। ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে সুস্থ রেখে দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।
- ৩। খাদ্যবস্তু পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করতে সাহায্য করে।
- ৪। রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।
- ৫। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অভাবজনিত রোগ

- ১। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
- ২। ‘এ’ ভিটামিনের অভাবে আবরণী কলার কোষগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ফলে ত্বক ক্রমশ অমসৃণ ও শুষ্ক হয়ে ওঠে।
- ৩। ‘এ’ ভিটামিনের অভাবে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- ৪। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ হতে পারে।



চিত্র ৩.৪ : ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি যুক্ত খাদ্য

ভিটামিন 'ডি'

উৎস : বিভিন্ন মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, চর্বি, পানীয় এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

কাজ : অল্প থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ঘটিত লবণ শোষণে সহায়তা করে দেহের অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ

- ১। শিশুদের রিকেটস নামক রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগে হাড় নরম ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং দেহের চাপে হাড় বঁকে যায়। অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের খাদ্যে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকলে সন্তানদের এ রোগের আশঙ্কা থাকে।
- ২। দাঁতের গঠন ব্যাহত হয়।
- ৩। বয়স্কদের অস্টিয়োম্যালাসিয়া রোগ হয়। এ রোগে বয়স্কদের হাড় থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হয়ে ক্রমশ দুর্বল ও নরম হয়ে ওঠে।

ভিটামিন 'ই'

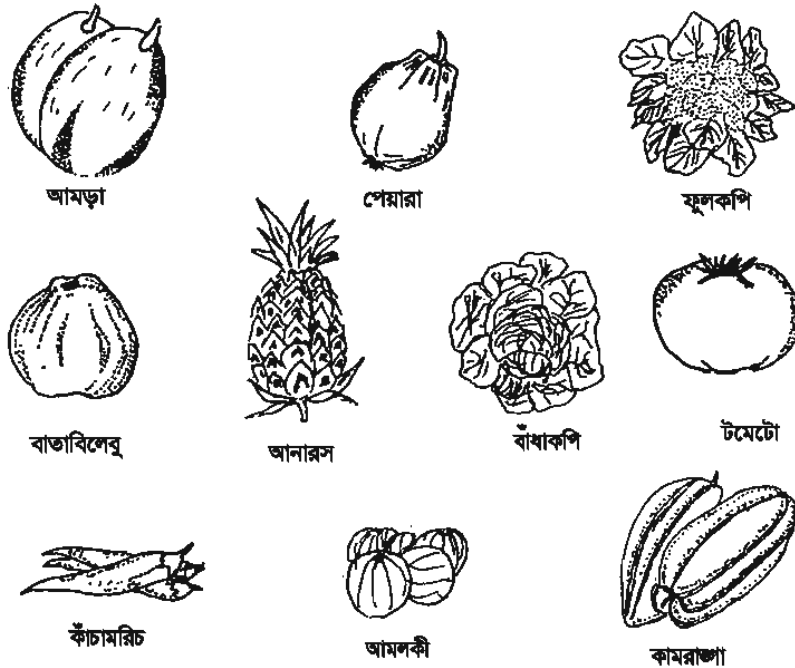
উৎস : প্রায় সব খাদ্যেই কমবেশি এ ভিটামিন পাওয়া যায়। শাক-সবজি প্রধান উৎস। ডিমের কুসুম, মটরশুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

অভাবজনিত রোগ

শিশু ও বালকদের ক্ষেত্রে এ ভিটামিনের অভাবে রক্তকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শ্বেতকণিকা বিনষ্ট হতে পারে।

ভিটামিন 'সি'

উৎস : টাটকা শাক-সবজি ও ফল, বিশেষ করে টক জাতীয় ফল যেমন-লেবু, বাতাবিলেবু, আমলকী, কমলালেবু, অঙ্কুরিত ছোলা, গিচু, তরমুজ, পেঁপে, বাঁধাকপি, কামরাজা, টমেটো, আনারস ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় (চিত্র-৩.৫)।



চিত্র ৩.৫ : কতকগুলো ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্য

কাজ

- ১। দাঁত ও হাড়ের পুষ্টিসাধন করে।
- ২। রক্তের বিশুদ্ধতা ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
- ৩। পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং
- ৪। বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

অভাবজনিত রোগ

এ ভিটামিনের অভাবে শিশুদের নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন—মাড়ি ফুলে ওঠা, ওজন হ্রাস, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি। বয়স্কদের দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে, ক্ষত শূকাতে দেরি হয়। চর্মরোগ হয়। গুরুতর ঘাটতি হলে স্কার্ভি নামক রোগ হয়।

ভিটামিন ‘বি’ কমপ্লেক্স

ভিটামিন ‘বি’ কমপ্লেক্স গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হল বিশেষ বিশেষ উৎসেচকের অংশ হিসেবে খাদ্যের আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করা এবং এদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করা।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গোষ্ঠীভুক্ত ভিটামিনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপ :

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
বি ১ (থায়ামিন)	টেকি ছাঁটা চাল, গম, ছোলা, মটর, বীট, ফুলকপি, বরবটি, চিনা বাদাম, যকৃৎ বৃক্ক, বিভিন্ন ফল ও সবজি।	প্রধান কাজ হল শর্করা বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তি মুক্ত করা। তাছাড়া স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।	অল্প ঘাটতি হলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, আবেগ প্রবণতা হ্রাস, খিটখিটে মেজাজ, ওজন হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। বেশি ঘাটতি হলে বেরিবেরি রোগ হয়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দেখা দেওয়া; স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হওয়া এবং দেহের পঙ্জুতা দেখা দেয়।
বি ২ রিবোফ্লবিন)	সবুজ শাক-সবজি, শিম, মাছ, দুধ ও অঙ্কুরিত ছোলা।	অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেট এর বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।	এ ভিটামিনের অভাব হলে জিহ্বার স্ফীতি ঘটে, মুখে ও ঠোঁটের কোনায় ঘা, ত্বক কুঁচকে যাওয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। চোখ জ্বালা করা ও দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা এ ভিটামিনের অভাবে দেখা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে বৃন্দী স্তিমিত হয়। ত্বক খসখসে হয় এবং চুল পড়ে যায়।
বি ৬ (পাইরিডক্সিন)	চাল, গম, মাছ, মাংস, সবুজ সবজি এবং অঙ্কুরিত শস্য।	শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।	শিশু খাদ্যে এ ভিটামিনের অভাব হলে অ্যানিমিয়া ও ওজন হ্রাস পায়। স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাক তন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়।
বি ১২ (সায়ানো কোবালামিন)	দুধ, ডিম, মাছ, মাংস।	লোহিত কণিকাবৃন্দী ও উৎপাদনে সহায়তা করে। শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	এ ভিটামিনের অভাবে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।

খনিজ লবণ

শরীর গঠনে আমিষের পরেই খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ লবণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিনের এবং প্রতিবারের খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। বিশেষ করে খাদ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিনের উপস্থিতি অপরিহার্য।

উৎস : দুধ, পনির, ডিমের কুসুম, বাদাম, বিভিন্ন ধরনের ফল, শাক-সবজি, ডাল, গম, টেকি ছাঁটা চাল প্রভৃতি হতে আমরা বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ পেয়ে থাকি।

কাজ :

- ১। দেহের উপাদান গঠনে অংশ নেয়।
- ২। খাদ্য হতে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
- ৩। পেশি সংকোচনে সহায়তা করে।
- ৪। দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা করে।
- ৫। বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখে।

প্রধান প্রধান কাজের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

- ১। অস্থি, পেশি, রক্ত ইত্যাদি গঠনে সক্রিয় অংশ নেয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, সালফার ও তামা।
- ২। দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় অংশ নেয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদি।
- ৩। খাদ্য হতে শক্তি মুক্ত করতে সাহায্য করে সালফার, ফসফরাস, আয়োডিন ইত্যাদি।

অভাবজনিত রোগ

- ১। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থির পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়।
- ২। ক্যালসিয়ামের অভাবে ফসফরাস অস্থি ও দাঁতের পুষ্টিসাধন করতে পারে না।
- ৩। খাদ্যে লৌহঘটিত লবণের অভাব হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শরীর দুর্বল হয় এবং পরিশেষে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
- ৪। আয়োডিনের ঘাটতি হলে গলগন্ড রোগ হয়।

পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। প্রাণিদেহের ৬০-৭৫ ভাগই পানি। পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং খাদ্যের সাথে গৃহীত হয়। পানি প্রাণিদেহে দ্রাবকের কার্য সম্পাদন করে। খাদ্যসার প্রাথমিকভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয়। অতঃপর রক্তে স্থানান্তরিত হয়। পানির মাধ্যমে দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংগঠন এবং ঘর্ষণজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

অভাবের ফল

পানির অভাবে পানি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়। পাচক রস ও খাদ্যরসের তরলায়ন ব্যাহত হয় যা পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। পানির অভাবে বৃক্কের রেনচন পদার্থ নিষ্কাশন বিঘ্নিত হয়। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি আয়তনের ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে পেশির দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা যায়। পানির

অভাব ক্ষুধামন্দাও সৃষ্টি করে থাকে। দেহে জলীয় অংশের শতকরা ১০ ভাগ বের হয়ে গেলে অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তখন রক্ত সংবহনে ব্যাঘাত ঘটে, খাদ্যসার ঠিকমত শোষিত হয় না, বৃক্কের কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়, অল্পক্ষারের সমতা নষ্ট হয়ে অ্যাসিডোসিস সৃষ্টি করে। কলেরা বা উদরাময় রোগ হলে রোগীকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে কারণ এ রোগের কারণে দেহে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়। এখানে ব্র্যাক কর্তৃক প্রদত্ত খাবার স্যালাইন তৈরির প্রক্রিয়া দেওয়া হল—

ক) তিন আঙুলের প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত এক চিমটি লবণ, এক মুঠো গুড় এবং আধাসের ফুটন্ত পানি ঠান্ডা করে অথবা সমপরিমাণ টিউবওয়ালের পানিতে ভাল করে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে। এছাড়া—

খ) ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাওয়ার স্যালাইন ওষুধের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়। এটিও পানিতে গুলে একই নিয়মে ব্যবহার করা যায়। মনে রাখতে হবে যে—

- ১। পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগী যতটুকু খেতে পারে ততটুকু স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং সাথে অন্যান্য খাবারও খেতে হবে,
- ২। বমির কারণে স্যালাইন বন্ধ করা যাবে না,
- ৩। শিশুর ক্ষেত্রে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখা যাবে না,
- ৪। শিশুকে নিয়মিত অন্যান্য খাবার দিতে হবে।

রাফেজ

শস্যদানা, ফল এবং সবজির অপাচ্য তত্ত্বময় অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। রাফেজ অপরিবর্তিত রূপে খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে স্থানান্তরিত হয়। ফল এবং সবজির রাফেজ সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর।

রাফেজযুক্ত খাবারের উপকারিতা : গবেষণায় দেখা গেছে স্বল্প তত্ত্বযুক্ত খাদ্য অধিক তত্ত্বযুক্ত খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, খাদ্যনালীর ক্যান্সার ইত্যাদির জন্য দায়ী। কীভাবে রাফেজ উপরোল্লিখিত রোগগুলো প্রতিরোধ করে তা এখনও অস্পষ্ট। তবে প্রাপ্ত তথ্যের সর্বাধিকসংখ্যক নিম্নরূপ :

- ক) অল্প তত্ত্বযুক্ত খাদ্য খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে ঐটি শুকিয়ে খাদ্যনালীর গাত্রে পিণ্ডের সৃষ্টি করে এবং পরিণতিতে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। এ পিণ্ড বা দলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যনালীর গাত্রে স্ফীতির সৃষ্টি হয়।
- খ) রাফেজযুক্ত খাবার একটি দৃঢ় স্ফীত পিণ্ড গঠন করে। ফলে খাদ্যনালীর পেশি ক্রমসংকোচন সঞ্চালনে সহজেই স্থানান্তরিত হয়।
- গ) রাফেজযুক্ত খাদ্য বিষাক্ত বর্জ্যনীয় বস্তুকে খাদ্যনালী হতে পরিশোধন করে। এতে ধারণা হয়, উচ্চ তত্ত্বযুক্ত খাদ্য, খাদ্যনালীর ক্যান্সারের আশঙ্কা হ্রাস করে।
- ঘ) তত্ত্বযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস করে, ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস করে, চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাস করে।

সুষম খাদ্য

যে খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালোরি চাহিদা পূরণ করে, কলা কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

বয়স, যৌন পার্থক্য, দৈহিক অবস্থা এবং শ্রমের পরিমাণ হিসেবে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তির সুষম খাদ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত খাদ্য উপাদানগুলো থাকা প্রয়োজন। যেমন—

- ১। দেহগঠনের উপযোগী খাদ্য বা শর্করা ও স্নেহ পদার্থ। যেমন—চাল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি।
- ২। শক্তি ও তাপ সরবরাহকারী খাদ্য বা শর্করা ও স্নেহ পদার্থ। যেমন—চাল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি।
- ৩। প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য বা ভিটামিন ও খনিজ লবণ। যেমন—শাক-সবজি, দুধ, ফল ইত্যাদি।

মূল খাদ্য তালিকা

কতকগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম মূল খাদ্য-তালিকা তৈরি করতে হবে, যথা :

- ১। প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থা ভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সে দিকে লক্ষ রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- ২। দৈনিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য থাকতে হবে।
- ৩। খাদ্যে দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করতে হবে।
- ৪। খাদ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে।
- ৫। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করতে হবে। পরে প্রয়োজনমত যে কোনো বিভাগ থেকে খাদ্য বাছাই করা যায়। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকতে হবে।
- ৬। খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে।
- ৭। ব্যক্তির বা পরিবারের আর্থিক সজ্ঞতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- ৮। ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

নিম্নে সন্তান সম্ভবা মা, প্রসূতি মা এবং ৬ মাসের শিশুর সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হল—

মায়ের উপযোগী সুষম খাদ্যতালিকা

খাদ্য উপাদান	সন্তান সম্ভবা মা (গ্রাম)	প্রসূতি মা (গ্রাম)
ভাত/রুটি	১৬০	১৮০
টাতকা লাল শাক-সবজি	১০০	১০০
টাতকা পেঁপে, পটোল, কুমড়া, আলু, নিরামিষ	৬০	৮০
মসুর ডাল	৪০	৪০
মেনি মাছ ভাজা	৬০	৮০
দুধ	১২০	১৫০
গুড়/চিনি	২০	৩০
কলা	২০	১০০

৪। নিচে চারজন লোকের বয়স, পেশা এবং শরীরের ওজন দেওয়া আছে। কোন পেশার লোকটির প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি ক্যালরির দরকার হবে?

ক্রম	বয়স	পেশা	ওজন
১	১৫ বছর	শিক্ষার্থী	৪০ কেজি
২	২৮ বছর	খেলোয়াড়	৫৫ কেজি
৩	৪২ বছর	শিক্ষক	৬২ কেজি
৪	৪৫ বছর	ডাক্তার	৭২ কেজি

ক. শিক্ষার্থী

(খ) খেলোয়াড়

গ. শিক্ষক

(ঘ) ডাক্তার।

সৃজনশীল প্রশ্ন

অপু রাত জেগে পড়াশুনা করে। শাকসবজি একদমই খায় না, ইদানীং প্রায়ই সে রাতে ভাল দেখতে পায় না। মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. ভিটামিন কী?

খ. ভিটামিন দেহের জন্য প্রয়োজন কেন?

গ. অপু কী রোগ হয়েছে— এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তার কোন কোন শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন?

ঘ. স্বাস্থ্য রক্ষায় শাকসবজির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

খনিজ পদার্থ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলে খনিজ দ্রব্যের অবদান সর্বাধিক। পাথুরে লবণ থেকে শুরু করে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, পেঙ্গিল তৈরির সীস, মূল্যবান পাথর, হীরা ইত্যাদি প্রায় দুহাজার ধরনের খনিজ পদার্থের সম্মান পেয়েছি আমরা। এর মধ্যে প্রায় এক শত অতি পরিচিত, বাকিগুলো খুবই দুর্লভ। অতি প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ জেনে এসেছে মাটির গভীরে আছে খনি। খনি থেকে গর্ত খুঁড়ে আহরণ করতে হয় খনিজ। এই খনিজ থেকে উৎপন্ন হয় লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট ইত্যাদি। যা দিয়ে তৈরি হয় দালান, বাড়ি, কৃষি কাজের জন্য তৈরি হয় সার, শিল্প-কারখানার জন্য রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল খনিজ কী?

খনিজ কী?

সাধারণ অর্থে খনি থেকে যা তোলা হয় তাই খনিজ। ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন প্রকার শিলার গঠন উপাদানই খনিজ। অন্যভাবে বলা যায় বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত হয় শিলা। আর খনিজ হচ্ছে একটি যৌগিক পদার্থ যার সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকে প্রাপ্ত দুই বা ততোধিক স্বাভাবিক মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে। তবে এমন খনিজও আছে যা একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। যেমন-হীরা, সোনা, গন্ধক, তামা ইত্যাদি। প্রকৃতিতে হীরা ও সোনা মৌলিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়। সালফার, তামা ইত্যাদি মৌলিক ও যৌগিক উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থের উৎস

আগে ধারণা করা হত খনিজ পদার্থের উৎস ভূগর্ভ। কিন্তু এ ধারণা এখন আর সঠিক বলে ধরা হয় না। ভূ-ত্বকেও কিছু খনিজ দ্রব্যের সঞ্চয় দৃষ্ট হয়। যেমন-লৌহজাত খনিজ (হেমাটাইট), অ্যালুমিনিয়ামজাত খনিজ (বক্সাইট)। অনেক ক্ষেত্রে কয়লার মতো মূল্যবান খনিজও পাওয়া যায় ভূ-ত্বকেই। এ ধরনের খনিজ উৎসকে বলা হয় ভূপৃষ্ঠ খনি। আবার অনেক খনিজ আহরণের জন্য আমাদের ভূত্বকের গভীরে খাদ কেটে, গর্ত খুঁড়ে নিচে নামতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিলা স্তরের মধ্যে বা স্তরে স্তরে খনিজ সঞ্চিত থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনি পাওয়া গেছে ভূত্বকের প্রায় তিন কিলোমিটার গভীরে। খনিজের এ ধরনের উৎসকে বলা হয় ভূ-গর্ভস্থ খনি।

আকরিক কী?

আমরা জেনেছি প্রকৃতিতে বা খনিতে খুব কম পদার্থই মৌলিক হিসেবে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ খনিজই একাধিক মৌলের যৌগ হিসেবে থাকে। কোনো একটি বিশেষ মৌলকে সংগ্রহ করতে হলে এমন একটি খনিজ খুঁজে নিতে হয় যার মধ্যে নির্দিষ্ট মৌলটি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান এবং সুবিধাজনক উপায়ে তা থেকে মৌলটি আলাদা করে সংগ্রহ করা যায়। যে খনিজ থেকে সহজে এবং লাভজনক উপায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌলিক পদার্থ আহরণ করা যায় তাকে ঐ মৌলের আকরিক বলে। যেমন-হেমাটাইট খনিজে পাওয়া যায় শক্ত, দানাদার ও ঐশ্বর্য্যুক্ত একটি পদার্থ যা মূলত লোহা এবং অক্সিজেনের যৌগ। এর রাসায়নিক নাম আয়রন অক্সাইড। এ থেকে লোহা সহজ ও লাভজনকভাবে নিষ্কাশন করা যায়। তাই হেমাটাইট হল লোহার আকরিক। তদুপ অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক হল বক্সাইট। এগুলো ধাতব আকরিক। ধাতুর ন্যায় অধাতুর আকরিকও ভূ-ত্বকে বা ভূ-গর্ভে পাওয়া যায়, যা থেকে সর্বাধিক অধাতুর মৌলটি নিষ্কাশন করা হয়। যেমন-বেরিয়ামের আকরিক ব্যারাইট, কার্বনের আকরিক গ্রাফাইট, কয়লা ইত্যাদি।

আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন

খনিতে কিছু কিছু আকরিক মৌল হিসেবে পাওয়া যায়। ধাতব মৌলের মধ্যে প্রকৃতিতে অল্প পরিমাণে প্লাটিনাম, সোনা, রূপা ও পারদ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়; অধিকাংশই থাকে যৌগ রূপে। ধাতুর যৌগ আকরিকগুলোর মধ্যে থাকে ধাতব অক্সাইড, সালফাইড, কার্বনেট, সালফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি।

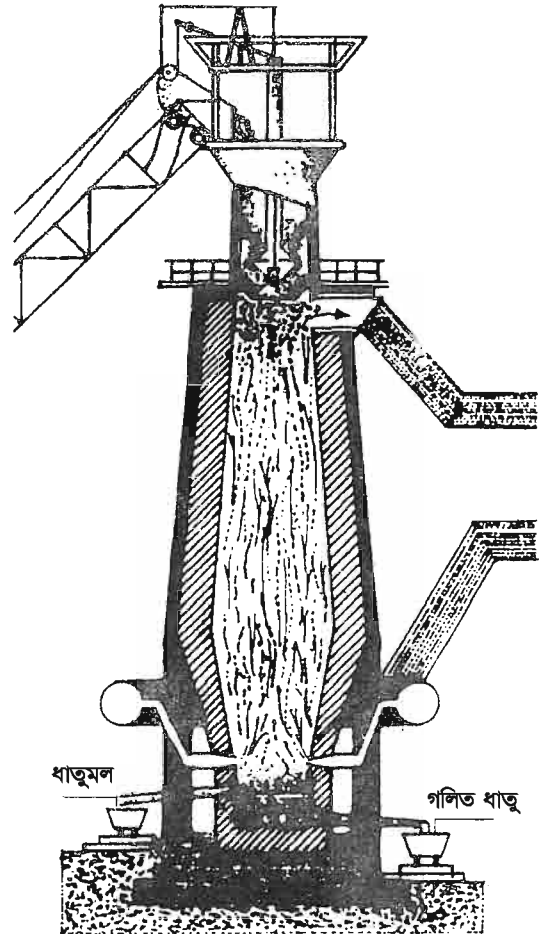
প্রকৃতিতে সব আকরিক পদার্থই মাটি, বালি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাথে মিশে থাকে। এ সব খনিজ অপদ্রব্যকে বলে খনিজমল বা গ্যাং। সাধারণত অতি উচ্চ তাপমাত্রায় খনিজমল দূরীভূত হয় এবং উত্তাপের প্রভাবে আকরিক বিশ্লিষ্ট হয়ে মৌলটি আলাদা হয়ে যায়। কোনো কোনো ধাতু নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। গলিত বা দ্রবীভূত আকরিকের মধ্যে দুটি ধাতুব দণ্ড ডুবিয়ে দণ্ড দুটিকে বিশেষ উপায়ে বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযুক্ত করে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। কিছু কিছু অধাতু মৌল হিসেবেই খনি থেকে সংগৃহীত হয়। যেমন—সালফার, কার্বন ইত্যাদি।

লোহা ও ইস্পাত

লোহা একটি ধাতব মৌল। সুপ্রাচীন কাল থেকেই লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠে বা ভূ-ত্বকে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে লৌহ খনিজ পাওয়া যায়। কিন্তু আকরিক হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল—হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, লিমোনাইট, সিডেরাইট এবং পাইরাইটস।

শিল্প ক্ষেত্রে লোহার আকরিকের সাথে কোক (কার্বন চূর্ণ) এবং চুনাপাথর মিশিয়ে অতি উচ্চ তাপে ব্লাস্ট ফারনেস নামক বিশেষ চুলায় গলানো হয়। এতে লোহার বিভিন্ন অপদ্রব্য দূর হয়। গলিত লোহা চুলার তলায় জমা হয়। এই গলিত লোহাকে ছাঁচে ঢালাই করা হয়। এভাবে যে লোহা পাওয়া যায় তাকে ঢালাই লোহা বলে। ঢালাই লোহা প্রস্তুতের সময় এর মধ্যে কিছু পরিমাণ কার্বন (প্রায় ৪%) মিশে যায়। এই কার্বন ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূর করলে যে লোহা পাওয়া যায় তার নাম পেটা লোহা। ঢালাই লোহা শক্ত ও ভঙ্গুর, আবার পেটা লোহা নরম। বিভিন্ন কাজে এই দুধরনের লোহার কোনোটিই বেশি ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই এই দুই ধরনের লোহার মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন এক ধরনের লোহা তৈরি করা হয়, যার নাম দেয়া হয়েছে ইস্পাত।

যে লোহায় কার্বনের পরিমাণ শতকরা ০.০৮ থেকে ১.৫ এর মধ্যে তাকে ইস্পাত বলে। ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণের ওপর এর গুণাগুণ নির্ভর করে। ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ০.৫ এর কম হলে তাকে নরম ইস্পাত বলে। কার্বনের পরিমাণ ০.৫ এর বেশি হলে তাকে শক্ত ইস্পাত বলে। ইস্পাতে কার্বনের সাথে আরও এক বা একাধিক মৌল খুব সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে ইস্পাতের গুণাগুণ আরও উন্নত করা হয়। যেমন—ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতে মরিচা পড়ে না, এই ইস্পাতকে তাই মরিচারোধী বা স্টেইনলেস স্টিল বলে। এই ইস্পাত দিয়ে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। এভাবে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে বিশেষ কাজে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত তৈরি করা হয়।



চিত্র ৪.১ : ব্লাস্ট ফারনেস

কঠিন ইস্পাতকে উত্তপ্ত করে ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে এবং হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে নমনীয় করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে পান দেওয়া। বিভিন্ন কাজে ইস্পাতের বিভিন্ন মাত্রায় নমনীয়তা প্রয়োজন। যেমন— লোহা কাটার ইস্পাত এবং স্প্রিং তৈরির ইস্পাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। পান দেওয়ার সময় বিভিন্ন পরিমাণ তাপমাত্রার উত্তপ্ত করে ইস্পাতকে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন করা হয়।

লোহা ও ইস্পাতের ধর্ম

বিশুদ্ধ লোহা উজ্জ্বল সাদাটে ধাতু। চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। শুষ্ক বাতাসে লোহার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর্দ্র ও ভিজা বাতাসে লোহার উপর এক ধরনের লালচে বাদামি বর্ণের আস্তরণ পড়ে। একে মরিচা বলে। ঢালাই লোহায় কার্বনের পরিমাণ শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ। পেটা লোহায় কার্বন প্রায় থাকে না বললেই চলে। ঢালাই লোহা শক্ত ও ভজুর। একে ঢালাই করে পিণ্ড তৈরি করা যায়, কিন্তু বাঁকানো বা মোচড়ানো যায় না। একে পিটিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা যায় না বা জোড়া লাগানো যায় না। পেটা লোহা ভজুর না হলেও নরম, এই লোহা পিটিয়ে পাত করা যায়, জোড়া লাগানো যায়।

ইস্পাতকে পিটিয়ে জোড়া লাগানো যায়। এতে পান দেয়া যায়। এ দিয়ে স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা যায়। শক্ত, নরম, ভজুর, মজবুত, মরিচারোধী বিভিন্ন রকমের ইস্পাত তৈরি করা সম্ভব।

লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার

ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সামান্য আলপিন থেকে শুরু করে বড় বড় জাহাজ, আকাশ হোয়াইল ইত্যাদি সব কিছু তৈরিতে লোহা বা ইস্পাত প্রয়োজন। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য লোহার পাইপ, ম্যানহোলের ঢাকনা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় ঢালাই লোহাকে ছাঁচে ঢেলে। পেটা লোহা থেকে তৈরি হয় তার জাল, বৈদ্যুতিক চুম্বক, লোহার রেলিং, গ্রিল, গেট ইত্যাদি। ইস্পাতের ব্যবহার এত বেশি যে বলে শেষ করা যায় না। ছুরি, কাঁচি, ঘড়ি, চুম্বক, থালা, গ্লাস, ইঞ্জিন, রেল লাইনের পাত, চাকা, মেশিন গান, ট্রাক, পুল, কালভার্ট, খেলনা, কৃষি যন্ত্রপাতি, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত।

লোহা ও ইস্পাতের মরিচা

লোহা ও ইস্পাতের জিনিস অনেক দিন খোলা বাতাসে রেখে দিলে এর গায়ের উপর লালচে বাদামি রঙের প্রলেপ পড়ে। ক্রমেই এই প্রলেপ পুরু হতে থাকে। তারপর এক সময় মাছের ঔঁইশের মতো খুলে খুলে পড়তে থাকে। একেই বলে মরিচা। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় জং। আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার বিক্রিয়ায় এক ধরনের হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইড যৌগ সৃষ্টি হয়। এ যৌগই মরিচা। মরিচা লোহার রং নষ্ট করে। লোহার সামগ্রীতে মরিচা পড়লে তা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে ভজুর হয়ে যায় এবং অবশেষে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। বারে বারে নতুন জিনিস কেনার চেয়ে মরিচা রোধ করা বরং কম ব্যয়বহুল।

মরিচা প্রতিরোধের উপায়

সাধারণত ধাতুর উপরিতলে রং বা গ্রিজ দিয়ে, মেশিনের ঘূর্ণনশীল অংশে তেল বা গ্রিজ দিয়ে মরিচা রোধ করা হয়। লোহাকে গলিত দস্তায় ডুবিয়ে লোহার উপর দস্তার পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। লোহার উপর দস্তার প্রলেপ থাকলে মরিচা পড়তে পারে না। গুঁড়া দুধের টিন বা অন্যান্য টিনজাত খাবারের কৌটা মূলত লোহা বা ইস্পাতের তৈরি। এদের উপর পাতলা টিন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া থাকে। এভাবে কোনো ধাতুর ওপর দস্তার প্রলেপ দেওয়াকে বলে গ্যালভানাইজিং।

লোহা বা ইস্পাতের তৈরি অনেক সামগ্রীর ওপর তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলে ইলেকট্রোপ্লেটিং। ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে লোহার উপর নিকেল, ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এমনকি সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপও দেওয়া হয়। এতে লোহা ও ইস্পাতের উপর মরিচা পড়ে না। উপরন্তু লোহা ও ইস্পাত প্রলেপ ধাতুর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। এ বর্ণ সামগ্রীটির উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বাড়ায়।

ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশিয়ে যে বিশেষ ইস্পাত তৈরি করা হয় তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে। এতে মরিচা ধরে না।

সংকর ধাতু

দুই বা ততোধিক ধাতুর সমসত্ত্ব মিশ্রণে যে কঠিন পদার্থ তৈরি হয় তাকে সংকর ধাতু বলে। যেমন গলিত তামা এবং দস্তা যে কোনো অনুপাতে মিশিয়ে ঠান্ডা করলে এক ধরনের শক্ত ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। এটি একটি সংকর ধাতু। অনেক সময় একে ধাতু সংকরও বলে। সংকর ধাতুর ভৌত গুণাগুণ মূল ধাতুগুলো থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সংকর ধাতুতে মূল ধাতুর বর্ণ, নমনীয়তা, প্রসারণ ক্ষমতা, তড়িৎ বাহিতা ইত্যাদির পরিবর্তন হয়। এর গলনাঙ্ক মূল ধাতুর গলনাঙ্ক থেকে কম হয়। তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ, তামা এবং দস্তার মিশ্রণে তৈরি হয় ব্রাস বা পিতল। ব্রোঞ্জ এবং পিতলের ন্যায় স্টেইনলেস স্টিলও একটি সংকর ধাতু।

অ্যালুমিনিয়াম

পৃথিবীতে যে ধাতুটি অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তা হল অ্যালুমিনিয়াম। কিন্তু প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না। অ্যালুমিনিয়াম অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সাথে যৌগ গঠন করে অবস্থান করে। অ্যালুমিনিয়ামের আকরিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বক্সাইট।

অ্যালুমিনিয়ামের বর্ণ সাদা ও রূপালি। এতে সামান্য নীলাভ দ্যুতি আছে। ধাতুটি অত্যন্ত হালকা, আপেক্ষিক ঘনত্ব ২.৭। একে পিটিয়ে পাত করা যায়, টেনে সরু তার তৈরি করা যায়। এর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বেশি। আর্দ্র বাতাসে অ্যালুমিনিয়ামের উপর অক্সাইডের পাতলা আবরণ পড়ে। কিন্তু এতে অ্যালুমিনিয়ামের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। বরং অক্সাইডের প্রলেপ ভেতরের অ্যালুমিনিয়ামকে অক্সিজেনের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই লোহার মরিচার মতো এটি ক্ষতিকারক নয়।

চুইংগাম, কেক, চকোলেট মোড়ার পাত থেকে শুরু করে উড়োজাহাজ পর্যন্ত তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল উৎপাদনে, রান্নার হাঁড়িপাতিল প্রস্তুতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ি, সেতু, ঘরের জানালা দরজার ফ্রেম, খেলনা ইত্যাদি তৈরিতে অ্যালুমিনিয়ামের ধাতু সংকর ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের একটি ধাতু সংকর হল ডুরালুমিন। তামা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে ডুরালুমিন প্রস্তুত হয়। এটি উড়োজাহাজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া আয়নার পলিশ, ভার্নিশ, ক্যামেরার ফ্লাশ ও বাস্তবের ফিলামেন্ট তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। তিসির তেল বা ভার্নিশ তেলের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ মিশিয়ে তৈরি হয় রূপালি রঙের উজ্জ্বল, চকচকে ও দীর্ঘস্থায়ী ভার্নিশ।

অধাতু ও বহুরূপতা

খনিতে যেমন পাওয়া যায় বিভিন্ন ধাতব আকরিক তেমনি পাওয়া যায় বিভিন্ন অধাতুর আকরিক। কিছু কিছু অধাতুর আকরিক প্রকৃতিতে পাওয়া যায় বিশুদ্ধ মৌল হিসেবে। কিন্তু এই অধাতব মৌলগুলোর মধ্যে এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হল, একই মৌল প্রকৃতিতে ভিন্ন ভৌত গুণাগুণ প্রদর্শন করে, অথচ এদের রাসায়নিক

ধর্মের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অন্যভাবে বলা যায় কিছু অধাতব মৌলের রাসায়নিক ধর্ম মোটামুটি অভিন্ন হলেও এদের ভৌত ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা বিদ্যমান। এই মৌলগুলোকে বলা হয় বহুরূপী মৌল এবং মৌলের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বহুরূপতা।

কার্বন এইরূপ একটি বহুরূপী মৌল। প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে কার্বন পাওয়া যায়। যেমন—হীরক, গ্রাফাইট, প্রাণিজ কয়লা, খনিজ কয়লা, কাঠ কয়লা, ভুসা কয়লা, দীপ কালি ইত্যাদি। এগুলো কার্বনের রূপভেদ। গন্ধক ও ফসফরাস অনুরূপ দুটি বহুরূপী মৌল। প্রকৃতিতে চার ধরনের গন্ধক এবং দুই ধরনের ফসফরাস পাওয়া যায়।

গ্রাফাইট ও হীরক

কার্বনের দুটি বিশেষ রূপ হল হীরক ও গ্রাফাইট। দুটি পদার্থই খনিতে পাওয়া যায়। ভূ-গর্ভের অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে কোটি কোটি বছর ধরে রূপান্তরিত হওয়ার পর কার্বন কেলাসিত হয়ে গ্রাফাইট ও হীরকে পরিণত হয়েছে।

গ্রাফাইট ধূসর রঙের পদার্থ। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। তড়িৎ শলাকা রূপে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। টর্চ ব্যটারির মধ্যে আমরা যে কালো দণ্ডটি দেখি এটি গ্রাফাইটের তৈরি। গ্রাফাইট নরম ও সাবানের মতো পিচ্ছিল। এজন্য কলকজায় পিচ্ছিলক বা লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাগজের উপর গ্রাফাইট ঘসলে দাগ পড়ে। তাই কাঠ পেন্সিলের সীস তৈরিতে গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়। গ্রাফাইট শব্দটি গ্রিক শব্দ, এর অর্থ আমি লিখি। গ্রাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে কাদা মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের সীস তৈরি করা হয়। যে সীস যত শক্ত ও সরু তাতে কাদার ভাগ তত বেশি। পেন্সিলের সীস যত নরম ও মোটা তাতে গ্রাফাইটের পরিমাণ তত বেশি।

প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে হীরক সবচেয়ে কঠিন। পৃথিবীর বেশির ভাগ হীরক পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। কৃত্রিম উপায়েও হীরক তৈরি করা যায়। প্রকৃতিতে হীরক পাওয়া যায় কেলাসিত বা দানা বাঁধা অবস্থায়। সাধারণত হীরক স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। হীরকের মধ্য দিয়ে আলো বিভিন্নভাবে বেঁকে যায় বলে একে চকচকে দেখায়। হীরককে বিশেষ উপায়ে কেটে বহুতল বিশিষ্ট করা হয়। এতে হীরকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

হীরক তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। এক্স-রেস সাহায্যে আসল ও নকল হীরক চেনা যায়। আসল হীরকের মধ্য দিয়ে এই রশ্মি যেতে পারে, নকল বা কৃত্রিম হীরকের মধ্য দিয়ে এ রশ্মি যেতে পারে না। অলংকার প্রস্তুতে রত্ন হিসেবে হীরকের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বিশেষ এক ধরনের হীরকের রং কালো। এর নাম দেওয়া হয়েছে কার্বডো। এই হীরক অত্যন্ত শক্ত। কাচ কাটা ও পলিশের কাজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়। হীরক চূর্ণ দিয়ে রং প্রস্তুত করা হয়।

খনিজ কয়লা

অকেলাসিত বা অদানাদার রূপে প্রকৃতি বা খনিতে যে কার্বন পাওয়া যায় তার নাম খনিজ কয়লা। কালো কঠিন শিলা স্তূপের মতো খনিতে স্তরে স্তরে কয়লা সঞ্চিত থাকে। তাপ উৎপাদনকারী পদার্থ হিসেবে এ কয়লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ বা প্রাকৃতিক কয়লা ছাড়াও কয়েক রকমের কয়লার সঙ্গে আমরা পরিচিত। যেমন—অপর্যাপ্ত বাতাসে কাঠ পোড়ালে যে কয়লা পাওয়া যায় তার নাম কাঠ কয়লা। এটি কার্বনের আর একটি রূপভেদ। প্রাণিজ কয়লা ও সক্রিয় কয়লা কার্বনের আরও দুটি রূপভেদ।

প্রাণিজ ও সক্রিয় কয়লা

বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্র প্রাণীর হাড় ও রক্ত রেখে তাপ প্রয়োগ করলে বিধ্বংসী পাতনের ফলে এক প্রকার কয়লা উৎপন্ন হয়। একে বলে প্রাণিজ কয়লা। প্রাণিজ কয়লা দুই প্রকার। অস্থিজ কয়লা ও রক্ত কয়লা।

প্রাণিজ দেহের হাড়ের বিধ্বংসী পাতনের ফলে উৎপন্ন কয়লাকে বলে অস্থিজ কয়লা। এ কয়লাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় আইভরি ব্ল্যাক। অনুরূপভাবে রক্তের বিধ্বংসী পাতন করলে রক্ত কয়লা পাওয়া যায়। এ কয়লা দ্রবণ থেকে রঞ্জক পদার্থ শোষণ করতে পারে বলে বিরঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাণিজ কয়লা শর্করা চিনির বর্ণ শোষণে এবং আইভরি ব্ল্যাক কালো রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ কয়লাকে অল্প বাতাসে অধিক উত্তপ্ত করলে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে বলে সক্রিয় কয়লা। সাধারণত নারকেলের মালা থেকে প্রাপ্ত কয়লা স্বল্প বাতাসে বা স্টিমে $৮৫০^{\circ}-৯০০^{\circ}$ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে সক্রিয় কয়লা তৈরি করা যায়। এ কয়লা গ্যাস মুখোশ তৈরিতে এবং ফিল্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধক

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গন্ধক বা সালফারের সঙ্গে পরিচিত। বেশিরভাগ গন্ধকই খনিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গন্ধক দানাদার বা কেলাসাকৃতির। সাধারণ অবস্থায় গন্ধকের বর্ণ উজ্জ্বল হলুদ। এটি পানিতে অদ্রবণীয় কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রবণীয়। গন্ধক তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। গন্ধক একটি বহুরূপী মৌল। এর চারটি রূপভেদ হল— রম্বিক গন্ধক, একাক্ষী গন্ধক, প্লাস্টিক বা নমনীয় গন্ধক এবং শ্বেত গন্ধক। গন্ধক খুবই সক্রিয় মৌল। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যৌগ গঠন করে। বাতাসে নীল শিখাসহ জ্বলে অত্যন্ত কটু দম আটকানো গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন করে। এ গ্যাসের নাম সালফার ডাইঅক্সাইড। গ্যাসটি অত্যন্ত বিষাক্ত এবং জীবাণুনাশক। এটি বিরঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের প্রধান উপাদান গন্ধক। গন্ধক, কার্বন ও সোরা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে বারুদ তৈরি করা হয়। রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে রবার শক্ত, নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। একে ভলকানাইজেশন বলে। জীবাণুনাশক ওষুধ তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। দিয়াশলাই, নানা প্রকার রং, সার প্রস্তুতিতে গন্ধক এবং কাগজ শিল্পে সালফার ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

ফসফরাস

ফসফরাস একটি অধাতব বহুরূপী মৌল। ফসফরাস একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ দীপ্তিমান। অন্ধকারে মৌলটি মৃদু আভা বিকিরণ করে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ফসফরাস। ফসফরাস অত্যন্ত সক্রিয় মৌল। প্রকৃতিতে ফসফরাস যৌগ অবস্থায় থাকে। ফসফরাসের প্রধান উৎস জীবজন্তুর হাড়, ডিমের হলুদ অংশ, দুধ, দই, মাছ ইত্যাদি এমনকি শিমের মধ্যেও ফসফরাস বিদ্যমান।

সালফারের মতো প্রকৃতিতে ফসফরাসও দানাদার বা কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর কেলাস দুই ধরনের। অর্থাৎ ফসফরাসের রূপভেদ দুটি। তা হল শ্বেত ফসফরাস ও লোহিত ফসফরাস। শ্বেত ফসফরাস ঈষৎ অস্বচ্ছ এবং মোমের মতো নরম। বাতাসের সংস্পর্শে এলেই উহা হালকা সবুজ দীপ্তিসহ জ্বলতে থাকে। অন্ধকারে ফসফরাসের মৃদু আভা বিকিরণের রহস্য এটাই। ফসফরাস পানিতে অদ্রবণীয়। তাই পানিপূর্ণ বোতলের মধ্যে ডুবিয়ে ফসফরাস সংরক্ষণ করা হয়। এটি একটি বিষাক্ত পদার্থ। হাতে ধরলে বা ত্বকের সংস্পর্শে এলে বিষাক্ত ঘা সৃষ্টি হয়, যা সহজে আরোগ্য হয় না। লোহিত বা লাল ফসফরাসের কোনো গন্ধ বা দীপ্তি নেই, সহজে জ্বলে না এবং কম বিষাক্ত।

ফসফেট এবং সুপার ফসফেট জাতীয় সার প্রস্তুতে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। দিয়াশলাই শিল্পে লোহিত ফসফরাস বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা দিয়াশলাই বাজের দুধারে কাগজের ওপর যে বারুদ লক্ষ করি তা আসলে কাচ চূর্ণ মিশ্রিত লাল ফসফরাসের প্রলেপ। শিরিস আঠার সাহায্যে বাজের গায়ে নির্ধারিত স্থানে এ প্রলেপ দেওয়া হয়। কাঠির মাথায় গুটির মত যে অংশটি থাকে তা সালফার, এন্টিমনি সালফাইড, লেড অক্সাইড বা পটাসিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণ। এটি শিরিস আঠার সাহায্যে লাগানো হয়। কাঠিটির বারুদযুক্ত মাথা বাজের নির্ধারিত স্থানে ঘষলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় এবং আগুন জ্বলে ওঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার অপরিহার্য, তাই লাল ফসফরাসের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না।

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিম মৌসুমি কাজ করে। এ কাজে সে লোহার তৈরি ছুরি, চাপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে। গত ঈদে রহিম গরু জবাই করতে গিয়ে লক্ষ করে তার ছুরি, চাপাতি সব ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। সে আর গরু জবাই করতে পারেনি।

- ক. কোন উপাদানের কারণে রহিমের ছুরি, চাপাতি ক্ষয় হয়ে গেছে?
- খ. উক্ত উপাদানটি গঠনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।
- গ. রহিমের পশু জবাইয়ের যন্ত্রপাতি কী কারণে ক্ষয় হয়ে গেছে এবং কীভাবে এ ক্ষয় রোধ করা যেত ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ছুরি, চাপাতি তৈরিতে লোহাই উপযোগী ধাতু—যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহনির্মাণ সামগ্রী

আদিমকালে মানুষ ছিল গৃহাবাসী। শিকারি মানুষ দল বেঁধে বসবাস করত। অতঃপর কৃষক ও পশুপালক মানব সন্তান স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তার এ জীবনযাপন পদ্ধতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা সম্পর্কে সে ছিল সজাগ। ফলে সে চেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষের এ নিরাপদ আশ্রয়ের ধারণা স্বচ্ছ এবং উহা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। ফলে সে গৃহনির্মাণ কৌশল আয়ত্ত্ব করে। পরবর্তী সময়ে সে তার বাসগৃহকে সুন্দর, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক করতে শেখে। আর আজ আমরা তার উত্তরসূরিরা কত জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-ই-না বানিয়েছি। এ গৃহ, ক্ষুদ্র কুটির বা বিশাল ইমারত, যা-ই হোক না কেন, তা মানুষকে নিম্নলিখিত সুবিধা নিশ্চিত করে :

- ক। নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে জীবনযাপন।
- খ। অতিরিক্ত তাপ/শৈত্য ও বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা।
- গ। ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ ও জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা।
- ঘ। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ।
- ঙ। প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা।
- চ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান।

এ সকল কারণেই বাসগৃহ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। অতএব, বাসগৃহ নির্মাণে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করা সকলেরই কর্তব্য।

নির্মাণ সামগ্রী

গৃহ নির্মাণের জন্য হরেক রকমের জিনিসের প্রয়োজন হয়। মানুষকে এ সকল জিনিস বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে তবেই গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দিতে হয়। এ সকল নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে বাঁশ, কাঠ, ডেউটিন, সিমেন্ট, ইট, বালি ইত্যাদি প্রধান। তবে আমাদের পল্লী এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই কাঁচা ঘরে বাস করে। এ সকল ঘরের অধিকাংশই খড় দিয়ে নির্মিত। খড়, নাড়া, গোলপাতা, আখপাতা ইত্যাদি ঘর নির্মাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণী বিভাগ : সাধারণভাবে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীগুলোর উৎস বিবেচনা করে এগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে :

- ১। কৃষি বা উদ্ভিজ্জ উৎস। যেমন-বাঁশ, কাঠ, পাটখড়ি, নাড়া, তালপাতা, নলখাগড়া, গোলপাতা, ছন, আখপাতা ইত্যাদি।
- ২। খনিজ বা মৃত্তিকা ভিত্তিক উপাদান। যেমন-নানা রকমের পাথর। আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা থেকে এ সকল পাথর সংগ্রহ করা হয়।
- ৩। শিল্প উৎপাদক ভিত্তিক সামগ্রী। যেমন-সিমেন্ট, ইট, স্টিল শিট ও রড, বোর্ড, চুন প্রভৃতি।

গৃহের শ্রেণীর বিন্যাস : স্কুল, কলেজ, মন্দির-মসজিদ, কম্যুনিটি সেন্টার ইত্যাদি সামাজিক গৃহ। এগুলো সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। মানুষ বসবাসের জন্য নির্মাণ করে বাসগৃহ। নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বিবেচনা করে যাবতীয় গৃহকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। স্বল্পমূল্যের গৃহ : এ ধরনের গৃহ নির্মাণে সাধারণত কাঠ, বাঁশ, পাটখড়ি, খড়, নাড়া, আখপাতা, গোলপাতা, ছন, নলখাগড়া, পাথর, বালি, সিমেন্ট, ইট, লৌহজাত দ্রব্য, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

২। ব্যয়বহুল গৃহ : এ ধরনের গৃহ নির্মাণে মূল্যবান সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। এ সকল সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইট, সিমেন্ট, স্টিলের বিভিন্ন উৎপাদন, কাঠ, বালু, কংক্রিট প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে নানারকম রং, সজ্জাকরণ সামগ্রী ও মূল্যবান পাথর।

বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য : নিচে কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

বাঁশ : সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্য।

শ্রেণী-বিভাগ : আমাদের দেশে ৯ প্রজাতির ২২ ধরনের বাঁশ জন্মে। যেমন-তল্লা বা চেরাই বাঁশ, মূলি বাঁশ, জাবা বাঁশ, আড় বাঁশ, বর বাঁশ প্রভৃতি।

গুণাগুণ : বাঁশ সর্বত্র জন্মে, দামে সস্তা এবং নির্মাণ কাজে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়। আর্দ্র আবহাওয়াতে কীট-পতঙ্গ, ঘুণ ও নানারকম ছত্রাক সহজে বাঁশকে নষ্ট করে ফেলে।

সংরক্ষণ ও প্রিজারভেটিভস : পাকা বাঁশকে ২/৩ মাস পানিতে ভিজিয়ে সিজন করা একটি বহুল ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতি। এ ধরনের বাঁশ নির্মাণ কাজে লাগালে সহজে ঘুণে ধরে না বা নষ্ট হয় না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে বাঁশকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। বোরন, ক্রোমিয়াম ও কপার সম্বলিত রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এক ধরনের প্রিজারভেটিভ প্রস্তুত করা হয় যা ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের জন্য প্রাণঘাতী।

প্রস্তুতকৃত প্রিজারভেটিভ এ রাসায়নিক উপাদানের হার নিম্নরূপ :

কপার সালফেট-৪ কেজি

সোডিয়াম ডাইক্রোমেট-৪ কেজি

বোরিক এসিড-১ লিটার

উক্ত উপাদানগুলো পানিতে মিশিয়ে ১০০ লিটারের একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। মাটিতে গর্ত করে মোটা পলিথিন বিছিয়ে বা পাকা গর্ত করে তাতে দ্রবণ রাখা হয়। অতঃপর বাঁশ, বাঁশের ফালি বা চাটাই পাত্রে রাখা দ্রবণে ৭/৮ দিন ডুবিয়ে রাখলে সংরক্ষণের কাজ সমাধা হয়। এবার বাঁশকে শুকিয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের সংরক্ষিত বাঁশ ১০/১২ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। এ ছাড়া পাম্পের সাহায্যেও উক্ত দ্রবণ বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

কাঠ : গাছকে সাধারণত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন- (১) কঠিন কাঠের গাছ (২) নরম কাঠের গাছ। উদ্ভিদবিদেরা কঠিন কাঠের গাছকে ডেসিডিউয়াস বলে থাকেন। শাল, সেগুন, গজারি, কড়ই ইত্যাদি কঠিন কাঠের গাছ। এ সকল গাছের পাতা সাধারণত প্রশস্ত এবং সময়মত ঝরে পড়ে। নরম কাঠের গাছের নাম কনিফার। এ সকল গাছের পাতা সূঁচালো। আম, জাম, রেইনট্রি ইত্যাদি নরম কাঠের গাছের উদাহরণ।

কাঠের সিজনিং : কাঠের ভেতর সাধারণত আর্দ্রতা থাকে। এ কারণে চেরাই করা তক্তা বা কোনো কাঠজাত দ্রব্যের ব্যবহার কালে আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এ জন্য কাঠকে সিজন করা দরকার।

সাধারণত কাঠে ১৯% ভাগ আর্দ্রতা থাকে। শুকিয়ে এ আর্দ্রতার পরিমাপ যদি কমানো হয় তবে ব্যবহার কালে কাঠ ঠিক থাকে।

কাঠকে দীর্ঘদিন পানিতে ভিজিয়ে সিজন করা আমাদের দেশের একটি বহুল ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতি। তবে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর এবং অল্প সময়ে বেশি কাঠকে সিজন করা যায়। এ পদ্ধতিতে বিশেষ কৌশলে কাঠের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে কাঠের আর্দ্রতা কমিয়ে ফেলা যায়। এভাবে আর্দ্রতার পরিমাণ ১৫% থেকে ৫% পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়। এটাই সিজন করার আধুনিক প্রযুক্তি। সিজনিং প্রক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেন কাঠে কোনো প্রকার বক্রতা সৃষ্টি না হয়।

প্লাইউড (Plywood)

প্রস্তুতি : কাঠের পাতলা তক্তাকে একটা কেন্দ্রীয় অংশের উভয় পাশে এমনভাবে জোড়া লাগানো হয় যেন কাছাকাছি দুটো স্তরে বুনন পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে। অধিকাংশ প্লাইউড প্রস্তুতিতে বেজোড় সংখ্যক স্তর জোড়া লাগানো হয়। প্লাইউডের বাইরের স্তরকে পিঠ, কেন্দ্রীয় অংশকে কোর বা মর্মস্থল এবং অন্যান্য অংশকে আড়াআড়ি স্তর বলে। নরম কাঠের প্লাইউড বানাতে সাধারণত একই জাতীয় কাঠ ব্যবহার করা হয়। কঠিন কাঠের প্লাইউড প্রস্তুতিতে কোর ও আড়াআড়ি স্তরগুলোকে শক্তিশালী আঠা দিয়ে উচ্চ চাপে ও তাপে জোড়া লাগানো হয়।

প্লাইউডের গুণাগুণ : প্লাইউডের মধ্যকার সম্মিলিত তক্তার গুরুত্ব, আর্দ্রতার পরিমাণ এবং কতকটা প্যানেলের ত্রুটির ওপর নির্ভর করে এটা বাঁকবে কিনা। তবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভার প্রযুক্ত হলে প্লাইউড বাঁকে ও নষ্ট হয়ে যায়। ওয়াটার প্রুফ পদার্থযুক্ত প্লাইউড পানিতেও সহজে নষ্ট হয় না। সাধারণ তক্তার চেয়ে প্লাইউড অনেক বেশি টেকসই।

ব্যবহার ও সংরক্ষণ : ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে নির্মাণ শিল্পের যে কোনো পর্যায়ে প্লাইউড ব্যবহার করা হয়। আসবাবপত্র, ক্যাবিনেট পার্টিশন, নির্মাণ কাজের সহায়ক সামগ্রী, ছাদ, দেয়াল, মেঝে, ট্যাক্স, নৌকা, সাইনবোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুতে প্লাইউড ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গ্রেডের প্লাইউড যে কাজের উপযোগী তা জেনে প্রয়োজনে উপযুক্ত প্লাইউড ব্যবহার করা উচিত।

প্লাইউডের নির্মিত আসবাব সামগ্রী ভালোভাবে পলিশ করলে খুব সুন্দর দেখায়।

সিমেন্ট (Cement)

সিমেন্ট নির্মাণ কাজের অপরিহার্য উপাদান। দালান-কোঠা নির্মাণে যে কংক্রিট বানানো হয় তাতে জোড়া লাগাবার উপকরণ হিসেবে সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। পানি বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে এ সিমেন্ট অত্যন্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। সিমেন্টের এ গুণের জন্যই রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ও দালানের গাঁথনি কাজে সিমেন্ট অপরিহার্য উপাদান। সিমেন্টের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক উপাদান থাকে। এর উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সামান্য ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও সালফার ট্রাইঅক্সাইডসহ চুন, সিলিকা, অ্যালুমিনা ও লৌহ।

সিমেন্টের শ্রেণী বিভাগ : সিমেন্টকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (২) অ্যালুমিনাস সিমেন্ট।

পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট : ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও টেট্রাক্যালসিয়াম অ্যালুমিনোফেরেট। বিভিন্ন অনুপাতে এই চারটি উপাদানের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধরনের পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে টাইপ-১০, টাইপ-৩০, টাইপ-৪০ ও টাইপ-৫০ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বিভিন্ন নির্মাণ কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। রাস্তাঘাট, সেতু, ফুটপাথ ইত্যাদি নির্মাণে স্বাভাবিক সিমেন্ট (টাইপ-১০) ব্যবহৃত হয়। গরম আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চলে বড় ধরনের কংক্রিট কাজে টাইপ-২০ ধরনের সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। নির্মাণ কাজটি খুবই তাড়াতাড়ি ব্যবহারে আনার প্রয়োজন হলে টাইপ-৩০ সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। টাইপ-৪০ ধরনের সিমেন্ট আস্তে আস্তে শক্তি অর্জন করে বিধায় বিশাল কংক্রিট কাজে, যেমন— বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে এ সিমেন্ট লাগানো হয়। শিল্প কারখানা নির্মাণে এ সিমেন্ট উপযোগী।

অ্যালুমিনাস সিমেন্ট : অ্যালুমিনা, সামান্য চুন ও সিলিকা এ সিমেন্টের উপাদান বিধায় এর ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ। রাতারাতি পয়ঃপ্রণালি নির্মাণ বা পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণের কাজে এ সিমেন্ট খুবই উপযোগী। তাপ প্রয়োগে এ সিমেন্ট তার বাঁধন হারায় না বিধায় গৃহের চুলা বা চুলার ভিত্তি নির্মাণে অ্যালুমিনাস সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত প্রধান দুধরনের সিমেন্ট ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নির্মাণ কাজে আরও কতকগুলো বিশেষ সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। নিচে এ সকল বিশেষ সিমেন্টের নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

- ১। সাদা পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট—সাদা কংক্রিট, সজ্জিত কংক্রিট, পর্দা দেয়াল ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
- ২। বাতাস ঢুকানো পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ত্বারপাত এলাকায় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ৩। ওয়াটার প্রুফ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট সাদা ও খুসর রঙের। এ সিমেন্ট পানি নিরোধক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
- ৪। প্রাস্টিক সিমেন্ট মর্টার, প্রাস্টার ও চুনকামের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ৫। মেসনরি সিমেন্ট খুব উঁচুমানের মর্টার প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য।
- ৬। তেলকূপের সিমেন্ট তেলকূপের মুখ বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ৭। প্রসারণশীল সিমেন্ট যে সকল ক্ষেত্রে নানা কারণে কংক্রিটের আয়তনে সংকোচন দেখা দেয় যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
- ৮। রেগুলেটেড সেট সিমেন্ট। এ সিমেন্টের জমাট বাঁধাকাল নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

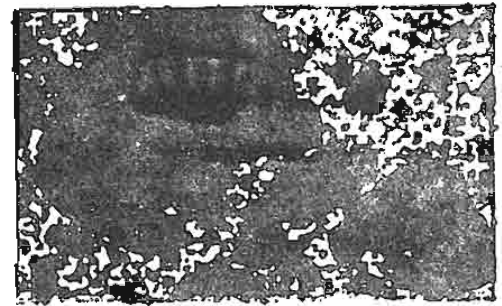
কংক্রিট (Concrete)

কিছু নিষ্কিয় পদার্থের কণাকে সিমেন্ট ও পানি থেকে প্রস্তুত লেই বা পেস্টের সাথে মিশিয়ে যে কৃত্রিম পাথর তৈরি করা হয় তাকে কংক্রিট বলে। নির্মাণ কাজে কংক্রিট গুরুত্বপূর্ণ।

উপাদান : কংক্রিট প্রস্তুতের জন্য সিমেন্ট, বালি, কঁকর, চূর্ণ পাথর, ঠাণ্ডা, ধাতুমল, কাদা শ্রেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। কংক্রিটের স্থায়িত্ব, শক্তি ও ওজন পূঞ্জীভূত পদার্থের ধরনের ওপর নির্ভর করে। বামাপাথর, ধাতুমল, হেমাটাইট, পারলাইট, বেরাইট, লিমোনাইট, ম্যাগনেটাইট, লৌহ ও স্টিল চূর্ণ ইত্যাদিও কংক্রিট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত : কংক্রিট প্রস্তুতে ব্যবহার্য উপাদানগুলোর আকার, পরিচ্ছন্নতা, শক্তি ও রাসায়নিক স্থায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজের ধরন অনুসারে কংক্রিটের পরিকল্পনা করা হয়। উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করে এগুলোকে মিশ্রণ করা একটা বড় কাজ।

উপাদানগুলোকে এমনভাবে মেশাতে হয় যাতে মিশ্রণের সর্বত্র এগুলো সুসম বিন্যস্ত হয় এবং প্রত্যেকটি উপাদানের গায়ের চারদিকে কাইয়ের প্রলেপ লেগে থাকে।



চিত্র ৫.১: জমাট বাঁধা কংক্রিটে সুসম বিন্যস্ত উপাদান।

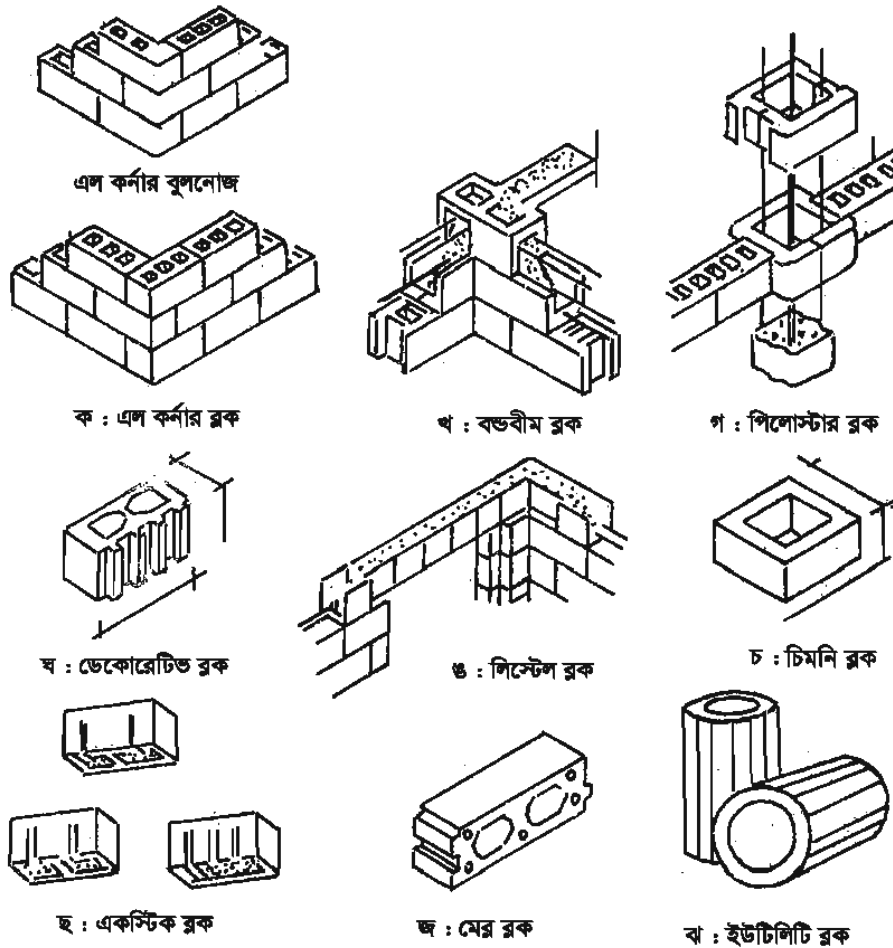
বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে সিমেন্ট ও পানি মিশানোর সময় কিছু ভিন্ন উপাদান মিশাতে হয়। যেমন—কংক্রিট তাড়াতাড়ি জমিয়ে শক্ত করতে হলে মিশ্রণের সময় সামান্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশাতে হয়।

কংক্রিট কিওরিং : কংক্রিটের ভালোভাবে জমাট বাঁধা নিশ্চিত করার জন্য কিওরিং করতে হয়। এ জন্য সাধারণত কংক্রিটকে আর্দ্র অবস্থায় রাখার জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত পানি দিতে হয়। এ আর্দ্র অবস্থায় তাপমাত্রা 10° থেকে 25° সেলসিয়াস হলে কংক্রিট পরিকল্পিত শক্তি অর্জন করে।

ব্লক (Block)

তৈরি : নির্মাণ কাজে সর্বত্র ব্লক ব্যবহৃত হয়। ব্লক ফাঁকা বা নিরেট হতে পারে। যে ধরনের ব্লক প্রয়োজন সে ধরনের কাঠের ছাঁচ তৈরি করে তন্মধ্যে কংক্রিট জমিয়ে ব্লক তৈরি করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন আকারের আয়তাকার নিরেট ব্লক এভাবে তৈরি হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির ফলে ব্লক মেশিনেও তৈরি হয়। শূকনা মিশ্রণকে ব্লক গঠনের একটা মেশিনে ঢুকান হয়। এখানে কম্পন ও উচ্চ চাপে ব্লক গঠন করা হয়। অতঃপর স্টিম দ্বারা কিণ্ডর করা হয়। মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের নিরেট ও ফাঁকা ব্লক তৈরি করা যায়।



চিত্র ৫.২ : বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ব্লক

ব্লকের ব্যবহার : চিত্র ৫.২ এ আমরা বিভিন্ন আকার ও প্রকারের ব্লক দেখতে পাই। এদের কতক নিরেট আবার কতক ফাঁকা। নির্মাণ কাজটা হালকা করার জন্য ফাঁকা ব্লক ব্যবহার করা হয়।

ভারী নির্মাণ কাজে নিরেট ব্লক ব্যবহার করা হয়। গোলাকার কনীর নির্মাণে বুলনোজ নামক ব্লক ব্যবহার করা হয়। আবার দেয়ালকে শক্তিশালী করার জন্য বন্ডবীম ব্লক ব্যবহার করা হয়। এভাবে নির্মাতারা বিভিন্নভাবে নির্মাণ শিল্পকে নিপুণ ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ব্লক ব্যবহার করে থাকেন।

ইট (Brick)

অতি প্রাচীনকাল থেকে ইট নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে সুপরিচিত। ইটের প্রস্তুত প্রণালি এখনও মোটামুটি একই রকম। তবে আধুনিক প্রযুক্তির ফলে অল্প সময়ে বেশি ইট প্রস্তুত করা যায়।

কাঁচামাল : ইটের মৌলিক উপাদান হচ্ছে কাদামাটি। তবে এ মাটির যে সকল গুণ থাকা অপরিহার্য তা নিচে উল্লেখ করা হল:

ক। আর্দ্র অবস্থায় এর প্লাস্টিক গুণ থাকতে হবে। তবেই একে বিভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব হবে।

খ। প্রসার্য শক্তি থাকলে ইটের আকার ধরে রাখতে পারবে।

গ। উচ্চ তাপমাত্রায় মাটির কণাগুলো অবশ্যই গলে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগতে হবে।

ঘ। এ মাটির রাসায়নিক গঠন মোটামুটি একই হবে, তবে এদের বিভিন্ন ভৌত গুণ থাকতে পারে।

ইট প্রস্তুতি : ইট প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। তন্মধ্যে কাঁচামাল সংগ্রহ ও মজুদ করা, কাঁচামালকে প্রস্তুত করা, ইটের একক গঠন করা, ইট শুকানো, আগুন ধরানো, ইট পোড়ানো ও ঠান্ডাকরণ এবং ভাটা থেকে ইট সংগ্রহ ও বাছাইকরণ অন্যতম।

কাঁচামাল তথা নির্বাচিত কাদামাটি সংগ্রহ করে তাকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়। তারপর এটিকে চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ মালকে অতঃপর পান দেওয়া হয়। তারপর পান দেওয়া মালের সঙ্গে পানি মিশ্রিত করা হয়। তবে ইটের একক গঠন করার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করবে কী পরিমাণ পানি মেশানো হবে। হাতে তৈরি ইটের জন্য এভাবে প্রস্তুত কাদামাটিকে ছাঁচের মধ্যে রেখে প্রয়োজনীয় আকারে ইট কাটা হয়। এভাবে বানানো ইট রোদে শুকানো হয়।

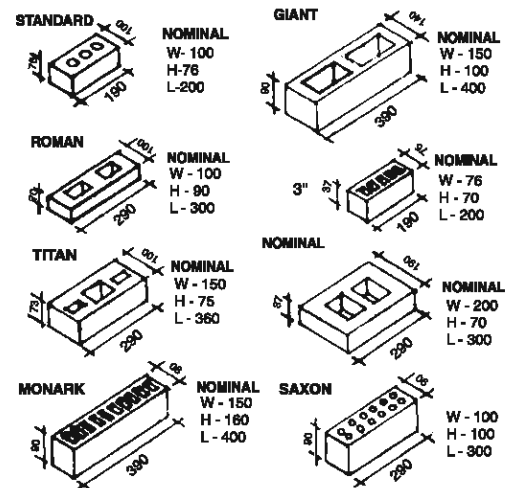
কারখানায় ইটের আকার প্রদান এবং শুকানোর ও পোড়ানোর কাজটি মেশিনে করা হয়। শুকানো এবং পোড়ানোর সময় মেশিনের তাপমাত্রা ৩৮° থেকে ২০৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত রাখা হয়।

আর ভাটায় পোড়ানোর কায়দা ভিন্ন। একসারি ইট বিছিয়ে একসারি শুকনা কাঁঠ বা কয়লা দেওয়া হয়। ভাটা সাজানো শেষ হলে আগুন লাগানো হয়। এ আগুন কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

ইটকে পোড়বার পূর্বে স্তরে স্তরে ইটের তলে বিভিন্ন খনিজ উপকরণ ছিটিয়ে দিয়ে ইটকে চকচকে করা যায়। অতঃপর উত্তমরূপে পোড়ানো হলে ইটকে ভাটা থেকে বের করে বাছাই ও গ্রেড করা হয়।

শ্রেণী বিভাগ ও ব্যবহার : আমাদের দেশে ভাটার ইটকে সাধারণত ১, ২ ইত্যাদি নম্বরদ্বারা গ্রেডভুক্ত করা হয়। সবচেয়ে ভাল ইটকে ১ নম্বর ইট বলা হয়। উচ্চমানের নির্মাণ কাজে ১ নম্বর ইট ব্যবহার করা হয়।

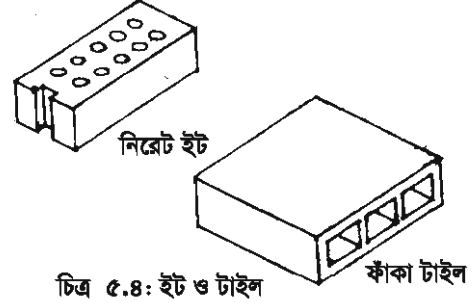
দালান-কোঠা, রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদি যাবতীয় নির্মাণ কাজে ইটই প্রধান সামগ্রী। প্রমিত ইটের সাইজ দুনিয়ার সর্বত্র একই রকম।



চিত্র ৫.৩: বিভিন্ন ধরনের প্রমিত ইটের দৈর্ঘ্য (L) প্রস্থ (W) উচ্চতা (H)।

টাইল (Tile)

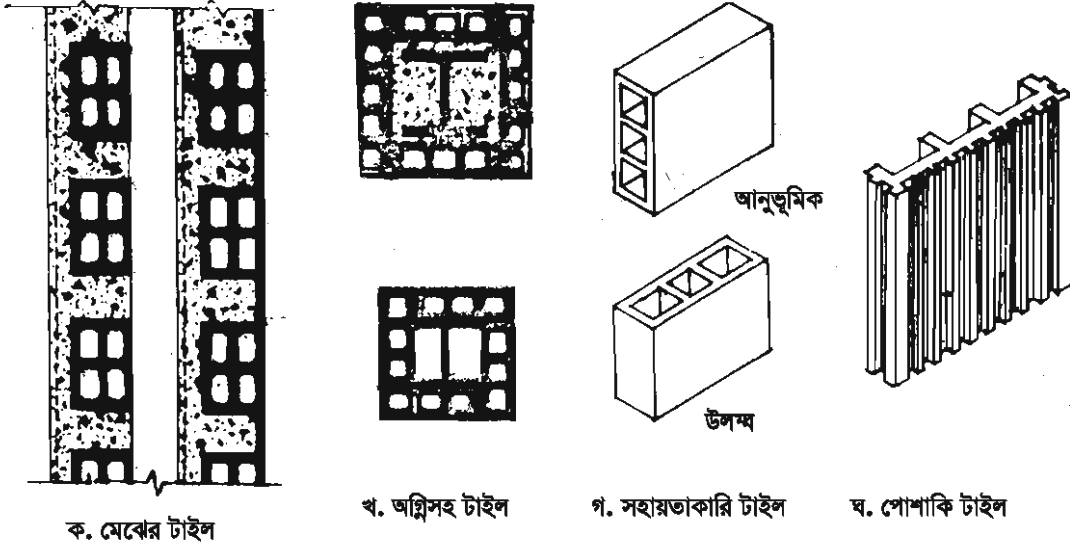
টাইল আর ইটের কাঁচামালেরও প্রস্তুতপ্রণালি প্রায় একই রকম। শক্ত কাদা থেকে ডিজাইন অনুযায়ী কিছু মাল বের করে ফাঁকা করা হয়। প্রস্তুতপ্রণালির অন্যান্য ধাপ একই রকম তবে পার্থক্য হচ্ছে ইট নিরেট আর টাইল ফাঁকা।



চিত্র ৫.৪: ইট ও টাইল

টাইলের প্রকারভেদ ও ব্যবহার : বিশেষ কাজের জন্য

বিশেষ ধরনের টাইল প্রস্তুত করা হয়। এ ধরনের টাইল হচ্ছে ভারবাহী দেয়াল টাইল, পার্টিশন টাইল, সহায়তাকারী টাইল (Back up tile), পোশাকি টাইল (Furring tile), অগ্নিসহ টাইল, মেঝের টাইল, গাঠনিক কাদামুখী টাইল ও গাঠনিক চকচকে টাইল।



চিত্র ৫.৫ : বিভিন্ন ধরনের টাইল

চিত্র ৫.৫ এ আমরা কয়েক রকমের টাইলের আকার দেখছি। হালকা দেয়াল নির্মাণের জন্য ভারবাহী দেয়াল টাইল ব্যবহার করা হয়। পার্টিশন দেয়ালে পার্টিশন টাইল লাগান হয়। অগ্নিসহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে অগ্নিসহ টাইল ব্যবহার করা হয়। এভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন টাইল বিশেষ উদ্দেশ্যে বানান হয় এবং বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত (Iron and Steel)

অতি প্রাচীন কাল থেকে লৌহ মানব সমাজে সুপরিচিত। এ আধুনিক যুগেও এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধাতব মৌলগুলোর মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে লৌহের ব্যবহার সর্বাধিক। ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়।

লৌহের শ্রেণী বিভাগ : বিশুদ্ধ লৌহ কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। তাই বিশুদ্ধ লৌহের সঙ্গে সামান্য কার্বন ও অন্যান্য মৌল মিশ্রিত করে তিন ধরনের লৌহ প্রস্তুত করা হয়। যথা—কাঠ আয়রন বা ঢালাই লৌহ (২) রট আয়রন বা পেটা লৌহ এবং (৩) স্টিল বা ইস্পাত।

গাড়ি, যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে লৌহ। বিশ্বে লৌহের মজুদ সীমিত। তাই একে বিশোধন করে পুনরায় ব্যবহারের ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বত্র। আমাদের একমাত্র ইস্পাত কারখানা চট্টগ্রামে। বিদেশ থেকে আমদানি করা কাষ্ট আয়রন থেকে এখানে ইস্পাত তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : নিচের ছকে ইস্পাতের বিভিন্ন সংকরের নাম ও নির্মাণ কাজে এদের ব্যবহার উল্লেখ করা হল :

সংকরের নাম	ব্যবহার
১। নিকেল ইস্পাত	১। মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজের ট্যাংক, রণপোত রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত পাত, ক্যাবল এবং প্রপেলারের হাতল নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। ক্রোম ইস্পাত	২। পেষণ যন্ত্র, রণপোত বিন্ধকারী গোলা ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩। ক্রোমভ্যানাডিয়াম ইস্পাত	৩। মোটরগাড়ির ফ্রেম, গিয়ার ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
৪। ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত	৪। নিরাপদ সিঁদুক, রেললাইন ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
৫। টাংস্টেন ইস্পাত	৫। দ্রুত গতিশীল যন্ত্রপাতি ও ছিদ্র করার যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
৬। মরিচাহীন ইস্পাত	৬। গৃহস্থালির পাত্রাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।
৭। ইনভার	৭। স্কেল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

জিপসাম (Gypsum)

হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে মানুষ নির্মাণ কাজে জিপসাম ব্যবহার করে আসছে। এ জিপসাম হচ্ছে আর্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট। এর রাসায়নিক সংকেত $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ । জিপসাম বিশুদ্ধ অবস্থায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ জিপসাম সাদা কাদা, চুন, পাথর, সিলিকা লৌহ যৌগ ইত্যাদির সংগে মিশ্রিত অবস্থায় জিপসাম খনিতে পাওয়া যায় এবং রং ধূসর, বাদামি বা লালাভ বাদামি হয়।

প্রস্তুত প্রণালি : কারখানায় জিপসাম খনিজকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট কণায় পরিণত করা হয়। অতঃপর বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে 195° সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে এর ৭৫% ভাগ আর্দ্রতা অপসারিত হয়। একে হেমিহাইড্রেট প্লাস্টার অব প্যারিস বলে। এ জিপসাম থেকে অনেক রকমের নির্মাণ সামগ্রী তৈরি হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটা বিশেষ মেশিনে জিপসামকে সূক্ষ্ম পাউডারে পরিণত করা হয়। এ পাউডারকে ল্যান্ড প্লাস্টার বলে। একে এক ধরনের বিশেষ যন্ত্রে 165° সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। ফলে তার আর্দ্রতা সম্পূর্ণ দূর হয়। একে বলা হয় প্লাস্টার অব প্যারিস।

প্রকারভেদ ও ব্যবহার : জিপসাম থেকে দুটো ভিন্ন ধরনের নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। যথা-প্লাস্টার ও বোর্ড। নিচের ছকে এর উৎপাদনগুলোর নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করা হল:

জিপসাম ও প্লাস্টারসমূহ ও এদের ব্যবহার

নাম	ব্যবহার
১। প্লাস্টার অব প্যারিস	১। ওয়াল প্লাস্টারের ছিদ্র বন্ধ ও হাঁচ তৈরির কাজে ব্যবহৃত।
২। কেনির সিমেন্ট	২। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।
৩। কাস্টিং প্লাস্টার	৩। তীব্র ও পরিষ্কার লাইন ও অত্যধিক সমান তল তৈরিতে কাস্টিং প্লাস্টার ব্যবহৃত হয়।
৪। হার্ডওয়াল প্লাস্টার	৪। প্লাস্টার করা দেয়ালে প্রথম ও দ্বিতীয় বেড় দেয়ার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়।
৫। সিমেন্ট বন্ড প্লাস্টার	৫। কংক্রিট তলে এটি ব্যবহৃত হয়। তার উপরে যে কোনো চূড়ান্ত প্লাস্টার করা হয়।
৬। ফিনিশ প্লাস্টার	৬। লেপাতলে শেষবারের মত প্রলেপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৭। প্রিপেয়ার্ড ফিনিশ প্লাস্টার	৭। চিত্রাঙ্কনের কাজে ব্যবহার করা হয়।
৮। একস্টিক্যাল প্লাস্টার	৮। শব্দ শোষণের জন্য দেয়ালে লাগানো হয়।
৯। জয়েন্ট ফিলার	৯। এর লেই পেরেকের ছিদ্র বা দেয়াল বোর্ডের জোড়া ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হয়।
১০। টেকচার স্ট্রে	১০। জিপসাম বোর্ড কংক্রিট বা প্লাস্টারের সামান্য ত্রুটি ঢাকার জন্য এ পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন বোর্ড ও এর ব্যবহার

বিভিন্ন বোর্ড	ব্যবহার
১। ওয়াল বোর্ড	১। পার্টিশন দেয়াল, অভ্যন্তরীণ দেয়াল ও সিলিং এর আচ্ছাদন দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। পার্টিশন বোর্ড	২। পার্টিশন কাজে ব্যবহৃত হয়। পার্টিশনকে শব্দ অন্তরক করতে দ্বিত্ব বা নিরেট পার্টিশন দেওয়া হয়।
৩। ডেকরেটেড জিপসাম ওয়াল বোর্ড	৩। দেয়ালে লাগানো হয়।
৪। বেকার বোর্ড (Backer Board)	৪। ইস্পাত কলামকে অগ্নিসহ করার জন্য বেকার বোর্ড ব্যবহৃত হয়।
৫। জিপসাম ওয়াটার প্রুফ বেকার বোর্ড	৫। রান্নাঘর, গোসলখানা, লন্ড্রি ঘর ইত্যাদি আর্দ্র জায়গায় ব্যবহৃত হয়।
৬। বহির্ভাগে ব্যবহার্য জিপসাম বোর্ড	৬। বহির্ভাগে রক্ষিত জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

কাচ

কাচ একটি স্বচ্ছ, অদানাদার, ভঙ্গুর কঠিন পদার্থ। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। সাধারণত এটি সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের যৌগ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর উপাদানের তারতম্য হতে পারে। কাচ প্রস্তুতি অতি প্রাচীন শিল্প। মিশরীয়রা যিশুর জন্মের বহু পূর্ব থেকেই কাচ বানাতে জানত। ইউরোপীয়রা তাদের নিকট থেকে এ শিল্প সম্পর্কে অবগত হয়। অতঃপর সারা বিশ্বে কাচ শিল্পের প্রসার ঘটে।

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে মানুষ কাচ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। ফলে কাচ নির্মিত পান পাত্র থেকে কাচের ইট পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ কাজে কাচ ব্যবহারের লক্ষ্য হচ্ছে ঘরের ভিতরে আলো ঢুকতে দেওয়া। এ আলো ও তার তাপ নিয়ন্ত্রণ করাটাও এর একটা বড় কাজ। নির্মাণ শিল্পে বিশেষ উদ্দেশ্যে এ সকল কাচ ব্যবহৃত হয়। নিচের ছকে কাচের প্রকারভেদ ও ব্যবহার উল্লেখ করা হল :

বিভিন্ন প্রকারের কাচের নাম	নির্মাণ শিল্পে ব্যবহার
১। পাত কাচ	১। যে সকল ক্ষেত্রে দেখার বিষয়টা জরুরি নয় এমন জায়গায় নির্মাণে পাত কাচ ব্যবহৃত হয়।
২। বিম্বিত কাচ	২। দিনে বাইরে থেকে ভিতর দেখা যায় না, কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায়, এমন প্রয়োজনে এ কাচ ব্যবহৃত হয়।
৩। টিন্টেড প্লেট কাচ	৩। সৌর তাপ ও আলোর ঔজ্জ্বল্য কমানোর জন্য বাড়ির জানালায়, অফিস আদালত ও গ্রন্থাগারে এ কাচ ব্যবহার করা হয়।
৪। তাপ শোষক প্লেট কাচ	৪। সৌর বিকীর্ণ শক্তির অধিকাংশই এ কাচ শুষে ফেলে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অফিস আদালতে ব্যবহৃত হয়।
৫। পান দেওয়া প্লেট কাচ	৫। খুবই শক্ত বিধায় জিমনাসিয়ামের জানালা এবং হকি খেলার মাঠ ঘেরা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
৬। প্যাটার্ন বা ছাঁচ কাচ	৬। কক্ষ বিভাজক, অফিস পার্টিশন, গোসলখানা ও বাথটাবে এ কাচ ব্যবহার করা হয়।
৭। চকচকে রঙিন কাচ	৭। এ অস্বচ্ছ কাচ পর্দা দেয়াল, ভান্ডারের সম্মুখভাগ, শোরুম, গবেষণাগার ও শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা হয়।
৮। স্তরীভূত নিরাপদ কাচ	৮। গাড়ি ও পরিবহণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে নির্মাণ শিল্পেও ব্যবহৃত হচ্ছে।
৯। স্বচ্ছ দর্পণ কাচ	৯। বাড়ি বা ছোট ঘরের দরজা, নার্সারি, ডাক্তারখানা, ব্যাংকের নিরাপত্তা জানালা, পুলিশ ফাঁড়ি ও বিভাগীয় দোকানে ব্যবহার করা হয়।
১০। ইনসুলেটিং কাচ	১০। তাপীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এ কাচ ব্যবহার করা হয়।
১১। কাচের ব্লক	১১। দালানের ভেতরকার আলোক সজ্জা বৃদ্ধির জন্য কার্মিক বা কাংশানলে এ কাচ ব্যবহার করা হয়। এটি আলোকে ঘরমুখী করে দেয়। শোভাপ্রদ বা ডেকরেটিভ ব্লকস্থাপত্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। অভ্যন্তরীণ দেয়াল ও বিভাজক প্যানেল নির্মাণে এটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
১২। নিরেট কাচের ইট ইটের	১২। আলোককে কোনো রকম বিকৃত না করে ঘরে ঢুকতে দেয়। এ ধরনের নির্মাণ খুবই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। তাপীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য কোন ধরনের কাচ ব্যবহার করা যায়?

ক. তাপ শোষক কাচ।	খ. ইনসুলেটিং কাচ
গ. স্তরীভূত কাচ।	ঘ. নিরেট কাচের ইট।

- ২। বাঁশকে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রণে বোরন, ক্রোমিয়াম ও কপারের অনুপাত কত?

ক. ৪:৪:২	খ. ৪:১:৪
গ. ১:৪:৪	ঘ. ৪:২:১

- ৩। হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি তৈরিতে নিচের কোন ধরনের ইস্পাত উপযুক্ত?

ক. নিকেল ইস্পাত	খ. ক্রোম ইস্পাত
গ. টাংস্টেন ইস্পাত।	ঘ. মরিচাহীন ইস্পাত।

- ৪। ইট ভাটায় ইট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ধাপগুলোর কোন ক্রমটি সঠিক?

ক. কাঁচামাল সংগ্রহ ও মজুদকরণ → কাঁচামালকে প্রস্তুতকরণ → ইটের একক গঠন → ইট শুকানো → আগুন ধরানো → ইট পোড়ানো ও ঠান্ডাকরণ → ভাটা থেকে ইট সংগ্রহ → বাছাইকরণ।

খ. কাঁচামাল সংগ্রহ → ইটের একক গঠনকরণ → আগুন ধরানো → ইট শুকানো → ইট সংগ্রহ → বাছাইকরণ।

গ. কাঁচামাল প্রস্তুতকরণ → ইট শুকানো → আগুন ধরানো → ইট পোড়ানো ও ঠান্ডাকরণ → ইট সংগ্রহ।

ঘ. কাঁচামাল সংগ্রহ ও মজুদকরণ → ইটের একক গঠনকরণ → বাছাইকরণ → ইট সংগ্রহ → ইট পোড়ানো।

- ৫। সিমেন্ট তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়–
 - (i). চুন, সিলিকা, অ্যালুমিনা, লৌহ।
 - (ii). চুন, লৌহ, সিলিকা, কাদা।
 - (iii). অ্যালুমিনা, জিপসাম, তামা, সিলিকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম সাহেব তাঁর বাড়ির পাশে পুকুরে কিছু কাঠ ভিজিয়ে রাখলেন। তাঁর ছেলে কাঠগুলো অনেক দিন যাবত পানিতে ভিজানো দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করল এগুলো কী কাজে ব্যবহার হবে। তিনি জানানেন গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহার হবে। কাঠের ন্যায় বাঁশও সিজনিং করা যায়। এছাড়া রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেও সিজনিং করা যায় বলে করিম সাহেব ছেলেকে বললেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে ৪০০ লিঃ রাসায়নিক দ্রবণ প্রস্তুত করলেন।

ক. সিজনিং কাকে বলে?

খ. করিম সাহেব কাঠগুলো পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিল কেন? ভিজিয়ে না রাখলে কী হত?

গ. করিম সাহেবের ৪০০ লিঃ দ্রবণ প্রস্তুতিতে কপার সালফেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ও এসিডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. বাঁশ ও কাঠের সিজনিং পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শক্তি

প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে, আমাদের চলাফেরায়, কাজকর্মে ও কলকারখানায় নানা সামগ্রীর উৎপাদনে শক্তির প্রভাব ও প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। মেঘলা দিনে কখনও কখনও আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাতের বিকট শব্দে দরজা জানালা কেঁপে উঠছে, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস ও নদীতে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে। কখনও বা ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্পে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এ সবকিছুই ঘটছে শক্তির প্রভাবে। কৃষিজমিতে গরু লাঙল টানছে, নদীতে মাঝি নৌকা বাইছে, কলকারখানায় ইঞ্জিনের সাহায্যে নানা সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে। এ সবকিছুই পিছনে রয়েছে শক্তির ব্যবহার।

পদার্থবিজ্ঞানে শক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে বল ও কাজ বলতে কী বুঝায় তা জানতে হবে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে একটি স্থিৎকে আমরা টেনে লম্বা করতে পারি অথবা একটি স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বল হচ্ছে সেই নিমিত্ত বা বাহ্যিক কারণ যার প্রয়োগে কোনো বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়। যদিও সাধারণভাবে অনেকেই বল ও শক্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় বল ও শক্তি ভিন্ন অর্থ বহন করে। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হলে যদি বলের দিকে প্রয়োগ বিন্দু অপসারিত হয় তাহলে বল প্রয়োগের দ্বারা কিছু কাজ সম্পাদিত হয়েছে বলা হয়। বল ও বলের দিকে সরণের গুণফল দ্বারা কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তাই কোনো অবিচল দেয়ালের ওপর বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও দেয়ালটি যদি একটুও না সরে তাহলে কোনো কাজই করা হল না। আমরা যদি একটি পাথরকে ভূমি থেকে একটি দালানের ছাদে উঠাই—তাহলে কতটা কাজ করা হল তা আমরা হিসেব করব প্রযুক্ত বল ও উচ্চতার গুণফল দ্বারা।

এক্ষেত্রে পাথরটিকে ছাদে ওঠাতে কী পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হল, সম্পাদিত কাজের পরিমাণ থেকেই তা আমরা জানতে পারি। কাজেই কোনো ব্যক্তি বা ইঞ্জিন সর্বমোট যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে তা—ই ঐ ব্যক্তি বা ইঞ্জিনের শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে। কাজ ও শক্তির মাত্রা ও একক অভিন্ন। এস. আই পদ্ধতিতে কাজের একক জুল। কাজেই ঐ পদ্ধতিতে শক্তির এককও জুল।

লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে বিশাল বনভূমি ছিল। এই বনরাজির দেহাবশেষই কয়লা। ভূত্বকের পরিবর্তন হেতু এই বনরাজি মাটি চাপা পড়ে এবং প্রচণ্ড চাপে কয়লায় পরিণত হয়। কিন্তু এরা যখন জীবিত ছিল তখন সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তি গ্রহণের মাধ্যমে এদের দেহ বৃদ্ধি ঘটেছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সৌরশক্তি কয়লায় স্থৈতিক রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এ কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প উৎপাদন করা হয় যা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। সে বিদ্যুৎ আজ আমাদের ঘর আলোকিত করছে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে, শক্তির মূল উৎস আমাদের সূর্য।

বিভিন্ন রকমের শক্তি

শক্তিকে আমরা বিভিন্ন রূপে দেখতে পাই। যেমন—তাপ, বিদ্যুৎ, শব্দ, আলোক, চুম্বক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক শক্তি। যান্ত্রিক শক্তি দুভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) স্থিতিশক্তি, (খ) গতিশক্তি।

জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক শক্তির প্রভাব মানুষের জীবনে অপরিসীম। চলাফেরা, কাজ করা, খেলাধুলা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি আমরা পাই খাদ্য থেকে। আর খাদ্যের মধ্যে এ শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে অবস্থান করে। কয়লা, কাঠ, ঘুঁটে, গ্যাস ইত্যাদি রাসায়নিক শক্তির এক একটা উৎস। দহনের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে চুলা বা ইঞ্জিন থেকে এই শক্তি নির্গত হয়।

তড়িৎ শক্তি আমাদেরকে বিপুল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। পানি বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহে পানি প্রবাহের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে জেনারেটরের দ্বারা এ তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। বাতাসের গতিশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে চালানো হয় পাল তোলা নৌকা এবং বায়ুকল।

সৌরশক্তি, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে নবায়নযোগ্য শক্তির অফুরন্ত উৎস হিসেবে আজকাল বিবেচনা করা হচ্ছে। কেবল কিছুদিন পূর্বে ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যন্ত্র বসিয়েছেন। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কাপড় শুকানো, ধান শুকানো ইত্যাদি কাজ প্রাচীনকাল থেকেই করা হচ্ছে।

শক্তির রূপান্তর : উপরে বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা বলা হয়েছে। এ সকল শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যে কোনো এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে পরিবর্তন সম্ভব। একে শক্তির রূপান্তর বলে। নিচে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

১। তাপ থেকে যান্ত্রিক শক্তি : তাপের সাহায্যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালনা করা হয়। এতে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২। বিদ্যুৎশক্তি থেকে তাপ ও আলোকশক্তি : বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়। এক সময় আলো দেখা যায়। এভাবে বিদ্যুৎশক্তি তাপে এবং তাপশক্তি আলোকশক্তিতে পরিণত হয়।

৩। আলো থেকে বিদ্যুৎশক্তি : ফটো ইলেকট্রিক কোষের ওপর আলো পড়লে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখানে আলোকশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৪। শব্দ থেকে যান্ত্রিক শক্তি : আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরীক্ষার করা হয়। এটি শব্দ শক্তির যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরের একটি ঘটনা।

৫। বিদ্যুৎ থেকে তাপ ও রাসায়নিক শক্তি : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার ইত্যাদিতে বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সঞ্চয়ক কোষে বিদ্যুৎশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে মজুদ রাখা হয়।

৬। পারমাণবিক শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি : পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে ডুবোজাহাজ চালানো হয়। এটি পারমাণবিক শক্তির যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরের একটি ঘটনা।

৭। চৌম্বক শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি : বড় বড় বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে মালপত্র উঠানো-নামানোর কাজ করা হয়। এভাবে দেখা যায় চৌম্বক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শক্তির নিত্যতা : “শক্তির বিনাশ বা সৃষ্টি নেই, শক্তি কেবল মাত্র একরূপ থেকে এক বা একাধিক রূপে রূপান্তরিত হয় এবং বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।” এ সূত্রকে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

সৌরশক্তি : সৌরশক্তিকে আজকাল নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম ভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সূর্যের বিকীর্ণ রশ্মি বিপুল শক্তি বহন করে আনে। এ শক্তিকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন— সৌর কোষ।

দীর্ঘক্ষণ সূর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় বিরাট অধিবৃত্তাকার দর্পণ বসিয়ে সূর্য রশ্মিকে বিশেষভাবে নির্মিত বয়লারে কেন্দ্রীভূত করে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করা যায়। উৎপন্ন তাপশক্তি দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন করে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। পিরিনিজ পর্বতের পাদদেশে স্থাপিত সৌর ফার্নেসে ৩৮০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাওয়া যায়। আজকাল রান্নার কাজেও সৌরচুল্লি ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক শক্তি : কোটি কোটি বছর পূর্বে এ বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে ভারী মৌলগুলো উৎপন্ন হয়। এদের পরমাণু গঠনে বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয় এবং আজও তা সঞ্চিত আছে। এখন যদি এদেরকে ভেঙে এদের মূল কণিকায় বিভক্ত করা যায়, তবে সে বিপুল শক্তি বের করা যায়। আর এ শক্তিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা ব্যবহারও করা যায়। তবে প্রশ্ন হল, পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র কণাকে কী দিয়ে আঘাত করে ভাঙা যায়? চলতি শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকেরা এর উপায় বের করলেন। পরমাণুর চেয়ে আরও ছোট কণা, যেমন—নিউট্রন দিয়ে আঘাত করতে পারলে কাজটি করা যায়। প্রথমে ইউরেনিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৯২) নামক ভারী পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত হানা হল। দেখা গেল, এক্ষেত্রে পরমাণুটি দুটো ছোট অংশে ভেঙে যায় এবং তিনটি নিউট্রন ও বিপুল শক্তি নির্গত হয়। এটিই পারমাণবিক শক্তি।

শক্তির চাহিদা : মানুষ জীবনধারণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যা কিছু করে তাতেই শক্তির প্রয়োজন হয়। কৃষি, শিল্প ও প্রতিটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। সাধারণত কোনো দেশের মাথাপিছু ব্যয়িত শক্তিকে সে দেশের উন্নয়নের সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আজকের দিনে সর্বত্র জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রবল। তাই নিম্নলিখিত কারণে শক্তি ব্যবহারের চাহিদা বেড়েই চলেছে :

- ক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক হারে শক্তির প্রয়োজন হয়।
- খ। উন্নয়নকামী দেশসমূহ বর্ধিত হারে দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করছে এবং যানবাহন ব্যবহার করছে। এ সকল নির্মাণ কাজে ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়।
- গ। মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিলাসবহুল বাড়িঘর নির্মাণ করে। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি অধিকহারে ব্যবহার করে। ফলে শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- ঘ। মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম ও যোগাযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানুষের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিক শক্তি ব্যয় অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

শক্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণ : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তির ব্যবহার করছি। আমাদের বাঁচার জন্য যেমন শক্তির প্রয়োজন, তেমনি জীবনমান উন্নয়নের জন্যও। শক্তি না হলে আমাদের জীবন চলে না। তাই শক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আমরা দেখেছি যে, জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের শক্তির এক বিরাট উৎস। কিন্তু এ শক্তি সীমিত এবং এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই মানুষ শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে ব্যাপৃত। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে।

যতক্ষণ আমরা অফুরন্ত শক্তির কোনো উৎস হাতের কাছে না পাচ্ছি ততক্ষণ প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন :

- ১। শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ না ভেবে জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।
- ২। রেডিও, টিভি, বাতি, প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রয়োজনে ব্যবহার করে অন্য সময় বন্ধ রাখতে হবে।
- ৩। যে কোনো ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বা যন্ত্রপাতি শক্তির অপচয় ঘটায়। তাই যথাসময়ে এদের মেরামত করতে হবে। এসব যন্ত্রপাতি মেরামতের যোগ্য না হলে এগুলোকে বর্জন করতে হবে।
- ৪। বিনা কারণে অথবা অপ্রয়োজনে যানবাহনের ইঞ্জিন চালু রাখা উচিত নয়। কারণ এতে শক্তির অপচয় হয়।
- ৫। শক্তি সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় অপচয় রোধ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সৌরশক্তি হচ্ছে—

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ক. যান্ত্রিক শক্তি | খ. নবায়নযোগ্য শক্তি |
| গ. আণবিক শক্তি | ঘ. রাসায়নিক শক্তি |

২। রাসায়নিক শক্তি কোন কাজটি করতে পারে?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. যান্ত্রিক কাজ | খ. বৈদ্যুতিক কাজ |
| গ. শব্দ উৎপাদন | ঘ. ইঞ্জিন চালানো |

নিচের তথ্য থেকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জ অঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এক ধরনের সেল ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ব্যবস্থায় খোলা আকাশে উন্মুক্ত অবস্থায় সূর্যালোকের প্রভাবে এ ধরনের সেল থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়।

সস্তম অধ্যায়

জ্বালানি

রান্নাবান্নার কাজে আমরা তাপ ব্যবহার করি। যানবাহন চালনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি যাবতীয় কাজেও তাপের ভূমিকা রয়েছে। কিরূপে আমরা এ তাপ পেয়ে থাকি? কাঠ-কয়লা, খড়কুটা প্রভৃতি পুড়িয়ে আমরা তাপ পাই, তাই না? তেল, পেট্রোল কেরোসিন, বাঁশ, কাঠ-কয়লা, গাছের শুকনো পাতা ইত্যাদি আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। এ সকল জ্বালানি কিন্তু জৈব পদার্থ। কারণ এগুলো হয় উদ্ভিদ থেকে, না হয় প্রাণী থেকে এসেছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি

কয়লা, তেল, পেট্রোল ও কেরোসিন এগুলো কীভাবে জীব থেকে এসেছে? কোটি কোটি বছর পূর্বে গাছগাছড়া, জীবজন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে মাটিচাপা পড়ে। এদেরই দেহাবশেষ জীবাশ্ম এবং জীবাশ্ম কঠিন বা তরল আকারে খনি থেকে তুলে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। এদের জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। কয়েকটি জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হল :

কয়লা

কোটি কোটি বছর পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে যে গাছপালা জন্মেছিল সেগুলো মরে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এদের দেহাবশেষ কাদা-পলি ইত্যাদির সাথে মিশে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। অতঃপর ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এরা ভূ-অভ্যন্তরে চাপা পড়ে। ভূ-অভ্যন্তর ভাগে তাপ ও চাপের পরিবর্তনের ফলে এদের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশ কয়লায় পরিবর্তিত হয় যা অবিশুদ্ধ কার্বন নামে পরিচিত।

উত্তোলন

মাটির তলায় হাজার হাজার ফুট গভীরে খনিতে কয়লা পাওয়া যায়। এ কয়লা উৎপাদন বা উত্তোলনের জন্য মাটি খুঁড়ে গভীর গর্ত করা হয়। অতঃপর মেশিনের সাহায্যে শ্রমিকেরা খনিতে ঢুকে কয়লা কেটে ট্রলিতে বোঝাই করে। লিফট মেশিনের সাহায্যে ট্রলি টেনে উপরে তোলা হয়। এভাবে বিভিন্ন মানের কয়লা উত্তোলিত হয়।

রান্নাবান্নার কাজে কয়লা ব্যবহার করা হয়। কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন করে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পূর্বে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রেলগাড়ি ইত্যাদি চালনা করতে বিপুল পরিমাণে কয়লা ব্যবহৃত হত।

কয়লার মজুদ সীমিত। খনি থেকে কয়লা একবার তুলে ফেললে সেখানে নতুন কয়লা হয় না। তাই এর ব্যবহারে সংযত হওয়া এবং অপচয় রোধ করা আবশ্যিক। আমাদের বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে বড় পুকুরিয়ার কয়লার খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দিনাজপুরের দীঘিলা গ্রামে সম্প্রতি আরও কয়লার মজুদের সম্পদ পাওয়া গেছে।

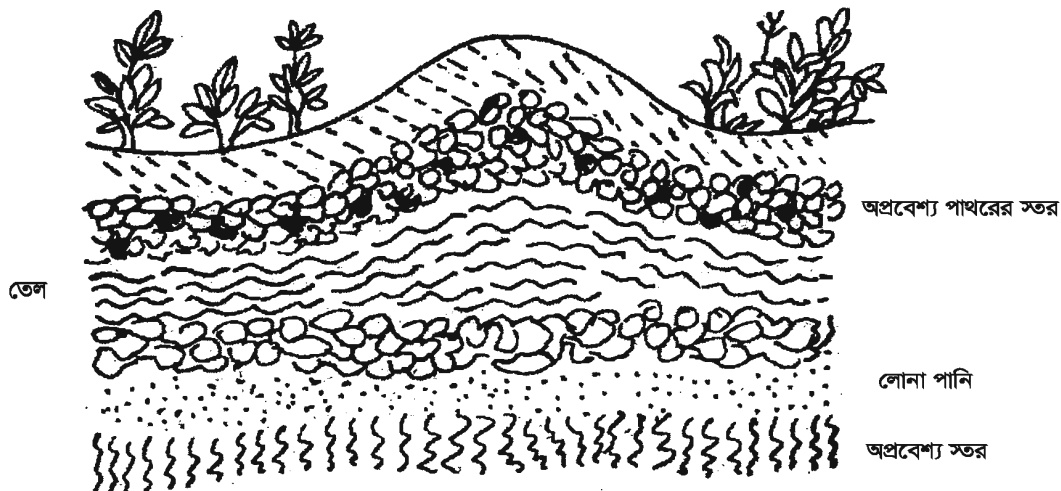
খনিজ তেল

বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ কালক্রমে কাদা ও বালিতে বেশ গভীরে ঢাকা পড়লে ভূ-অভ্যন্তর ভাগের প্রচণ্ড তাপ ও চাপে এ সকল পদার্থের জৈব বিধ্বংসী পাতন ঘটে। ফলে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল উৎপন্ন হয়। কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগের মিশ্রণ এ পেট্রোলিয়াম। প্রাকৃতিক গ্যাসও একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এর প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস।

উৎপাদন

মাটির অভ্যন্তরের গঠনের পরিবর্তন হেতু দুটো অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে পেট্রোলিয়াম জমা হয়। কখনও কখনও পানির

উপরে এ তেল ভাসমান অবস্থায় থাকে। ভূ-তত্ত্ববিদগণ মাটির অভ্যন্তর ভাগের এ গঠন নিরূপণ করে তেলের অস্তিত্ব জানার জন্য নানা রকম চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করেন। তাঁরা মাটির অল্প গভীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ চালিয়ে ভূ-গর্ভস্থ নানা রকম তথ্য নির্দেশক মানচিত্র তৈরি করেন। ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র দেখে বিজ্ঞানীগণ খনি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করেন। অতঃপর মাটি খুঁড়ে তাঁরা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ ধরনের পরীক্ষা অবশ্যই ব্যয়বহুল। তাই প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে, তেল উত্তোলন লাভজনক হবে তবেই আরও গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়।



চিত্র ৭.১ : ভূ-নিম্নস্থ শিলা স্তরের গঠন

তেলের উপাদান পৃথকীকরণ

খনি থেকে উত্তোলিত পেট্রোলিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে। তবে এদের মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কার্বন ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন। শোধনাগারে আংশিক পাতন যন্ত্রের সাহায্যে উপাদানগুলো পৃথক করে একাধিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ আকারে পাওয়া যায় রিফাইনারি গ্যাস, পেট্রোল, কেরোসিন ডিজেল তেল লুব্রিকেটিং বা পিচ্ছিলকারক তেল এবং বিটুমিন। এগুলোর ব্যবহার নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হল :

উপাদান	ব্যবহার
রিফাইনারি গ্যাস	বোতল ভর্তি করে বাজারে বিক্রি হয়। বাণিজ্যিক প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
পেট্রোল	মোটরগাড়ির জ্বালানি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
কেরোসিন	গৃহকর্মে ব্যবহৃত হয়।
জেট পেট্রোল	উড়োজাহাজের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ডিজেল তেল ও জ্বালানি তেল	রাসায়নিক দ্রব্য, মোম, পালিশ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণে এবং জাহাজ ও ভারী শিল্পের চুল্লির জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।
বিটুমিন	রাস্তা, বাড়ির ছাদ তৈরিতে এবং ওয়াটার প্রুফ দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস

আমাদের দেশে খনিতে প্রচুর গ্যাস মজুদ আছে। বর্তমানে হরিপুর, বাখরাবাদ ও তিতাসে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। গ্যাস সহজে নলযোগে বা পাম্প করে স্থানান্তর করা হয়। অনেক দেশে তরল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি করে বাজারজাত করা হয়।

যাবতীয় যৌগিক পদার্থকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— জৈব ও অজৈব যৌগ। সকল জৈব যৌগে কার্বন থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল জৈব পদার্থ। এগুলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের ফলে গঠিত হয়। এদের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+2} । ডোবা নালায় পচা জলাভূমিতে অশ্বকর রাতে তোমরা আলেয়া (Will-o-the-wisp) দেখে থাক। আর ভূত বলে ভয় পেয়ে থাক। আসলে এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়। পচা জৈব পদার্থ থেকে নির্গত মিথেন গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য বলে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে অনেক সময় আগুন ধরে যায় যা আলেয়া নামে পরিচিত।

খনিজ গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহ

ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ করে গ্যাসের খনি সন্ধান করা হয়। কোথাও গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে খনন করে মাটির গভীরে পাইপ প্রবেশ করিয়ে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি জটিল প্রকৌশল প্রক্রিয়া। গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপ, শাখা পাইপ বসিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সরবরাহ নল সম্পূর্ণরূপে বায়ু অপ্রবেশ্য হতে হয়। এভাবে নলযোগে জ্বালানি গ্যাস রান্নাঘর বা কলকারখানা পর্যন্ত চলে যায়।

খনিজ গ্যাস ও তেলের ব্যবহার

টেবিল-১ এ খনিজ তেলের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও খনিজ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে এবং সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। খনিজ গ্যাস থেকে কালি ও কালো রঙের রবার প্রস্তুতের জন্য ভুসা তৈরি করা যায়। মিথাইল এলকোহল, ফরম্যালডিহাইড ইত্যাদি খনিজ গ্যাস থেকে তৈরি হয়। ফরম্যালডিহাইড থেকে প্লাস্টিক ফরমাইকা ওষুধ, রঞ্জক দ্রব্য ও মৃতদেহ সঞ্চারকারী তরল পদার্থ তৈরি হয়। খনিজ তেল থেকে নাইলন, প্লাস্টিক দ্রব্য ও নানা রকম বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

খনিজ গ্যাস ও তেলের মজুদ ও সংগ্রহ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ প্রায় ৩.৪×১০^{12} ঘন মিটার। বর্তমান হারে এর ব্যবহার চলতে থাকলে আগামী ২০/২৫ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের এ মজুদ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি অত্যন্ত সীমিত পরিমাণের খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে তো বটেই, সারা বিশ্বেরই জীবাশ্ম জ্বালানি মজুদ সীমিত। কালক্রমে এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই এগুলো সংগ্রহ ও ব্যবহারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

খনিজ গ্যাস ও তেলের অপচয়রোধ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খনিজ গ্যাস ও তেল বিপুল পরিমাণে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রায়ই আমরা এদের অপচয় ও অপব্যবহার লক্ষ্য করি। নিম্নোক্ত উপায়ে আমরা জ্বালানির অপচয় রোধ করতে পারি :

- ১। রান্নাবান্না শেষে চুলা বন্ধ করে রাখা।
- ২। গ্যাসের চুলার ওপর কাপড়-চোপড় শুকানো বন্ধ করা।
- ৩। পথের মধ্যে থামতে হলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখা।
- ৪। যানবাহনের ইঞ্জিন ত্রুটিমুক্ত রাখা। কারণ ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনে বেশি তেল খরচ হয়।
- ৫। ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

আমাদের মনে রাখতে হবে, খনিজ গ্যাস ও তেল আমাদের মূল্যবান সম্পদ, শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। এ সম্পদ সঞ্চার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধান

এ যাবত প্রাপ্ত প্রাকৃতিক শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি অবিরত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হলেও এর প্রারম্ভিক খরচ, শক্তি সরবরাহে অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি এবং বৃহৎ শক্তির একচেটিয়া প্রভাব একে উন্নয়নশীল ছোট ছোট দেশগুলোর নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছে।

আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এটা নবায়নযোগ্য নয়। নবায়নযোগ্য নয় এমন কোনো শক্তির উৎসের ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না। আমাদের দেশের প্রায় বার কোটি একাশি লক্ষ লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্না-বান্নার কাজে বছরে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টন প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সব জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, খড়কুটা, গোবর প্রভৃতি পচনশীল পদার্থ। এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু রান্নার কাজে জ্বালিয়ে ফেলার কারণে মাটি জৈব সার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (Micronutrient) বা অনুপরিপোষক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, চীন দেশের জমিতে জৈব আবর্তন চক্র ৬৫ শতাংশ, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এ পরিমাণ মাত্র ১১ শতাংশ।

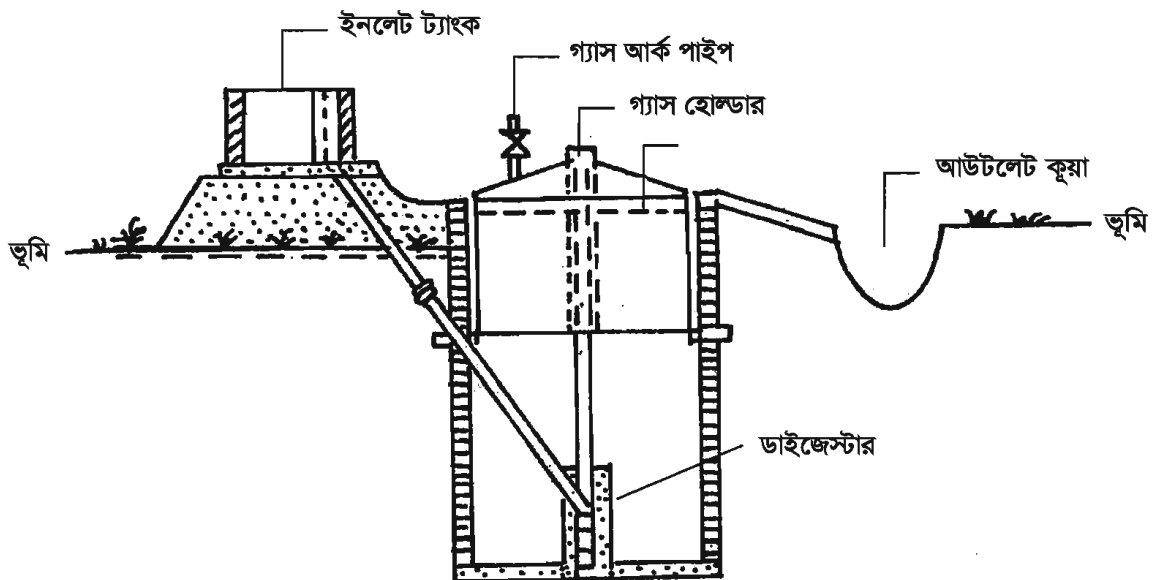
রান্নার কাজে প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে দেশের শুধু বনজ সম্পদই ধ্বংস হচ্ছে না, আমাদের আবহাওয়াতেও নেমে আসছে বড় ধরনের বিপর্যয়।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে জ্বালানির এ বিরাট খাতে বিকল্প উৎসের সম্পদন করা হচ্ছে অবিরত। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এবং সৌরশক্তিকে আংশিকভাবে হলেও কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহও শক্তির এক একটি উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বায়োগ্যাস

ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি শহরে গ্যাসের চুলায় রান্না-বান্না করতে দেখা যায়, তাই না? এ গ্যাস তিতাস বা বাখরাবাদ গ্যাস নামে পরিচিত। সিলেটের হরিপুরে প্রথম এ গ্যাস পাওয়া যায়। এগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুরূপ গ্যাস নানা রকম প্রাণী ও উদ্ভিদের বর্জ্য থেকে তৈরি করার ব্যবস্থা করা যায়। এ ধরনের গ্যাসকে বলে বায়োগ্যাস।

বায়ো (BIO) অর্থ জীবন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের অধিকারী বিধায় এদের দেহ বা দেহ নিঃসৃত পদার্থ পচনশীল। গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি পদার্থ পানিতে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে রাখলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এর ফার্মেন্টেশন (Fermentation) বা গাজন প্রক্রিয়া ঘটে। ফলে এক ধরনের বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত দাহ্য। এর শতকরা ৬০-৭০ ভাগই মিথেন গ্যাস।



চিত্র ৭.২ : ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট

বায়োগ্যাস উৎপাদন

বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তি খুবই সাধারণ ও চিন্তাকর্ষক। যে ধরনের ব্যবস্থায় বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয় তাকে বায়োগ্যাস প্লান্ট বলে। দুনিয়ার সকল দেশে দুধরনের বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহৃত হয়। যথা :

১। ভাসমান গম্বুজ জৈবগ্যাস কারখানা (Floating Dome Biogas Plant)

২। স্থির গম্বুজ জৈবগ্যাস কারখানা (Fixed Dome Biogas Plant)

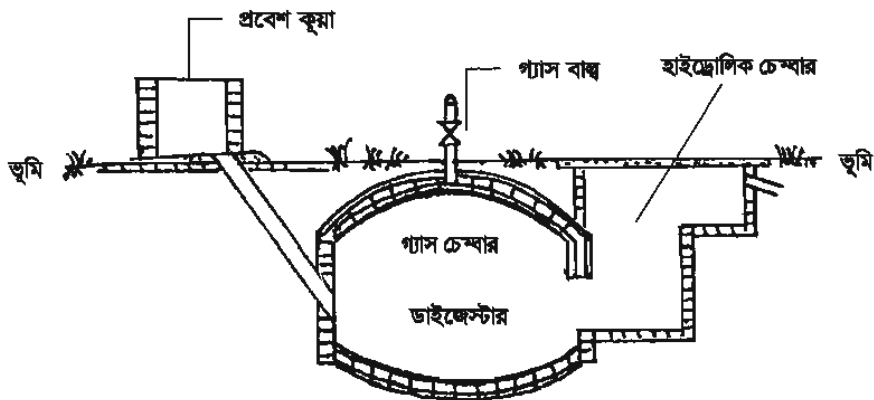
কারখানা বা প্লান্ট নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণের সহজলভ্যতা, খরচ, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে এর ধরন বা মডেল নির্বাচিত হয়ে থাকে। কাঁচামাল হিসেবে গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরিপানা বা জলজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া মানুষের মলমূত্রও বায়োগ্যাস তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৭.২-এ বিভিন্ন অংশের নামসহ একটি ভাসমান ডোম বিশিষ্ট জৈবগ্যাস কারখানা দেখা যাচ্ছে। এর দুটো অংশ প্রধান। যে অংশ নিচে থাকে তাকে বলে ডাইজেষ্টার (Digester) বা কোমলায়ন যন্ত্র এবং যে অংশটিতে গ্যাস জমা হয় তাকে বলে গ্যাসহোল্ডার বা গ্যাসধারক। গোবর বা যে কোনো পদার্থকে নির্দিষ্ট অনুপাতে পানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রবেশ কুয়ায় রাখলে তা প্রবেশ নলের মাধ্যমে ডাইজেষ্টার যন্ত্রে চলে যায়। এখানেই গাজন প্রক্রিয়া ঘটে এবং গ্যাস উৎপন্ন হয়। সৃষ্ট গ্যাস স্লারীর মধ্যে আংশিক নিমজ্জিত ভাসন্ত গম্বুজে জমা হয়। ভিতরে গ্যাস বৃদ্ধির সাথে সাথে ধারকটি উপরের দিকে ওঠে। এ ধারক গম্বুজটি সাধারণত ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ মডেলে তরল/স্লারী জাতীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। ধারক গম্বুজে মজুদ গ্যাস নির্গম নল দিয়ে ব্যবহারের জায়গায় নেওয়া হয়। কোমলায়ন যন্ত্রে প্রবর্ত পদার্থ বায়ুর অনুপস্থিতিতে পচে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে ডান পাশের কুয়ায় গিয়ে পড়ে। এর অবশেষ বা রেসিডিউ মূল্যবান জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভাসন্ত ডোম বিশিষ্ট জৈবগ্যাস কারখানা তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশি কার্যক্ষম থাকে না। এর গ্যাস ধারকটি এম এস শিট দিয়ে তৈরি বলে মরিচা ধরে ছিদ্র হয়ে যায়। গ্রামে-গঞ্জে পরিবহণ ও ওয়েলডিং সুবিধা থাকে না বলে এগুলো অকেজো হয়ে পড়ে।

স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট

ভাসন্ত ডোম বায়োগ্যাস প্লান্টের স্থায়িত্ব কম এবং খরচ বেশি পড়ে। এ জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট।



চিত্র ৭.৩ : স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট

Three diagrams illustrating the layout and dimensions of a water treatment plant. The top diagram is a plan view showing a circular tank with a diameter of 125 feet, a rectangular building (125 x 60 feet), and a rectangular tank (125 x 60 feet). The middle diagram is an elevation view of the circular tank showing a height of 150 feet. The bottom diagram is an elevation view of the rectangular building showing a height of 100 feet.

চিত্র ৭.৪ : ৭-৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন একটি বায়োগ্যাস প্লান্টে নির্মাণের খঁটিনাটি ক ও খ তে দেখানো হল।

বায়োগ্যাস প্লান্ট এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ডাইজেস্টার (চিত্র ৭.৪ (ক) বা কোমলায়ন যন্ত্র। ৭-৮ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের রান্নাবান্না ও বাতি জ্বালানোর চাহিদা মেটানোর জন্য ২.৫ মিটার ব্যাস ও ২.২ মিটার গভীর গোলাকার কুয়া খনন করে এর তলার মধ্যবিন্দু আর্চের মতো করে নির্মাণ করা হয়। এর বামদিকে প্রবেশ কুয়ার দিকে প্রবেশ নলের এবং ডানদিকে হাইড্রোলিক চেম্বারের দিকে খোলাপথ রাখা হয়।

ডাইজেন্স্টার ও হাইড্রোলিক চেম্বার তৈরি করার পদ্ধতি

ডোমের উপরের অংশে গ্যাস নির্গমনের জন্য একটি ১.২৭ সে. মি. ব্যাস বিশিষ্ট ২৫ সে. মি. লম্বা জিআই পাইপ খাড়াভাবে স্থাপন করতে হয়। এ পাইপের ওপরের অংশে গ্যাসভাঙ্গ সযুক্ত করতে হয়। হাইড্রোলিক চেম্বারের মুখের ওপর থেকে ডোমের উপরিভাগ বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করা হয় যাতে এটি নিশ্চিত হয়।

হাইড্রোলিক চেম্বারটি (চিত্র ৭.৪) (খ) একটি আয়তাকার চৌবাচ্চা। বিশেষ পরিমাপ মতো এটি নির্মিত। ব্যবহৃত স্লারীর নির্গমনের জন্য একটি খোলাপথ বা দরজা রাখা হয়। এই হাইড্রোলিক চেম্বারের ওপরের অংশ স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

প্রবেশ নলের মুখে থাকে পুরু ইট নির্মিত চৌবাচ্চা। এর ভিতরের অংশ ভালোভাবে প্লাস্টার করে দিতে হয়। ডাইজেন্স্টার, হাইড্রোলিক চেম্বার ও প্রবেশ নলের মুখের চৌবাচ্চা তৈরির পর প্লাস্টার চারপাশ মাটি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হয় যেন ডোমের ওপরের অংশও মাটির নিচে থাকে।

প্লান্ট চালু করা

প্লান্টটি চালু করার সময় ১.৫-২.০ টন কাঁচামাল যেমন-হাঁস-মুরগির মল, মানুষের মল জাতীয় পচনশীল পদার্থের প্রয়োজন। এ কাঁচামাল এবং পরিষ্কার পানি, গোবরের ক্ষেত্রে ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে প্রবেশনল দিয়ে আস্তে আস্তে কুয়ায় ঢালতে হয়। এ সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন মাটির ঢেলা, পাথর, বালি, খড়কুটা ঢুকে না পড়ে। প্লান্ট সম্পূর্ণ ভর্তি না হলে পানি দিয়ে বাকি অংশ ভর্তি করে দিতে হয়।

গ্যাসভাঙ্গ-এর ছিদ্র পরীক্ষা করে প্লান্ট থেকে চুলা, হাজারাক লাইট বা জেনারেটর পর্যন্ত পাইপ সংযোগ করতে হবে। বায়োগ্যাসে পানি মিশ্রিত থাকে। তাই সরবরাহ লাইনের মাঝখানটা উঁচু করে রাখতে হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ও বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিচালনা ও সত্ৰক্ষণ খুবই সহজ। নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করলেই সুষ্ঠুভাবে গ্যাস পাওয়া যায় :

- ১। চার্জিং করার সময় যেন শক্ত ইট, কাঠের টুকরা, মাটির ঢেলা বা পাথর ঢুকে না পড়ে।
- ২। কখনও প্রবেশ নল বন্ধ হয়ে গেলে সরু ও সোজা বাঁশ ঢুকিয়ে নেড়ে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন নলের গায়ে, কুয়ার তলা বা দেয়ালে আঘাত না লাগে।
- ৩। গ্যাস নলে পানি জমলে নলের নিকটতম মাথা খুলে পানি বের করে দিতে হয়।
- ৪। প্রতিদিন প্লান্ট চার্জ করতে হবে। নতুবা গ্যাস উৎপাদন কমে যাবে। আবার বেশি দিন চার্জ না করলে প্রবেশ নল বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

তিতাস গ্যাসের মতোই এ গ্যাস ব্যবহার করা যায় :

- ১। এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ গ্যাসে কোনো ধোঁয়া হয় না। তাই হাঁড়ি-পাতিল পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ২। ম্যান্টেল জ্বলে হাজারাক লাইটের মতো ঘর আলোকিত করা যায়।
- ৩। জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিআর ইত্যাদি চালানো যায়।
- ৪। পাম্প চালিয়ে কৃষি জমিতে পানি সেচ করা যায়।
- ৫। এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালানো যায়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারে সুবিধা : বায়োগ্যাস ব্যবহারের বহুবিধ সুবিধা নিচে উল্লেখ করা হল :

সাধারণ সুবিধা

- ক) পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্যাস।
- খ) উন্নতমানের জৈবসার পেতে সাহায্য করে।
- গ) দূষণমুক্ত পরিবেশের সহায়ক।
- ঘ) স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখে।

আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা

ক) বর্জ্য পদার্থ প্লান্টে ব্যবহারের ফলে গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে (রেসিডিউ) তা উন্নতমানের একটি জৈবসার। এতে জৈব পদার্থ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও অনুপরিপোষক সংরক্ষিত থাকে। এ সারের গুণগত মান খুবই উন্নত। এ সার মশরুম, মাছ, কেঁচো, মুক্কা ইত্যাদি চাষের কাজে লাগানো যায়।

খ) যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিবেশ দূষিত করে বায়োগ্যাস প্রযুক্তিতে তা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা দুর্গন্ধমুক্ত সারে পরিণত হয়। ঐ সকল আবর্জনায় যে সকল ক্ষতিকর জীবাণু থাকে তাও প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

গ) বর্তমানে গাছগাছড়া, খড়কুটা, নাড়া, গোবর ইত্যাদি রান্নাবান্নার জ্বালানি হিসেবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে মাটি প্রাকৃতিক সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি গ্রহণ করলে মাটি জৈবচক্র সংরক্ষণের মাধ্যমে জৈব সার লাভে সমর্থ হবে।

জ্বালানি চাহিদা

প্রায় *১৪.০৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টনেরও বেশি (১৭০ কোটি মণ) জ্বালানি রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রায় সবটাই কাঠ, খড়কুটা, নাড়া, শুকনো গোবর ইত্যাদি। প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে এগুলো ব্যবহারের ফলে দেশের বনজ সম্পদ বিরান হচ্ছে, মাটি উর্বরতা হারাচ্ছে এবং পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। ফলে আগামী দিনে বর্ধিত জনসংখ্যার জ্বালানি চাহিদা পূরণে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হবে। জ্বালানি সঙ্কট মোকাবিলায় বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

সঙ্কট নিরসনে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি

বাংলাদেশে গো-মহিষের সংখ্যা প্রায় ২২ মিলিয়ন। এ সকল গো-মহিষ দৈনিক প্রায় ২২০ মিলিয়ন কেজি গোবর প্রদান করে। প্রতি কেজি গোবর হতে ০.০৩৭ ঘনমিটার গ্যাস হিসেবে বছরে প্রায় ২.৯৭×১০^৯ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া সম্ভব। এ গ্যাস ১.৫২×১০^৬ টন কেরোসিন বা ৩.০৪×১০^৬ টন কয়লার জ্বালানি মানের সমান। এছাড়া মানুষ, হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র আবর্জনা, কচুরিপানা বা জলজ উদ্ভিদ থেকেও বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন সম্ভব। আমাদের দেশের প্রতিটি পরিবারকে বায়োগ্যাস প্লান্টের সাথে সংযুক্ত করতে পারলে শুধু মানুষের মলমূত্র থেকেই বছরে ১.০৩×১০^৯ ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব।

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শহর ও নগর জীবনের পার্থক্য অনেক কমিয়ে দিতে পারে। জৈব গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে সুদূর পল্লীগায়েও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, ঘর আলোকিত করার সুন্দর আলো, টিভি চালানোর মতো বিদ্যুৎ হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে। এ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের ওপর চাপ কমবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

উৎস * স্ট্যাটিসটিকাল প্যাকেট বুক -২০০৭.

করা সম্ভব হবে, জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করে অধিক ফসল ফলানো যাবে এবং সর্বোপরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যেতে পারব। সুতরাং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি অবলম্বন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. খনিজ তেল | খ. গরুর গোবর |
| গ. পাটখড়ি | ঘ. শুকনো পাতা। |

নিচের অনুচ্ছেদ হতে ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমাদের দেশের প্রায় ১৫ কোটি লোকের খাদ্য প্রস্তুতিতে রান্নার কাজে কাঠ, গোবর, গ্যাস, শুকনো পাতা ইত্যাদি প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব প্রচলিত জ্বালানির মধ্যে বেশিরভাগই পচনশীল এবং এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। তাছাড়া এসব পচনশীল দ্রব্য থেকে গ্যাসও পাওয়া যায়। প্রতি কেজি গোবর থেকে প্রায় ০.০৩৭ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া যায়।

২। বাংলাদেশের গো-মহিষ থেকে বছরে প্রায় ২২০ মিলিয়ন কেজি গোবর পাওয়া গেলে তা হতে কী পরিমাণ বায়োগ্যাস পাওয়া যাবে?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ক. ২.৯৭×১০^৭ ঘন মিটার | খ. ২.৯৭×১০^৮ ঘন মিটার |
| গ. ২.৯৭×১০^৯ ঘন মিটার | ঘ. ২.৯৭×১০^{১০} ঘন মিটার |

৩। রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য বায়োগ্যাস সাশ্রয়ী, কারণ—

- পশুর মলমূত্র থেকে উৎপাদন করা যায়।
- মানুষের মলমূত্র থেকে উৎপাদন করা যায়।
- উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পচিয়ে উৎপাদন করা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। বায়োগ্যাস ব্যবহারে—

- জৈব সারের অভাব হবে।
- দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। রহিম সাহেব বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ নিয়ে 10KW বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি প্লান্ট স্থাপন করেন। প্রতিবেশী জেরিনা বেগম 75W এর ২টি ফ্যান এবং 10W-এর ৪টি বাতির জন্য রহিম সাহেবের নিকট হতে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ এর জন্য জেরিনা বেগমকে ৫.০০ টাকা প্রদান করতে হয়।
 - ক. বায়োগ্যাস বলতে কী বুঝায়?
 - খ. বায়োগ্যাস কীভাবে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে কাজ করে?
 - গ. জেরিনা বেগমকে জুন/২০০৭ মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়েছিল?
 - ঘ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

জীবের কৌশিক গঠন ও প্রকৃতি

পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে বহু বিচিত্র জীব। এ সব জীব ও জড় জগৎ নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সমন্বয়েই গঠিত জীবজগৎ। এ বিশাল জীবজগৎ মানব জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যেমন অনেক মিল আছে, তেমনি এদের মধ্যে অনেক অমিলও রয়েছে। তবে সকল সুসংগঠিত জীবের দেহ কোষ দিয়ে গঠিত। এরা খাদ্য গ্রহণ করে, শ্বসন ক্রিয়া চালায় অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ থেকে বর্জন করে, উভয়েরই জন্ম-মৃত্যু আছে। আলো, তাপ, ঠান্ডা, স্পর্শ ইত্যাদি উদ্দীপনায় উভয়েই সাড়া দেয়। উভয়ের দেহের বৃদ্ধি ঘটে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় উভয়েই বংশবৃদ্ধি করে। তাই জীবের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার পূর্বে জীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সুষ্ঠু ধারণা লাভ অপরিহার্য।

জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি জীবের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে জীবিত বস্তুকে জড়বস্তু থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়। জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বেঁচে থাকার তাগিদে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে নানাভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও এদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সামঞ্জস্য দেখা যায়। যেমন—

শ্বসন : শ্বসন প্রক্রিয়ায় সজীব কোষের জৈব খাদ্যস্থ স্থিতিশক্তি অক্সিজেনের সাহায্যে দহনের ফলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি জীবের বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়।

পুষ্টি : জীবের বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্যের মূলে রয়েছে শক্তি। জীবদেহে এই শক্তির যোগান দেয় খাদ্য। খাদ্যে শক্তি স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। জীবন ধারণের জন্য তাই সকল জীবকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

রেচন : জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিপাক ক্রিয়া চলে। বিপাকের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে অপসারিত হয়। কখনও কখনও দেহে বর্জ্য পদার্থ অদ্রব্য বস্তু হিসেবে সঞ্চিত থাকে।

বৃদ্ধি : খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়, ফলে দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। দেহের বৃদ্ধিতে প্রোটোপ্লাজম মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

চলাচল : প্রাণী স্বেচ্ছায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে। উদ্ভিদ চলাচল করতে পারে না। কিন্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে শাখা-প্রশাখার বিস্তার এবং ফল ও বীজের বিস্তরণ ঘটাতে পারে।

উদ্দীপনা : সকল জীব ঠান্ডা, তাপ, স্পর্শ, আলো ইত্যাদি উদ্দীপনা ও উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

বংশ বৃদ্ধি : প্রজনন ক্রিয়ায় প্রতিটি জীব অনুরূপ জীবের জন্ম দিয়ে বংশ বিস্তার ও বংশ রক্ষা করে।

জীবন চক্র : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র অতিক্রম করে। জীবের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, বংশ বিস্তার ঘটে এবং অবশেষে এক সময় মৃত্যু হয়।

জীবের কৌষিক গঠন

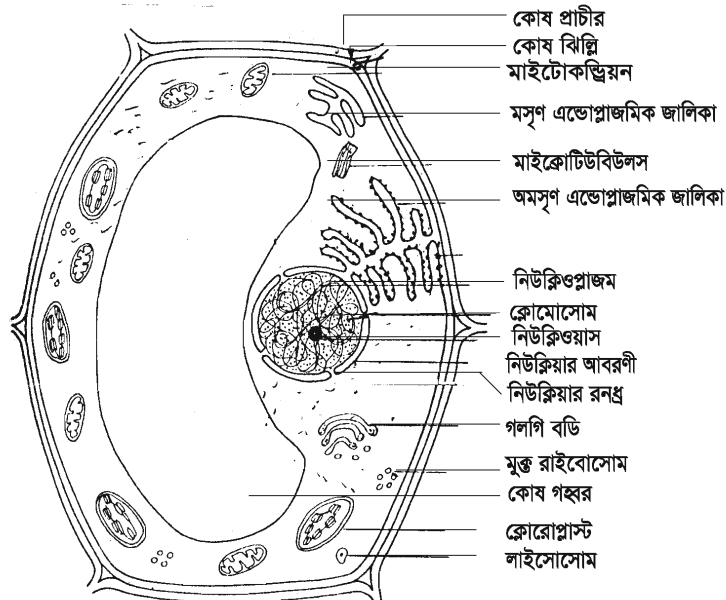
একটি বৃহৎ দালান যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দিয়ে তৈরি, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ বহুকোষী জীবদেহও অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবদেহ এক বা একাধিক সূক্ষ্ম কোষ দিয়ে তৈরি। এই কোষ হচ্ছে জীবদেহের যাবতীয় কাজের, যেমন— শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার প্রভৃতির আধার। কারণ, প্রতিটি জীবের শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য যে শক্তির দরকার, তা তৈরি হয় কোষের ভেতর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে। কাজেই কোষকে একটি ক্ষুদ্র রাসায়নিক কারখানা বলা যায়। শুধু জীবন ধারণের জন্যই নয়, বংশ-পরম্পরায় জীবের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্বও পালন করে এই কোষ। তাই কোষই হচ্ছে জীবদেহের ও কাজের একক। প্রকৃতপক্ষে জীবিত পর্দা দিয়ে আবৃত প্রোটোপ্লাজমকে কোষ বলা হয়। ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক কোষ আবিষ্কার করেন।

অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী জীবকোষ প্রধানত দুই প্রকার, যথা (১) দেহকোষ এবং (২) জননকোষ। দেহকোষ দেহের অঙ্গ এবং অঙ্গতন্ত্র গঠন করে। যেমন— পেশিকোষ, জাইলেমকোষ ইত্যাদি। যেসব জীবে যৌন প্রজনন ঘটে তাদের জননাজো জননকোষ তৈরি হয়। যেমন— শূক্রাণু, ডিম্বাণু, পুষ্পরেণু ইত্যাদি। জননকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। তাই জননকোষকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলা হয়। দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা জননকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ থাকে, তাই এ কোষকে ডিপ্লয়েড কোষ বলা হয়।

একটি আদর্শ কোষের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ

আকার ও আয়তনে বেশ ছোট হলেও কোষের গঠন এবং কাজ বেশ জটিল। একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত— কোষ প্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম। একটি আদর্শ উদ্ভিদের কোষের বিভিন্ন অংশের গঠন বৈশিষ্ট্য ও কাজ আলোচনা করা হল :

কোষপ্রাচীর ও কোষ ঝিল্লি : কোষপ্রাচীর কোষের বহিরাবরণী। এটি জড় সেলুলোজ নির্মিত এবং উদ্ভিদ কোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাণী কোষে কোনো কোষপ্রাচীর থাকে না। কোষপ্রাচীর কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদান করে। যে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক, সজীব আবরণী কোষের সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে রাখে তাকে কোষ ঝিল্লি বা পর্দা (Plasma membrane) বলে। কোষ ঝিল্লি কোষের বাইরে এবং ভেতরে পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।



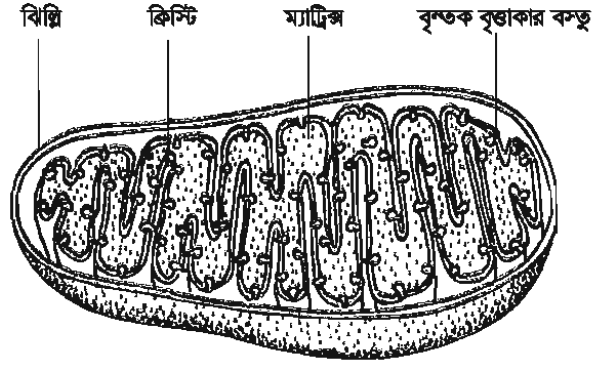
চিত্র ৮.১ : একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ

প্রোটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজম কোষের মূল গঠন উপাদান। এতে পানির পরিমাণ শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ। নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড ইত্যাদি প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান অথবা ডুবন্ত অবস্থায় থাকে।

প্রোটোপ্লাজম আমিষ, শর্করা, লিপিড ইত্যাদি জৈব পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত। অজৈব দ্রব্যের মধ্যে খনিজ পদার্থ এবং পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস প্রধান। কোষের সমস্ত কাজ প্রোটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়। এটা সাধারণত গতিশীল এবং বংশবিস্তারে সক্ষম।

সাইটোপ্লাজম : নিউক্লিয়াসকে বেষ্টিতকারী প্রোটোপ্লাজমের অংশটি হচ্ছে সাইটোপ্লাজম। এটি প্রধানত আমিষ দিয়ে তৈরি। সাইটোপ্লাজমে কোষের যে প্রধান অঙ্গাণুগুলো থাকে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

মাইটোকন্ড্রিয়া : মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শ্বসন অঙ্গাণু। কোষের জৈবিক কাজ পরিচালনার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তার একমাত্র উৎস মাইটোকন্ড্রিয়া। তাই একে কোষের ‘শক্তিঘর’ (Power house) বলা হয়। সমস্ত অক্সিজেন পরিবহণ ও শ্বসন কাজ পরিচালনায় এটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। মাইটোকন্ড্রিয়া দেখতে গোলাকার, দণ্ডাকার অথবা সূত্রাকার। উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের সাইটোপ্লাজমে এরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে।



চিত্র ৮.২ : মাইটোকন্ড্রিয়া

মাইটোকন্ড্রিয়া দুটি আবরণী দিয়ে তৈরি। বাইরের আবরণী মসৃণ কিন্তু ভেতরের আবরণীটি নানাভাবে ভাঁজ হয়ে ভেতরের দিকে ঝুলে থাকে। ঝুলে থাকা ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় ৭৩% প্রোটিন, ২৫% লিপিড এবং ০.৫% RNA থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের অর্ধতরল দানাদার পদার্থকে ম্যাট্রিক্স বলে।

কোষ গহ্বর : সাইটোপ্লাজমে একক পর্দা বেষ্টিত তরলে পূর্ণ গহ্বরকে কোষ গহ্বর বলে। কোষ গহ্বরে পানি, জৈব এসিড, শর্করা, খনিজ লবণ ইত্যাদি জমা থাকে। উদ্ভিদের কোষ গহ্বর বেশ বড় এবং কোষের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থান করে। প্রাণী কোষের কোষ গহ্বর আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু সংখ্যায় বেশি। এটি কোষের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

প্লাস্টিড বা বর্ণাধার : উদ্ভিদ কোষে বর্ণযুক্ত বা বর্ণহীন যে অঙ্গাণু দেখা যায় তাকে প্লাস্টিড বা বর্ণাধার বলে। প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফলের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে প্লাস্টিড সবুজ ক্লোরোফিল ধারণ কর তাকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের জন্য উদ্ভিদের পাতা সবুজ দেখায়। ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল ক্যারোটিন এবং য়ান্থফিল থাকে। ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে।

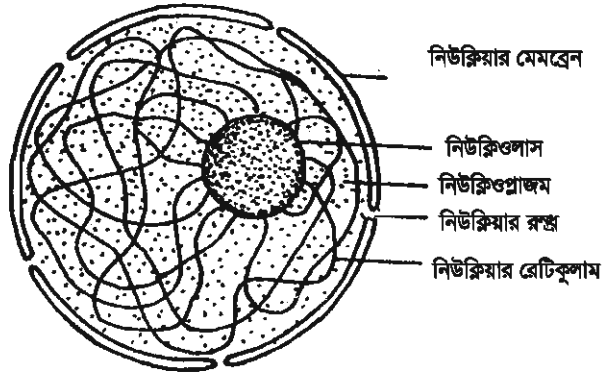
সবুজ বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ (লাল, হলুদ) বিশিষ্ট প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। এতে প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিন এবং য়ান্থফিল থাকে। ক্রোমোপ্লাস্টের জন্য ফুল ও ফল বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। আর এ কারণে কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরাগায়ন ঘটায়।

বর্ণহীন প্লাস্টিড হল লিউকোপ্লাস্ট। এটি উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশে (মূল, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড) পাওয়া যায়। এটি খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus) : প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন, প্রায় গোলাকার কোষীয় অঙ্গাণুটিকে ‘নিউক্লিয়াস’ বলে। নিউক্লিয়াস কোষের সমস্ত জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়াস একটি সূক্ষ্ম সজীব আবরণী দিয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক থাকে। এ সজীব আবরণীকে নিউক্লিয়ার আবরণী বলে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে আমিষের তৈরি তরল পদার্থকে নিউক্লিওপ্লাজম বলে। এক বা একাধিক যে উচ্ছ্রল

গোলাকার বস্তু নিউক্লিয়াসে থাকে তাকে নিউক্লিওলাস (Nucleolus) বলে। নিউক্লিওলাস কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে লম্বা সুতার মতো কতকগুলো বস্তু দেখা যায় সেগুলো ক্রোমোসোম (Chromosome)। অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম জিন বা বংশাণু নিয়ে ক্রোমোসোম তৈরি। জিনের রাসায়নিক গঠন উপাদান হচ্ছে ডিএনএ (DNA)। জিনের মাধ্যমে বাবা-মা থেকে জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন-দেহের আকার, আয়তন, রং, লিঙ্গ ইত্যাদি সন্তান-সন্ততিতে পরিবাহিত হয়। তাই ক্রোমোসোমকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলে।



চিত্র ৮.৩ : নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র

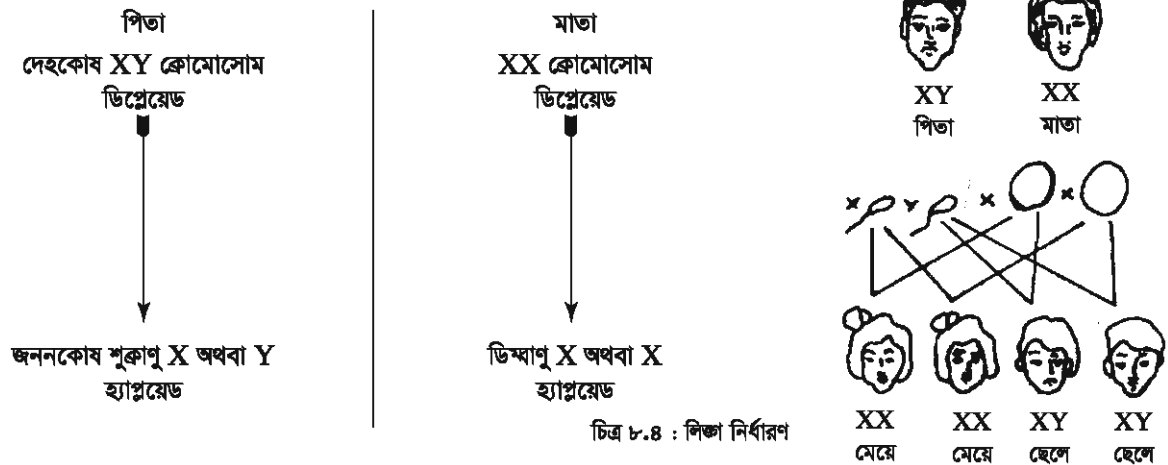
নিউক্লিয়াস কোষের সমস্ত জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াস ছাড়া কোষ বেঁচে থাকতে পারে না। তাই একে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোসোম

মানবদেহের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। তার মধ্যে ২২ জোড়া দেহের গঠনপ্রণালি ও জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, বাকি একজোড়া সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

স্ত্রী লোকদের ডিপ্লয়েড কোষে দু'টি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোমই X ক্রোমোসোম (XX)। কিন্তু পুরুষদের বেলায় একটি X এবং অপরটি Y ক্রোমোসোম (XY)। স্ত্রীলোকদের ডিম্বাণু গঠনের সময় প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোসোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোসোম লাভ করে। কিন্তু পুরুষদের শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক শুক্রাণু X ক্রোমোসোম এবং অপর অর্ধেক Y ক্রোমোসোম লাভ করে। গর্ভধারণকালে X ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু যদি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তবে নিষিক্ত ডিমের ক্রোমোসোম হবে XX এবং সন্তান হবে কন্যা। অপরপক্ষে Y ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু দিয়ে যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় তবে নিষিক্ত ডিম্বে ক্রোমোসোম হবে XY। ফলে ভূমিষ্ঠ হবে পুত্র সন্তান।

আমাদের দেশে মায়েরা কন্যা সন্তান প্রসব করলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণে মাকে অপবাদ দেওয়া হয়। অথচ কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার ব্যাপারে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই।



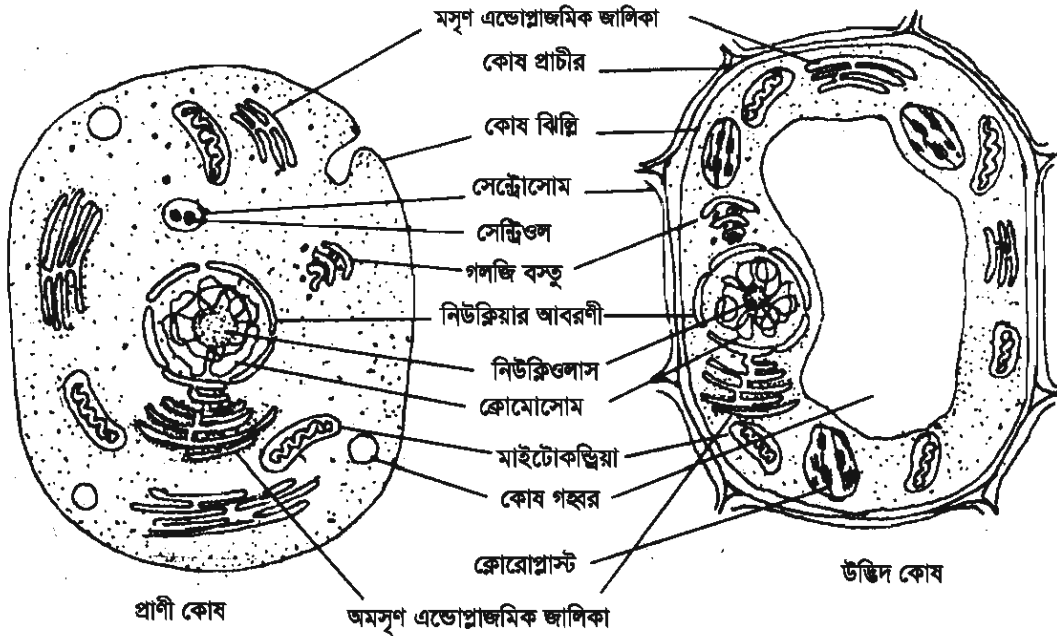
চিত্র ৮.৪ : লিঙ্গ নির্ধারণ

উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষ

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষ পর্যবেক্ষণ করলে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের মধ্যে পার্থক্য

উদ্ভিদ কোষ	প্রাণী কোষ
১. উদ্ভিদ কোষে গ্লাজমা আবরণীর বাইরে সেলুলোজের তৈরি জড় কোষপ্রাচীর থাকে।	১. প্রাণী কোষে গ্লাজমা আবরণী থাকে, কোষপ্রাচীর থাকে না।
২. উদ্ভিদ কোষে সাধারণত প্লাস্টিড থাকে।	২. প্রাণী কোষে প্লাস্টিড থাকে না।
৩. উদ্ভিদ কোষে গহ্বর বড় হওয়ায় নিউক্লিয়াস কোষের একদিকে অবস্থান করে।	৩. প্রাণী কোষে গহ্বর আকারে অত্যন্ত ছোট এবং সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। ফলে নিউক্লিয়াস কোষের কেন্দ্রে থাকে।
৪. উদ্ভিদ কোষে শর্করা স্টার্চরূপে মজুদ থাকে।	৪. প্রাণী কোষে শর্করা গ্লাইকোজেনরূপে মজুদ থাকে।
৫. এতে সেন্ট্রোসোম থাকে না।	৫. এতে সব সময় সেন্ট্রোসোম থাকে।



চিত্র ৮.৫ : উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষ

কোষের রূপান্তর

প্রতিটি জীবই শুরুতে এককোষ বিশিষ্ট (নিষিক্ত ডিম্বক) হয়ে থাকে। এককোষী জীব ছাড়া (ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা ইত্যাদি) সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী এই এককোষী অবস্থা থেকেই বিভাজিত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বহুকোষী জটিল বিভিন্ন আকার ও আয়তন বিশিষ্ট দেহের অধিকারী হয়ে থাকে। জীবদেহের এ বৃদ্ধি বার বার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এভাবে বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হওয়ার পরেই এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জৈবিক কাজের জন্য শ্রমবন্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার ফলে জীবের নানাবিধ কাজের উপযোগিতার জন্য কোষগুলোর রূপান্তর ঘটে, যার ভিত্তিতে টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র তথা বিচিত্র রকমের দেহের উদ্ভব হয়।

বহুকোষী জীবে এক এক ধরনের কোষ এক এক ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। যেহেতু এ সব কোষের কাজ নির্দিষ্ট সেহেতু এদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয়ের ফলে টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্রের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সমতা রক্ষা পায় এবং জীবের সার্বিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এ কারণে জীব সঠিকভাবে নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে এবং খাদ্য গ্রহণ, দৈহিক বর্ধন ও প্রজননে সক্ষম হয়।

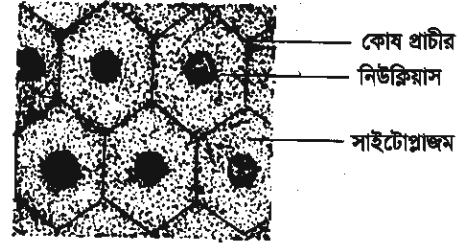
টিস্যু (Tissue)

উন্নত জীবদেহে বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। চলন, শ্বসন, পুষ্টি, আত্মরক্ষা প্রভৃতি জৈবিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য একই আকৃতি ও প্রকৃতির কিছু কোষ গুচ্ছবদ্ধ হয়। এ গুচ্ছবদ্ধ কোষগুলো টিস্যু নামে পরিচিত। কখনও কখনও একই জাতীয় কোষ বা ভিন্ন আকৃতির কোষ গুচ্ছবদ্ধ হয়েও টিস্যু তৈরি করে।

বহুকোষী উদ্ভিদে কাজের বিভিন্নতা ও বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে টিস্যু দুই প্রকার যথা—

(ক) ভাজক টিস্যু ও (খ) স্থায়ী টিস্যু।

(ক) **ভাজক টিস্যু (Meristematic tissue)** : বিভাজনে সক্ষম কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকেই ভাজক টিস্যু বলে। ভাজক টিস্যুর কোষগুলো ডিম্বাকার বা আয়তাকার এবং বড় বড় নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। ভাজক টিস্যু অবিরত বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।



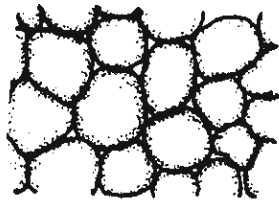
চিত্র ৮.৬ : ভাজক টিস্যু

উদ্ভিদের অন্তঃস্থকে ক্যাম্বিয়াম নামক এক বিশেষ ধরনের ভাজক টিস্যু থাকে। এটি এক স্তর বিশিষ্ট পারেনকাইমা টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যে বৃত্তাকারে অবস্থান করে।

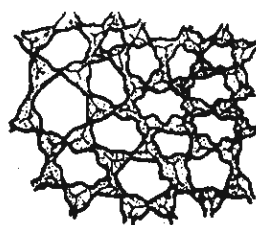
এ ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর বিভাজনের ফলে কাণ্ডের বাইরের দিকে নতুন ফ্লোয়েম টিস্যু এবং ভেতরের দিকে নতুন জাইলেম টিস্যু তৈরি করে। এভাবেই বড় গাছের কাণ্ড পার্শ্ব অর্থাৎ প্রস্থে বাড়ে। উদ্ভিদের এরূপ বৃদ্ধিকে গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) বলে। গৌণবৃদ্ধির ফলেই আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ মোটা হয়।

(খ) **স্থায়ী টিস্যু (Permanent tissue)** : ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে। স্থায়ী টিস্যু প্রধানত তিন প্রকার, যথা—(১) সরল টিস্যু, (২) জটিল টিস্যু ও (৩) স্ফারণকারী টিস্যু।

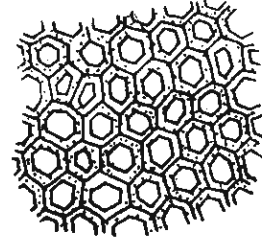
(১) **সরল টিস্যু (Simple tissue)** : যে সব টিস্যুর কোষের আকৃতি ও গঠন একই প্রকার সেগুলো সরল টিস্যু। যেমন— প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।



প্যারেনকাইমা



কোলেনকাইমা



স্ক্লেরেনকাইমা

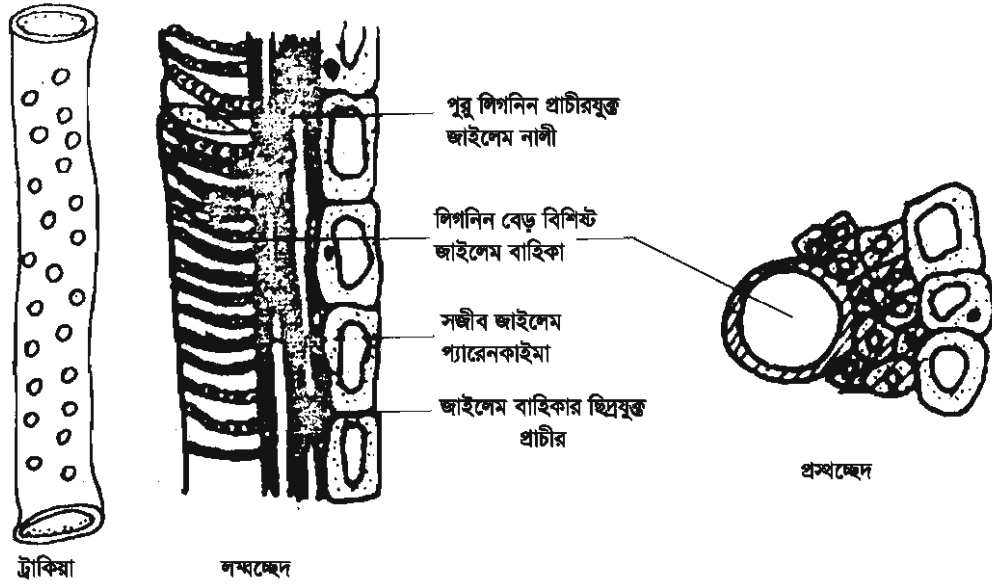
চিত্র ৮.৭ : সরল টিস্যু

প্যারেনকাইমা (Parenchyma tissue) : এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত এবং আকারে গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার। কোষের প্রাচীর পাতলা, সমান এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। নিউক্লিয়াসের আকৃতি বড়। প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণ এবং গহ্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে। উদ্ভিদের মূল, পাতা ও কাণ্ডের নরম অংশ এই টিস্যু দিয়ে তৈরি।

কোলেনকাইমা (Collenchyma) : এ টিস্যুর কোষগুলো কিছুটা লম্বাকৃতির ও সজীব। কোষ প্রাচীর অসমভাবে পুরু। কোষ প্রাচীরের কোণে পেকটিন জমা হওয়ায় ঐ স্থান অধিক মোটা। পত্রবৃন্তে, পত্র শিরায় ও ফুলের বোঁটায় কোলেনকাইমা থাকে। খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা প্রদান করা এ টিস্যুর কাজ।

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) : এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাকৃতির এবং এদের প্রান্তদ্বয় সরু। এদের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বললেই চলে। এদের প্রাচীর খুব স্থূল ও শক্ত। উদ্ভিদের ত্বকের নিচে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছের চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করাই এ টিস্যুর প্রধান কাজ।

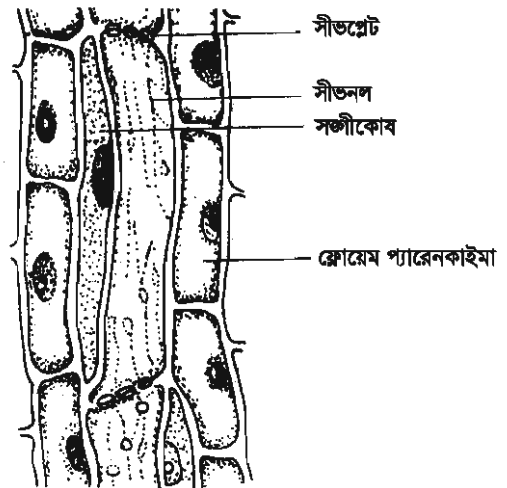
(২) জটিল টিস্যু (Complex tissue) : বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী টিস্যু একত্রিত হয়ে যখন একই কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে জটিল টিস্যু বলে। উদ্ভিদ দেহে এরা পরিবহণ টিস্যু তৈরি করে। জটিল টিস্যু দুই প্রকার। যেমন-জাইলেম ও ফ্লোয়েম।



চিত্র ৮.৮ : জাইলেম টিস্যু

জাইলেম (Xylem): যে জটিল টিস্যুর মাধ্যমে মাটি থেকে উদ্ভিদ দেহে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পরিবাহিত হয় তাকে জাইলেম বলে। জাইলেম ও ফ্লোয়েম পরিবহণ টিস্যু গুচ্ছ বা ভাস্কুলার বাউন্ডেল (Vascular bundle) গঠন করে। প্রধানত এ টিস্যু চারটি ভিন্ন প্রকার টিস্যু দিয়ে গঠিত। যথা-ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু।

ফ্লোয়েম (Phloem) : এ জটিল টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতায় তৈরি জৈব খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ফ্লোয়েম হল সজীব টিস্যু। ভাস্কুলার বাউন্ডেল গঠনে ফ্লোয়েম জাইলেমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ টিস্যুর কোষগুলো ভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন গঠনযুক্ত হয়েও নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে। সীতনল, সঞ্জীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত।



চিত্র ৮.৯ : ফ্লোয়েম টিস্যু

(৩) স্রাবকারী টিস্যু (Secretory tissue):

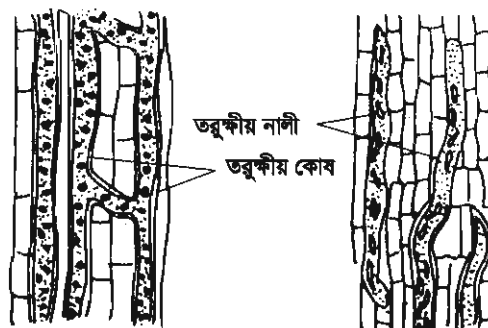
যে টিস্যু হতে নানা প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে থাকে তাকে স্রাবকারী টিস্যু বলে। স্রাবকারী টিস্যু দুই প্রকার, যথা—(ক) তরুক্ষীয় টিস্যু এবং (খ) গ্রন্থি টিস্যু।

টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র, জীবদেহ

কতকগুলো টিস্যু একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে একই কাজে নিয়োজিত থাকলে তাদের টিস্যুতন্ত্র (tissue system) বলে। যেমন—জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র। একই ধরনের কাজের জন্য কতকগুলো টিস্যু বা টিস্যুতন্ত্র একত্রিত হয়ে গঠন করে অঙ্গ। যেমন—পাতা, মূল, কাণ্ড ইত্যাদি।

একাধিক অঙ্গ মিলিত হয়ে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করলে তাকে বলা হয় অঙ্গতন্ত্র (Organ system)। যেমন—শ্বসন কাজ পরিচালনার জন্য শ্বাসনালী, ফুসফুস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রাণীর শ্বাসতন্ত্র।

একাধিক অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি উন্নত বা জটিল জীবদেহ (Organism) যেমন—আমাদের মানবদেহ, আমগাছের দেহ ইত্যাদি।



চিত্র ৮.১০ : স্রাবকারী টিস্যুর বিভিন্ন কোষ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ফুলের রং লাল, হলুদ ও গোলাপি হয় কারণ, এতে আছে—

- | | |
|------------------|-----------------|
| ক. ক্রোমোপ্রাস্ট | খ. লিউকোপ্রাস্ট |
| গ. ক্রোরোপ্রাস্ট | ঘ. নিউক্লিয়াস |

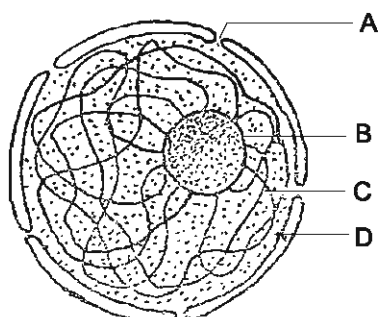
২। জীবকোষের ক্ষেত্রে—

- প্রাণিকোষে শর্করা গ্লাইকোজেন রূপে মজুদ থাকে।
- দেহের আকার আয়তন, রং এবং লিঙ্গ নির্ধারণে ডিএনএ ভূমিকা রাখে।
- মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের জৈবিক কাজে শক্তির যোগান দেয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

চিত্রের আলোকে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩। প্রদর্শিত অঙ্গাণুটিকে প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কারণ—

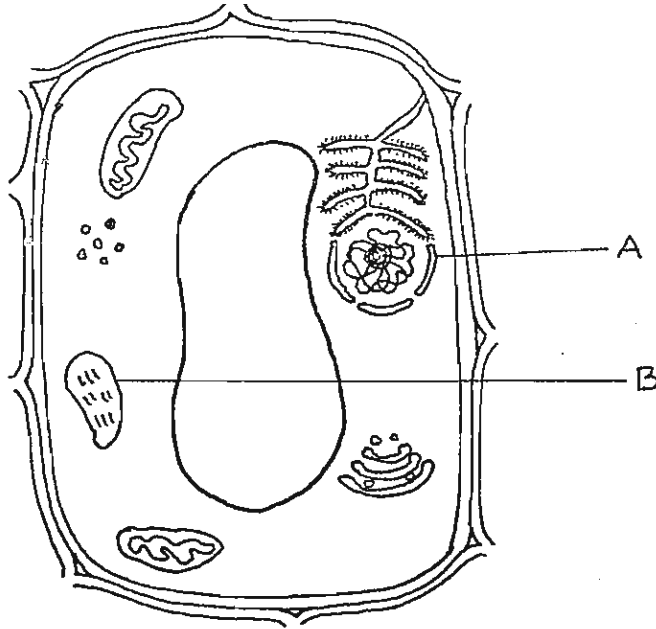
- ক. এটি ছাড়া কোষ বাঁচতে পারে না।
- খ. এটি কোষের প্রায় সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে
- গ. এটি শক্তি উৎপাদনে অংশ নেয়।
- ঘ. এটি বর্ণ কণিকা ধারণ করে।

৪। B ও C অংশের কাজ—

- (i) কোষ বিভাজন ও লিঙ্গ নির্ধারণ
- (ii) দেহের রং নির্ধারণ ও কোষ বিভাজন
- (iii) দেহের রং, আয়তন ও লিঙ্গ নির্ধারণ।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |



সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উপরের চিত্র থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. কোষ কী?
- খ. A চিহ্নিত অঙ্গাণুটির অবস্থান প্রাচীরের কাছাকাছি কেন?
- গ. A চিহ্নিত অঙ্গাণুটি না থাকলে কোষটির কী অবস্থা হতে পারে?
- ঘ. B চিহ্নিত অঙ্গাণুটি এ কোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

উদ্ভিদের বিভিন্নতা

উদ্ভিদ প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ। সর্বোচ্চ পর্বতের শিখর থেকে শুরু করে সাগরতল পর্যন্ত সর্বত্র জন্মায় বহু বিচিত্র উদ্ভিদ। এমনকি জীবদেহের ভেতরেও উদ্ভিদ জন্মায়। এদের আকার, আয়তন এবং প্রকার প্রকৃতিও বিচিত্র। এদের কোনোটি প্রায় ১৮০ মিটার পর্যন্ত লম্বা। আবার কোনো কোনোটি এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না। এ সব উদ্ভিদ মিলেই উদ্ভিদ জগৎ গঠিত। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদ জগৎ অনন্য ভূমিকা পালন করে।

শ্রেণী বা দল বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

বিচিত্র এ উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা একদিকে যেমন উপকারী তেমনি আবার অপকারীও বটে, অবশ্য ক্ষতির তুলনায় উপকারের মাত্রাই বেশি। তবে বিশাল এ উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। অথচ কৃষি, শিল্প বনায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সফল হওয়ার জন্য উদ্ভিদ সম্পদকে কাজে লাগানো অপরিহার্য। কিন্তু এজন্য আমাদের দরকার উদ্ভিদ সম্বন্ধে সুষ্ঠু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান।

চারিত্রিক বিভিন্নতায় পূর্ণ বিচিত্র উদ্ভিদের প্রতিটিকে পৃথকভাবে চেনা ও শনাক্ত করা কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ আমাদের প্রয়োজনেই উদ্ভিদ জগতের সব উদ্ভিদ সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। তাই উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য উদ্ভিদের পরিচিতি সহজে লাভের উপায় হিসেবে উদ্ভিদ জগৎকে নানাভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। শ্রেণী বিন্যাসের ফলে উদ্ভিদ জগতের যে কোনো দলের যে কোনো একটি উদ্ভিদ সম্বন্ধে জানলে ঐ দলের অন্যান্য সকল উদ্ভিদ সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করা যায়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদ জগৎকে বিভিন্ন দলে ভাগ করাকেই বলা হয় দল বিন্যাস বা শ্রেণী বিন্যাস।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন, জীবনচক্র, ক্রমবিকাশ, বাসস্থান, বিস্তার প্রভৃতি এক একটি উদ্ভিদ প্রজাতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ সবার বিবেচনায় এক প্রজাতির সঙ্গে অপর প্রজাতির যেমন অনেক পার্থক্য আছে, তেমনি কোনো কোনো দিক দিয়ে মিলও আছে অনেক। এভাবে মূল, কাণ্ড ও ফুল আছে কি না এর ভিত্তিতে উদ্ভিদ জগৎকে শৈবাল ছত্রাক, মস, ফার্ন ইত্যাদিতে; কাণ্ডের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ; বাসস্থানের ভিত্তিতে মরু উদ্ভিদ, স্থলজ উদ্ভিদ (মেসোফাইট), হ্যালোফাইট, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতিতে এবং জীবনকাল অনুসারে একবর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে বিন্যাসের বিষয়ে আমরা জেনেছি।

এ সবার ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভিদকে জানা এবং অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সুবিধার্থে এখানে উদ্ভিদ জগৎকে নিম্নরূপে দল বিন্যাস করা হয়েছে। উদাহরণসহ প্রত্যেক দলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

আদি উদ্ভিদ বা প্রোটোফাইটা (Protophyta)

প্রোটোফাইটা দলের উদ্ভিদগুলো অকোষীয় বা কোষীয় এবং আণুবীক্ষণিক। এদের দেহে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। এরা প্রধানত দুই ধরনের যথা—ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া।

ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস পৃথিবীর সরলতম ও ক্ষুদ্রতম জীব। এরা এত ছোট যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্য ছাড়া এদের দেখা যায় না। ভাইরাস বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV) এবং টি_২ (T₂) ভাইরাস বা ‘ফাফ’ ভাইরাস অতি পরিচিত।

ভাইরাসের দেহ কোষ দিয়ে গঠিত নয়। এদের দেহে খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, রেচন, শ্বসন, পুষ্টি প্রভৃতি পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা নেই। এদের দেহের বৃদ্ধি হয় না। এরা স্থানান্তরের জন্য অপর বস্তু বা জীবের ওপর নির্ভরশীল। জীবদেহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বেশিরভাগই ভাইরাসে অনুপস্থিত। তবে ভাইরাস জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত এবং উপযুক্ত

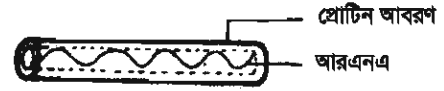
পোষক দেহের অভ্যন্তরে পোষক-দেহের জৈব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। সকল ভাইরাসেই এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই ভাইরাসকে এক প্রকার জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরলতম গঠনের জন্য ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যে যোগসূত্রকারী সেতুবন্ধন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

আকার ও গঠন বৈশিষ্ট্য : ভাইরাস গোলাকার, লম্বা, সূচাকৃতি, ব্যাঙাটির মতো অথবা পাউরুটির আকারের হতে পারে। প্রোটিন দিয়ে গঠিত এদের বাইরের আবরণের মধ্যে নিউক্লিয়িক এসিড DNA অথবা RNA রক্ষিত থাকে।

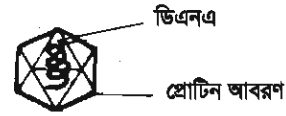
টি_২ (T₂) ফাষ একটি ব্যাঙাচি আকৃতির ভাইরাস। এর একটি মাথা ও একটি লেজ আছে। বাইরের আবরণটি প্রোটিন দিয়ে গঠিত এবং মাথার ভেতরে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড DNA আছে। লেজ ও মাথার সংযোগস্থলে কলারের মতো একটা অংশ, লেজের শেষের দিকে একটি বেসপ্রেট এবং কয়েকটি লম্বা রজ্জুর মতো স্পর্শকতন্তু আছে। এই স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে T₂ ফাষ পোষক ব্যাকটেরিয়ার দেহে আটকে যায়। পরে তার মাথার ভেতরের নিউক্লিয়িক এসিডটুকু লেজের ফাঁপা নলের মধ্য দিয়ে পোষক ব্যাকটেরিয়ার দেহে ঢুকিয়ে দেয়। নিউক্লিয়িক এসিড ব্যাকটেরিয়ার কোষ উপাদান ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই (প্রায় ৩০ মিনিট) অনেকগুলো নতুন ভাইরাস গঠন করে। এগুলো অবশেষে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর গলিয়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই নবগঠিত ভাইরাসগুলো তাদের আশপাশে কোনো উপযুক্ত পোষক ব্যাকটেরিয়া পেলে আবার একই নিয়মে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।



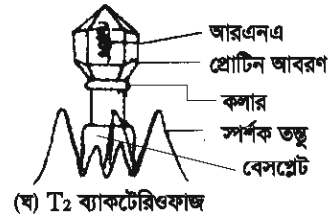
(ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস



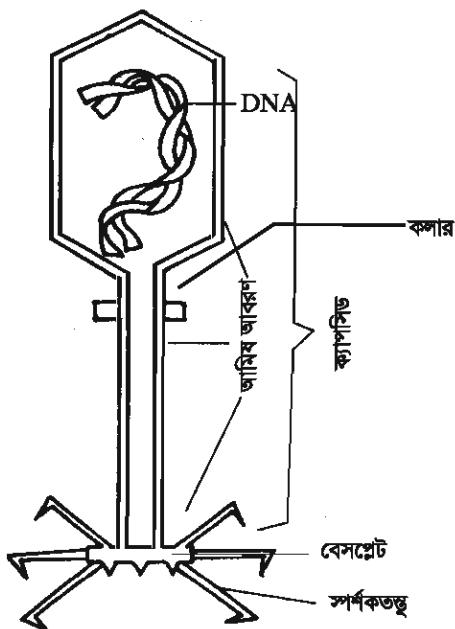
(খ) টোবাকো মোজাইক ভাইরাস



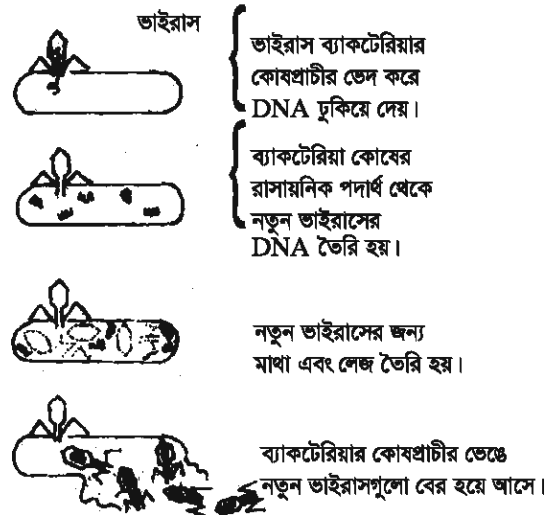
(গ) পোলিও মাইলিটাস ভাইরাস



চিত্র ৯.১ : বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস



চিত্র ৯.২ : T₂ ভাইরাসের গঠন



চিত্র ৯.৩ : T₂ ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ভাইরাস সাধারণত রোগ উৎপাদনকারী জীব হিসেবেই অতি পরিচিত। নিচের তালিকায় এরূপ কতকগুলো ভাইরাস রোগের ও তাদের পোষকের অর্থাৎ জীবের নাম দেওয়া হল :

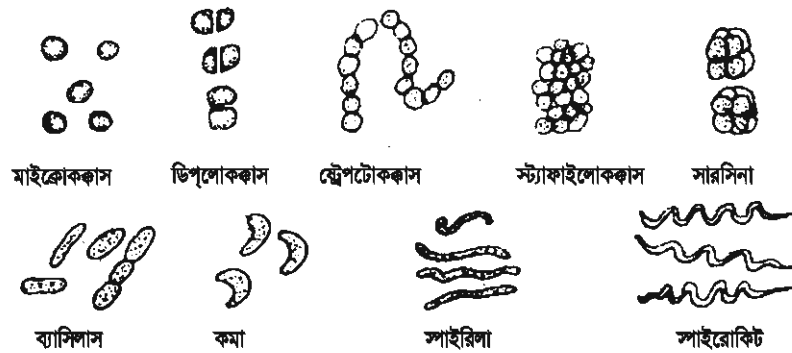
রোগ	পোষক
জলাতজ্বর রোগ	কুকুর
রাণীক্ষেত	মুরগি
মোজাইক রোগ	তামাক, শিম, পাট, পেঁপে ইত্যাদি
ডোয়ার্ফ বা বামন, টুংরো	ধান
ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, হাম, মাম্পস, এইডস (AIDS) ইত্যাদি	মানুষ

এসব রোগের আক্রমণে উদ্ভিদ ও প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরিণামে পশু হতে পারে অথবা মারা যায়। এসব রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে টিকা ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ লাভজনক। হাম ও পোলিও রোগের টিকা তৈরিতে রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুর্বল করে বা মেরে ফেলে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ টিকা দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

ভাইরাস আমাদের সরাসরি উপকারেও আসে। কখনও ভাইরাসকে ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মিক্সোমেটোসিস ভাইরাস ব্যবহার এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাটিতে ভাইরাস অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদির মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের দেহকে মাটিতে সার হিসেবে রূপান্তর ঘটায়।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের তুলনায় বড় হলেও অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক ছোট এবং কোষ বিশিষ্ট। তবে এদেরও খালি চোখে দেখা যায় না, শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক গঠন চিত্রে দেখান হল :



চিত্র ৯.৪ : বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া

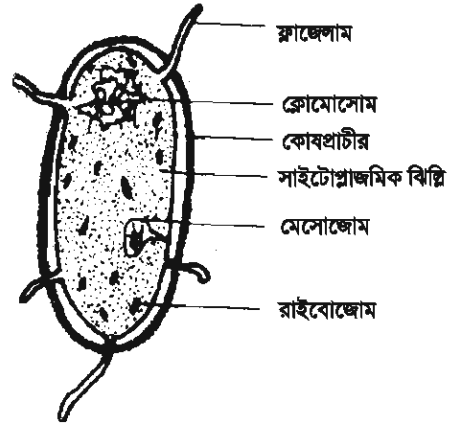
পরীক্ষণ : একখানি কাচের স্লাইডের মাঝখানে এক ফোঁটা দই নিয়ে অপর একটি স্লাইডের মাথা দিয়ে ছড়িয়ে দাও। স্পিরিট ল্যাম্পে একটু তাপ দিয়ে স্লাইডের দই শুকিয়ে নাও। তারপর ‘ক্রিস্টাল ভায়োলেট’ রং দিয়ে রঞ্জিত কর। এখন স্লাইডটিকে শুকিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিয়ে রং ধুয়ে ফেল এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রত্যক্ষ কর। এবার চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া চিনতে চেষ্টা কর।

লিউয়েন হুক ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের তৈরি লেন্সের সাহায্যে সর্বপ্রথম বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি এদের নাম দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র জীব।

এক চা চামচ উর্বর মাটিতে ১০-১২ কোটিরও বেশি ব্যাকটেরিয়া বাস করে। মাটি ছাড়া পানি, কম্পোস্ট, জীবদেহ এবং অস্থায়ীভাবে বায়ুর মধ্যেও অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে।

ব্যাকটেরিয়ার গঠন : ব্যাকটেরিয়া মূলত একটি আদি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এককোষী জীব। এরা প্রধানত গোলাকার, লম্বা বা প্যাঁচানো আকৃতির হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের দেহে ২, ৪, ৮, ১৬ অথবা বহু সংখ্যক কোষ একত্রে নির্দিষ্ট ছকে সজ্জিত থাকে।

ব্যাকটেরিয়া একটি এককোষী জীব হলেও সাধারণ উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের চেয়ে এর গঠন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি তিন স্তর বিশিষ্ট জটিল প্রাচীর দিয়ে এটি আবৃত। এদের সর্ব বাইরের পিচ্ছিল স্তরটিকে স্লাইম লেয়ার বলে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এটি খুব পুরু হয়ে থাকে, তখন একে ক্যাপসুল (Capsule) বলে। মধ্যস্তরটিকে সাধারণ কোষপ্রাচীর এবং সবচেয়ে ভেতরের স্তরটি কোষ-আবরণী বা প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন হিসেবে পরিচিত। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে ফ্লাজেলা (এক বচনে ফ্লাজেলাম) নামক সুতাকৃতির উপাঙ্গ জন্মায়। এগুলো কোষের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে কোষপ্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এদের ইতস্তত সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া চলনে সক্ষম হয়। কোষের ভেতরের অংশটুকু হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট। এদের নিউক্লিয়াস সুসংগঠিত নয়। প্রোটোপ্লাস্ট-এর মধ্যে অন্যান্য উপাঙ্গ। যেমন-ক্রোমোসোম, ভ্যাকুওল, প্লাস্টিড ইত্যাদি এবং চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে।

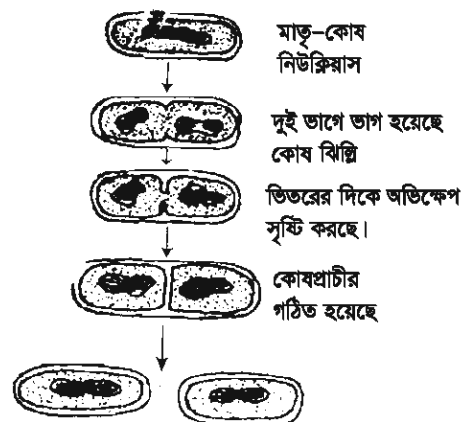


চিত্র ৯.৫ : ব্যাকটেরিয়ার গঠন

ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন : সাধারণত দ্বিভাজন বা ফিশন (Fission) পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে ক্রোমোসোম বিভক্ত হয়। প্রায় একই সঙ্গে কোষের মাঝবরাবর দুপাশ থেকে কোষপ্রাচীর ভেতরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ নবগঠিত প্রাচীরই ব্যাকটেরিয়ার কোষটিকে দুভাগে ভাগ করে। এভাবে উৎপন্ন অপত্য কোষ দুটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়ার আকার লাভ করে এবং পুনরায় দ্বিভাজন শুরু করে। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার দ্বিভাজন প্রক্রিয়া প্রতি ২০ মিনিটে সম্পন্ন হয়। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া জন্মলাভ করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ব্যাকটেরিয়া সাধারণত ক্ষতিকর জীব হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা মানুষ এবং পরিবেশের অনেক উপকারও করে থাকে। এখানে ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি উপকারী ও অপকারী কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল :

ব্যাকটেরিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপকারী কাজের মধ্যে মাটির গুণাগুণ অর্থাৎ উর্বরতা বৃদ্ধি, আবর্জনা পচিয়ে ময়লা নিষ্কাশন, শিল্প উৎপাদনে। যেমন-চামড়া থেকে লোম ছাড়ানো, এলকোহল উৎপাদন, টিকা উৎপাদন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম



চিত্র ৯.৬ : দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি

অর্থকরী ফসল অর্থাৎ পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়ানোতে ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া পাটগাছের মধ্যে ঢুকে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য আঁশকে বাকলের মধ্যে আটকে রাখে সেগুলোকে তরল করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এতে আঁশগুলো আলাদা হয়ে যায়।

ব্যাকটেরিয়া নানারূপ ক্ষতিকর কাজও করে থাকে। এ সবার মধ্যে মানবদেহে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি; গৃহপালিত পশুর দেহে কলেরা ও অন্যান্য রোগ উৎপাদন; ফল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদির পচন ঘটানো এবং মাটিতে আবদ্ধ নাইট্রোজেনকে গ্যাস হিসেবে মুক্ত করে মাটির উর্বরতা হ্রাস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

থ্যালোফাইটা বা সমাজদেহী উদ্ভিদ (Thallophyta)

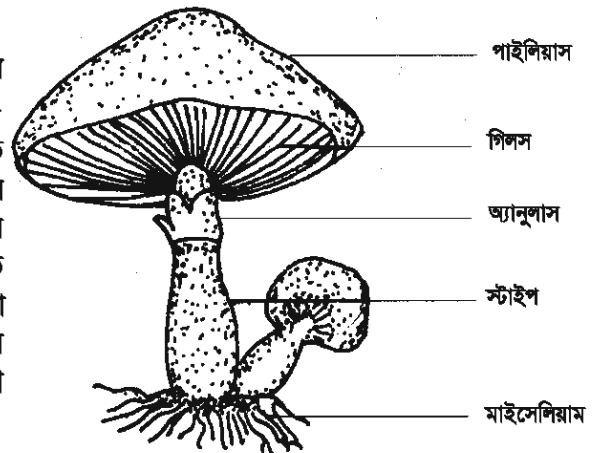
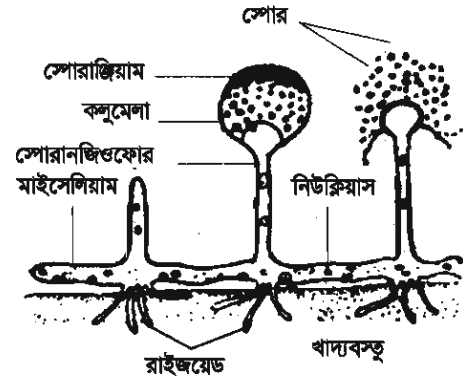
থ্যালোফাইটা দলের উদ্ভিদগুলো এককোষী বা বহুকোষী, ক্লোরোফিল বিশিষ্ট বা ক্লোরোফিলবিহীন, শাখা-প্রশাখায়ুক্ত বা শাখা-প্রশাখাবিহীন হয়ে থাকে। সমাজ দেহী এ সব উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়। এরা প্রধানত দুই ধরনের। যথা-ছত্রাক ও শৈবাল। তবে শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে এক প্রকারের মিথজীবী থ্যালোফাইটা জন্মে, যা লাইকেন (Lichen) হিসেবে পরিচিত।

ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাক সমাজ দেহী, এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না। তাই এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং, এদেরকে খাদ্যের জন্য পচনশীল জৈব পদার্থ বা জীবদেহের তৈরি খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন-মিউকর (রুটির ছাতা), এগারিকাস (ব্যাঙের ছাতা), পাকসিনিয়া (গমের রোগ) প্রভৃতি। ছত্রাক খাদ্যদ্রব্য, কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, গোবর, মাটি ও জীবদেহে জন্মে।

যে সব ছত্রাক পচা জৈব পদার্থ ও খাদ্যদ্রব্যের ওপর জন্মে তারা মৃতজীবী ছত্রাক, যেমন-মিউকর ও এগারিকাস। আর যে সব ছত্রাক জীবদেহে জন্মে তার দেহ থেকে সরাসরি তৈরি খাদ্য শোষণ করে তারা পরজীবী ছত্রাক, যেমন-ফাইটোপথোরা।

এগারিকাস বা ব্যাঙের ছাতা (Agaricus): এগারিকাস একটি মৃতজীবী ছত্রাক। এরা সাধারণত বর্ষাকালে মাঠে-ঘাটে, বাড়ির আঙিনা ও বনজঙ্গলের পচা সঁাতসঁতে মাটিতে জন্মে। এদের দেহের সূক্ষ্ম সুতার জালের মতো মূল অংশ মাটির নিচে চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। এ অংশ হচ্ছে মাইসেলিয়াম। অনুকূল আবহাওয়াতে মাইসেলিয়ামের মাঝে মাঝে প্রথমে ছোট ছোট বলের মতো অংশ জন্মায়। এগুলো পরে মাটির উপরে বৃদ্ধি পেয়ে ছাতার আকারে উন্মুক্ত হয়। ছাতার মতো ঐ অংশই ফ্রুট-বডি। বংশ বৃদ্ধির জন্য এ অংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র স্পোর বা রেণু উৎপন্ন হয়। অনেক দেশে ফ্রুট-বডি উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশেও বর্তমানে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ জাতীয় ছত্রাকের চাষ করা হচ্ছে।



চিত্র ৯.৭ : মিউকর ও এগারিকাস

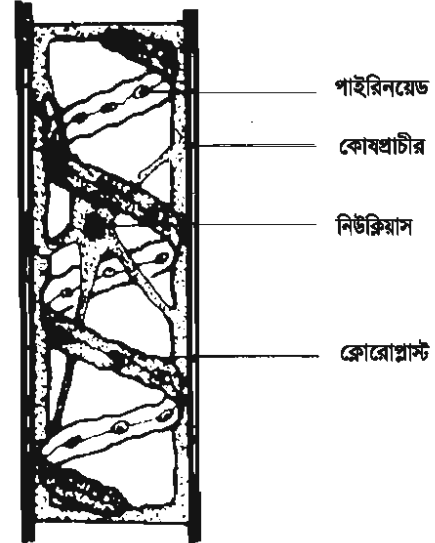
পরীক্ষণ : স্কুল বা বাড়ির আঙিনা থেকে এগারিকাস সংগ্রহ করে তা আতশী কাচের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর। বইয়ের চিত্রের সাথে মিলিয়ে এগারিকাস চিনতে চেষ্টা কর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ছত্রাক আমাদের অনেক উপকার ও অপকার করে। পাউরুটি, পনির প্রভৃতি শিল্পে ছত্রাক ব্যবহৃত হয়। অনেক ছত্রাক থেকে মূল্যবান এন্টিবায়োটিক ওষুধ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ‘পেনিসিলিন’ উল্লেখযোগ্য। ছত্রাক খাদ্যদ্রব্যসহ অনেক নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী নষ্ট করে। এরা মানুষ ও উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। আলুর মড়ক, ধানের বাদামি দাগ রোগ ছত্রাক সংক্রমণের ফলেই হয়। এভাবে ছত্রাক অনেক অর্থকরী ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এছাড়াও ছত্রাক মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর ত্বক, যকৃৎ, ফুসফুস, নাক, কান ও গলা প্রভৃতি অঙ্গের নানা রোগের কারণ হয়ে থাকে।

শৈবাল (Algae)

শৈবাল সমাজদেহী উদ্ভিদ। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে। এরা ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করতে পারে। যেমন-স্পাইরোগাইরা, ক্লোরেলা প্রভৃতি। শৈবাল পানিতে, মাটিতে এবং গাছের কাণ্ডে ও পাতায় জন্মে।

স্পাইরোগাইরা (Spirogyra) : এরা সবুজ বর্ণের সুতার মতো এক ধরনের বহুকোষী শাখাহীন শৈবাল। অনেকগুলো সরু কোষ পর পর যুক্ত হয়ে এদের দেহ তৈরি হয়। প্রতিটি কোষের সর্পিলাকার ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল ও পাইরিনয়েড থাকে। পাইরিনয়েডে স্টার্চ সঞ্চিত থাকে। প্রতিটি কোষে সাইটোপ্লাজমের সুতায় নিউক্লিয়াস বুলানো থাকে। পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা প্রভৃতির পানিতে স্পাইরোগাইরা জন্মায়।



চিত্র ৯.৮ : স্পাইরোগাইরার গঠন

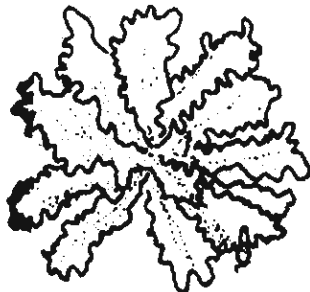
পরীক্ষণ : যে কোনো আবাস জলাশয় থেকে ভাসমান সবুজ কিছু শেওলা পানিসহ একটি বাটিতে সংগ্রহ কর। এবার শেওলার কয়েকটি সুতা কাচের স্লাইডে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ কর। বইয়ের চিত্রের সাথে মিলিয়ে স্পাইরোগাইরা চিনতে চেষ্টা কর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : শৈবাল আমাদের উপকার ও অপকার উভয়ই করে থাকে। অনেক শৈবাল মাছের, গরু-মহিষের ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শৈবাল থেকে আয়োডিন, খাদ্যদ্রব্য, এ্যাগার এবং অন্যান্য আরও অনেক মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়। নীলাভ সবুজ শৈবাল মাটির উর্বরতা বাড়ায়। বাস্তুসংস্থানের খাদ্যচক্রে এককোষী ক্ষুদ্র শৈবাল অন্যতম প্রাথমিক খাদ্য প্রস্তুতকারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদেরকে প্ল্যাঙ্কটন (Plankton) বলে।

শৈবাল পানি দূষণেরও কারণ হয়ে থাকে, যা মানুষ ও পশু-পাখিকে রোগাক্রান্ত করে এবং কোনো কোনো শৈবালের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুও ঘটে। শৈবাল চা ও লিচুগাছের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

লাইকেন (Lichen)

লাইকেন হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশেষ ধরনের মিথস্বীকৃতি উদ্ভিদ। সবুজ শৈবাল খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ছত্রাকের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে এবং ছত্রাক পোষকের দেহ থেকে পানি ও খনিজ লবণ আহরণ করে শৈবালকে সরবরাহ করে। এ প্রক্রিয়াকে মিথোস্ক্রিয়া (Symbiosis) বলে। এ সব উদ্ভিদ সাধারণত বড় বড় গাছের বাকলের ও পাথরের ওপর জন্মায়। গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লাইকেন প্রধানত তিন প্রকার; (১) ক্রাস্টোজ লাইকেন, (২) ফলিওজ লাইকেন এবং (৩) ফ্রুটিকোজ লাইকেন।



ফলিগজ লাইকেন



ছোটকোজ লাইকেন



ক্রাস্টোজ লাইকেন

চিত্র ৯.৯ : বিভিন্ন প্রকার লাইকেন

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : লাইকেন মাটি গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া ওষুধ শিল্প, সুগন্ধি শিল্প, রঞ্জক উৎপাদন ইত্যাদি কাজে লাইকেন ব্যবহৃত হয়।

ভ্রূণধারী উদ্ভিদ বা এমব্রিওফাইটা (Embryophyta)

ভ্রূণই হচ্ছে এসব উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভ্রূণের (Embryo) মাধ্যমে এরা নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। পুং ও স্ত্রী জননকোষের নিষেকের ফলে নিষিক্ত কোষের (Zygote) সৃষ্টি হয়। এ নিষিক্ত কোষ পরে ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। এ দলের উদ্ভিদগুলো থ্যালাফাইটা দলের উদ্ভিদগুলোর চেয়ে উন্নততর। পূর্বে বর্ণিত উদ্ভিদগুলো ছাড়া বাকি সব উদ্ভিদই ভ্রূণধারী।

ক. ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)

এ দলের উদ্ভিদগুলো সমাজ্ঞাদেহী উদ্ভিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। এদের দেহ কাণ্ড ও পাতা বিশিষ্ট হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে কখনও মূল জন্মায় না। মূলের পরিবর্তে চুলের মতো সূক্ষ্ম রাইজয়েড জন্মে। এরা ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে মাটি, জরাজীর্ণ দেয়াল ও ছাদ, ইট, বৃক্ষের মৃত কাণ্ড প্রভৃতির ওপর জন্মে। যেমন-মস।

মস (Moss) : মস-এর দেহ রাইজয়েড, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। এর নরম খাটো কাণ্ডের চারদিকে ছোট ছোট পাতা সর্পিলাকারে জন্মায়। রাইজয়েডসহ পুরো দেহটিকে বলা হয় গ্যামেটোফাইট। পরিপক্ব গ্যামেটোফাইটের মাথায় স্পোরোফাইট তৈরি হয়। স্পোরোফাইটের ক্যাপসুলে স্পোর বা রেণু থাকে, যা থেকে নতুন মস জন্মায়। মস উপযুক্ত পরিবেশে পর্বতের গায়ে সবুজ গালিচার মতো আস্তরণরূপে জন্মে।

পরীক্ষণ : কিছু মস সংগ্রহ করে এদের একটিকে আতশী কাচ অথবা সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে প্রত্যক্ষ কর এবং বইয়ের চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রায়োফাইটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ জাতীয় উদ্ভিদ আর্দ্র পরিবেশে কঠিন পদার্থের ওপর জন্মে মাটির স্তর গঠনে সাহায্য করে, যা পরে অন্যান্য উদ্ভিদের আবির্ভাবে সহায়ক হয় অর্থাৎ এরা উদ্ভিদের ক্রমাগমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো দালান-কোঠার গায়ে ও ছাদে জন্মে তার ক্ষতিসাধন করে।



চিত্র ৯.১০ : মস

খ. টেরিডোফাইটা বা ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ (Pteridophyta)

টেরিডোফাইটা উদ্ভিদগুলো ব্রায়োফাইটা দলের উদ্ভিদগুলোর চেয়েও উন্নত। এদের মূল, কাণ্ড ও পাতা হয়, তবে ফুল হয় না। এরা ছায়াযুক্ত স্থানে ভিজা মাটিতে, জরাজীর্ণ দেয়ালে ও বড় বড় গাছের কাণ্ডের উপর জন্মে। উদাহরণ—ফার্ন বা টেকিশাক।

ফার্ন (Fern): ফার্ন-এর দেহটি মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। তবে কাণ্ডটি রাইজোমে রূপান্তরিত হয় এবং মাটির মধ্যে সমান্তরালভাবে থাকে। এদের পাতা যৌগিক এবং প্রথম অবস্থায় কুকুরের লেজের মতো বাঁকানো থাকে। পাতাগুলো কাণ্ড থেকে গুচ্ছাকারে মাটির ওপর উঠে আসে। পাতা দুটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। ছোট এই অংশকে অণুফলক বলে। পাতার গায়ে বাদামি রঙের আঁশ থাকে। গ্রীষ্মকালে পাতার নিচের পিঠে বৃক্ষাকার সোরাস জন্মে। সোরাসের মধ্যে স্পোর উৎপন্ন হয়, যা থেকে ফার্ন উদ্ভিদ জন্মে। ফার্ন উদ্ভিদ ঝোপঝাড়ের সীতাসেঁতে মাটিতে ও পুরনো দেয়ালে জন্মে।



চিত্র ৯.১১ : ফার্ন

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : টেরিডোফাইটা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সুদৃশ্য অনেক ফার্ন উদ্ভিদকে শোভা বর্ধনের জন্য টবে জন্মানো হয়। এদের কোনো কোনোটি শাকসবজি হিসেবে আমরা খেয়ে থাকি। খনিজ কয়লাকে প্রাচীনকালের বহু টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদের প্রস্তুরীভূত দেহাবশেষ বলে মনে করা হয়। তবে এদের কোনো কোনোটি পুরানো দালানে ও বৃক্ষের কাণ্ডে জন্মে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

গ. সপুষ্পক উদ্ভিদ বা স্পার্মাটোফাইটা (Spermatophyta)

ফুল উৎপাদন সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। এদেরকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—নগ্নবীজী ও গুস্তবীজী।

নগ্নবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperm) : এদের ফুলে ডিম্বাশয় না থাকায় ডিম্বক নগ্ন অবস্থায় থাকে এবং নিষিক্ত হয়ে বীজ উৎপন্ন হয়। এ জাতীয় উদ্ভিদে ফল উৎপন্ন হয় না। তাই বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে না। যেমন—সাইকাস, পাইনাস, গুজা প্রভৃতি উদ্ভিদ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে এ জাতীয় কোনো কোনো উদ্ভিদকে টব, বাগান, পার্ক বা রাস্তার পাশে লাগানো হয়।



সাইকাস



পাইনাস

গুস্তবীজী উদ্ভিদ (Angiosperm) : এদের ফুলের ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় থাকে। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বক নিষিক্ত হয়ে বীজে এবং ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজ ফলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। গুস্তবীজী উদ্ভিদ আবার দু প্রকার, যথা একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ (Monocot) : একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদ গুচ্ছমূলতন্ত্র গঠন করে এবং পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল হয়। যেমন—ধান, ইক্ষু, নারকেল প্রভৃতি উদ্ভিদ।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (Dicot) : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। সাধারণত এরা প্রধান মূলতন্ত্র গঠন করে এবং পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাকার হয়। যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

চিত্র ৯.১২ : নগ্নবীজী উদ্ভিদ



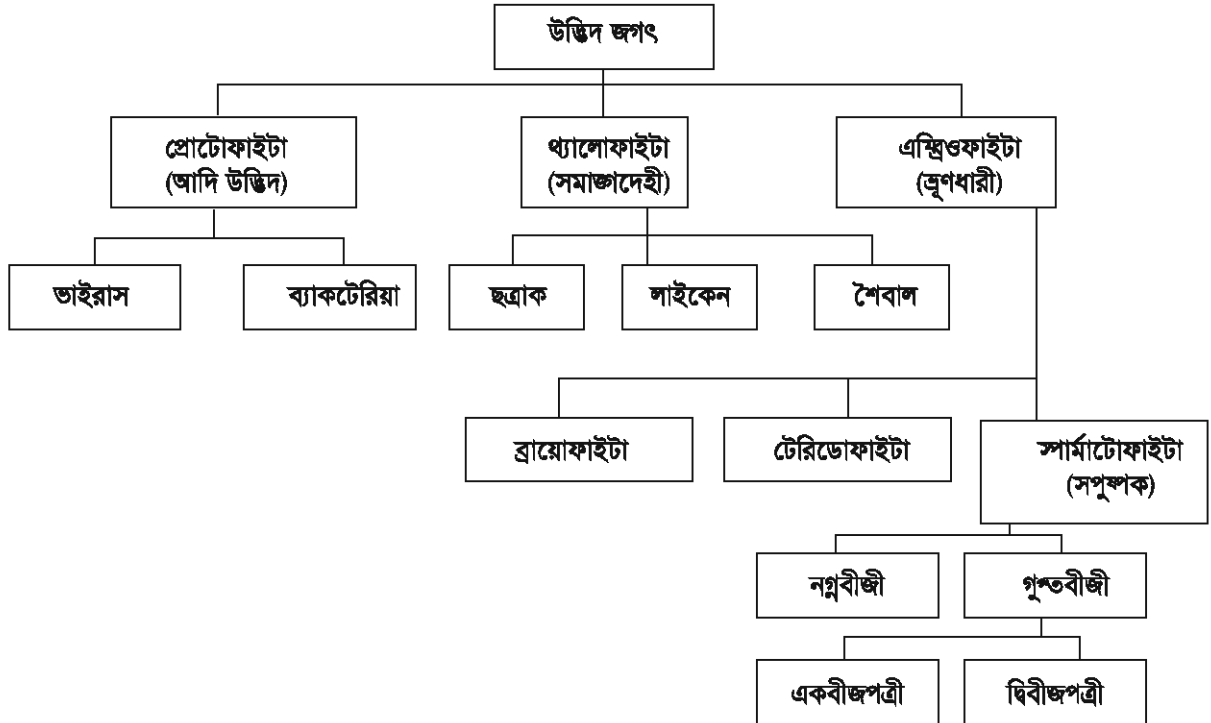
চিত্র ৯.১৩ : গুস্তবীজী উদ্ভিদ

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : মানুষের কাছে ‘সপুষ্পক উদ্ভিদ’ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দৈনন্দিন জীবনের অত্যাৱশ্যকীয় বহু উপাদানই আমরা এ জাতীয় উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি, বিস্কুট, পাউরুটি ইত্যাদি পেয়ে থাকি। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি ফল হিসেবে খেয়ে থাকি। বেগুন, বিজ্ঞা, পটোল, গোলআলু প্রভৃতি সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। তুলা এবং পাট থেকে কাপড় উৎপাদন করা হয়। শাল, গর্জন, কড়ই, সেগুন ইত্যাদি থেকে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। নিম, বাসক, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ইত্যাদি থেকে ঔষুধ তৈরি করা হয়। ফুলের জন্য জবা, গোলাপ, গন্ধরাজ, গাঁদা, ডালিয়া

প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। গেওয়া কাঠ, বাঁশ, সবুজপাট ইত্যাদি থেকে কাগজ উৎপাদন করা হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশ মূলত ঘটেছে সপুষ্পক উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে।

উদ্ভিদ জগতের প্রবাহচিত্র

উপরে বর্ণিত উদ্ভিদ জগতের অধীন বিভিন্ন দলকে নিম্নরূপে প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :



উপরিউক্ত আলোচনা ও পরীক্ষণ থেকে আমরা বিভিন্ন দলের কতকগুলো উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমরা পরিবেশ থেকে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শনাক্ত করে উদ্ভিদ জগতের প্রবাহ-চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দলে সাজাতে পারি। একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন-কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বনায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের ভূমিকা কী এবং আর কী কী সম্ভাবনা আছে আমরা তা বুঝতে ও কাজে লাগাতে পারি।

দশম অধ্যায়

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব

উদ্ভিদের শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের জন্য জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ খাদ্য থেকে সে শক্তি পায়। উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরির মুখ্য উপাদানগুলো। যেমন— পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথা থেকে কীভাবে আহরণ করে; সবুজ পাতায় সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কীভাবে শর্করা খাদ্য তৈরি হয়; পাতায় তৈরি খাদ্য কীভাবে ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে সব কোষে ছড়িয়ে পড়ে; কোষগুলো শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের জন্য কীভাবে শর্করা খাদ্য থেকে জৈব শক্তির যোগান দেয় (সংগ্রহ করে) এবং কীভাবে উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি পায় এসব বিষয়েই এ অধ্যায়ে আমরা জানব।

১। উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদ দেহ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত। তবে এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশই পানি। এসব রাসায়নিক দ্রব্য বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহেই তৈরি হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। যেমন—শর্করা, আমিষ, তেল প্রভৃতি তৈরিতে খনিজ লবণ প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদকে এসব রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাথমিক গঠন উপাদান পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তাই উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে মূলের সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ আহরণ করে থাকে। তবে নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ এদের দেহপৃষ্ঠ অথবা মূলের ন্যায় বিশেষ অঙ্গ দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে।

উদ্ভিদের পুষ্টি (Plant Nutrients)

জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বেশ কিছু খনিজ লবণ আহরণ করে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে। একেই বলা হয় উদ্ভিদের পুষ্টি। আর খনিজ লবণগুলোই হচ্ছে পুষ্টি উপাদান।

পুষ্টির বিভিন্ন উপাদান ও এদের গুরুত্ব : বিভিন্ন উদ্ভিদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য মোট ১৬টি উপাদান অপরিহার্য। এদের মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, লৌহ, ফসফরাস, সালফার (গন্ধক), পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম—এই ১০টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে দরকার হয়। তাই এদেরকে বলা হয় মুখ্য উপাদান। অপর ৬টি উপাদান—ম্যাংগানিজ, তামা, দস্তা, মলিবডেনাম, বোরন ও ক্লোরিন সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়। তাই এদের বলা হয় গৌণ উপাদান।

বিভিন্ন খনিজ লবণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভিদের নানা প্রকার জৈব প্রক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে এক একটি খনিজ উপাদান বিশেষ বিশেষ ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই উপরোক্ত ১৬টি উপাদানের যে কোনো একটির অনুপস্থিতিতে অথবা স্বল্পতার জন্য উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্টির কোনো না কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটে।

নিচের তালিকায় উদ্ভিদের দেহে দশটি পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এদের স্বল্পতা বা অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হল :

উদ্ভিদ দেহে দশটি পুষ্টি উপাদানের কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ :

পুষ্টি উপাদান	কাজ	পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ
১। কার্বন	সকল প্রকার জৈব পদার্থ গঠন।	জৈব পদার্থের গঠন ও সালোকসংশ্লেষণ ব্যাহত হয়।
২। নাইট্রোজেন	ক্লোরোফিল, নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন উপাদান।	ক্লোরোফিল উৎপাদন, কোষ বিভাজন ও কোষের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৩। অক্সিজেন	প্রোটোপ্লাজমসহ সকল জৈব পদার্থ গঠন	প্রোটোপ্লাজম ও অন্যান্য জৈব পদার্থ গঠন এবং শ্বসনের ব্যাঘাত ও গাছের মৃত্যু ঘটে।
৪। হাইড্রোজেন	প্রোটোপ্লাজম ও অন্যান্য জৈব পদার্থ গঠন।	জৈবিক প্রক্রিয়া ও জৈব পদার্থ গঠন ব্যাহত হয়।
৫। ফসফরাস	নিউক্লিয়িক এসিড, কো-এনজাইম ও অন্যান্য জৈব পদার্থ গঠন। মূলের বৃদ্ধি ও ফল পাকা ত্বরান্বিত করে।	পাতা, ফুল ও ফল অপরিণত অবস্থায় বারে পড়ে; পাতা ও ফলে বাদামি দাগ পড়ে। গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।
৬। সালফার (গন্ধক)	প্রোটিন সংশ্লেষণ, ক্লোরোফিল তৈরি কোষ বিভাজন ও ফল উৎপাদন।	প্রোটিন সংশ্লেষণ, কোষ বিভাজন ও ফল উৎপাদন ব্যাহত হয়। পাতা হলদে হয়ে অকালে বারে পড়ে।
৭। পটাসিয়াম	প্রোটোপ্লাজম তৈরি, কোষ বিভাজন এবং ফুল, ফল ও মূল গঠন।	গাছের বৃদ্ধি হ্রাস। ফুল ও ফল বিলম্বে ধরে; পাতার শীর্ষে ও কিনারায় দাগ পড়ে।
৮। ক্যালসিয়াম	কোষপ্রাচীর গঠন, শর্করা-বিপাক ও নাইট্রোজেন বিপাকে বিক্রিয়া নষ্ট করতে সহায়তা করে।	পাতার কিনারায় দাগ পড়ে। পাতা ও কুঁড়ি বিকৃত হয়ে মরে যায়। গাছের ডগা শুকিয়ে যায়।
৯। ম্যাগনেসিয়াম	ক্লোরোফিল গঠনের মূল উপাদান। শর্করা বিপাক, চর্বি সংশ্লেষণ ও শ্বসন ক্রিয়ায় সহায়তা করে।	পাতার সরু শিরা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে ক্লোরোসিস হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পাতা বারে পড়ে।
১০। লৌহ	ক্লোরোফিল গঠনের উপাদান সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে।	ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে পাতায় নকশার সৃষ্টি করে। কখনও সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়।

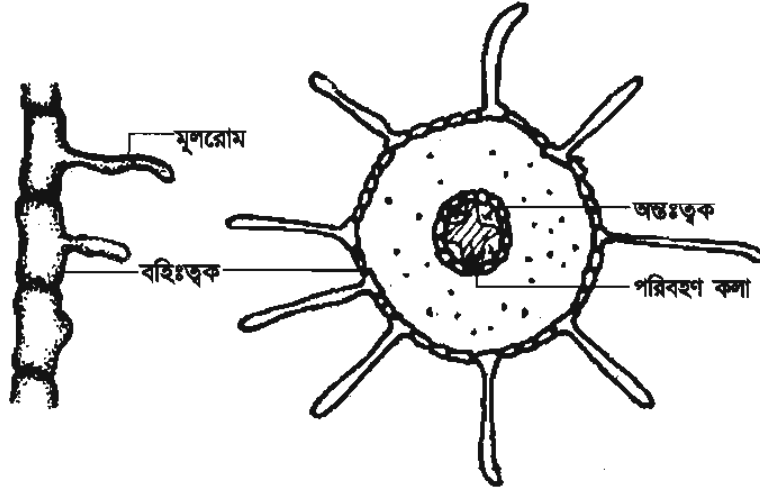
উদ্ভিদের পুষ্টির বিভিন্ন উপাদান বিভিন্নরূপে বায়ুমণ্ডল ও মাটি থেকে সংগৃহীত হয়। পুষ্টির মুখ্য ও গৌণ উপাদানগুলোর মধ্যে শুধু অক্সিজেন ও কার্বন সরাসরি বায়ু থেকে এবং হাইড্রোজেন পানি থেকে পাওয়া যায়। অন্য সব উপাদানই মাটি থেকে মৌলের আয়নরূপে মূলরোম দিয়ে আহরিত হয়। তবে কিছু শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে।

সাধারণত উর্বর মাটি থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পচে মাটিতে মিশে যাওয়ায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আবাদী জমিতে গোবর সার প্রয়োগ করেও উর্বরতা বাড়ানো হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ এবং এদের বর্জ্য পদার্থের পচনের ফলে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান মাটিতে জমা হয়।

উপর্যুপরি চাষাবাদ ও গো-চারণের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পেলে কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমিতে খনিজ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়।

পানি ও খনিজ লবণ শোষণ অঙ্গ

উদ্ভিদের মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ আহরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে বোঝার জন্য মূলের অগ্রভাগের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। কচি মূলের আগার একটু পেছনেই মূলরোম জন্মায়। এই মূলরোমই মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ আহরণ করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মূলের একটি প্রস্থচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, মূলের এক স্তর কোষবিশিষ্ট বহিঃত্বকের এক একটি কোষই বাইরের দিকে লম্বা হয়ে মূলরোমের সৃষ্টি হয়েছে। মূলের কেন্দ্রে অন্তঃত্বকের মধ্যে পরিবহণ টিস্যু রয়েছে যা পানি ও খনিজ লবণ কাড় ও পাতায় পৌঁছে দেয়।



চিত্র ১০.১ : মূলতন্ত্র ও মূলের প্রস্থচ্ছেদ

মূলরোমের কোষ জীবন্ত, এর কোষ প্রাচীর পাতলা এবং কোষ পর্দা অর্ধভেদ্য। অর্ধভেদ্য কোষপর্দা দিয়ে অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি এবং ব্যাপনের মাধ্যমে খনিজ লবণ মূলরোমের ভেতরে প্রবেশ করে।

অভিস্রবণ (Osmosis)

দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে পাশাপাশি পৃথক থাকলে পর্দা ভেদ করে কম ঘন দ্রবণ থেকে অধিক ঘন দ্রবণের দিকে দ্রাবক অণু প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে। দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে অভিস্রবণ একটি ভৌত প্রক্রিয়া। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাজমের নিয়ন্ত্রণে ঘটে বলে অভিস্রবণ একটি জৈব প্রক্রিয়া। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি শোষণ করে। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের পানি শোষণ বোঝার সুবিধার্থে আগে আমাদের অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফুলে ওঠে এবং পানিও মিষ্টি লাগে। আবার ফুলে ওঠা কিশমিশ খুব ঘন চিনির দ্রবণে রাখলে চুপসে যায়। কেন এমন হয়? আসলে অভিস্রবণের ফলেই এমন হয়। কিশমিশের কোষগুলোর ভেতর চিনির ঘন দ্রবণ থাকে। আবার প্রতিটি কোষের বাইরের দিকে কোষপ্রাচীরের নিচে একটি পাতলা অর্ধভেদ্য পর্দা থাকে। কোষের ঘন চিনির দ্রবণে পানির অণুর পরিমাণ কম, চিনির অণুর পরিমাণ বেশি। কিন্তু পাত্রের যে পানিতে কিসমিস রাখা হয় তাতে পানির অণুর পরিমাণ অত্যধিক। তাই পাত্র থেকে পানির অণু কিশমিশের কোষগুলোতে প্রবেশ করে। ফলে কিশমিশ ফুলে ওঠে। ফুলে ওঠা কিশমিশগুলোকে যদি খুব ঘন চিনির দ্রবণে রাখা হয়, তাহলে এরা আবার চুপসে যায়। কারণ, এ ক্ষেত্রে কিশমিশের ভেতরের চিনির দ্রবণের চেয়ে পাত্রের চিনির দ্রবণে পানির অণুর পরিমাণ কম বলে কিশমিশ থেকে পানির অণু পাত্রের পানিতে বের হয়ে আসে। স্কুলে অথবা নিজের বাড়িতে অনায়াসেই অভিস্রবণের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

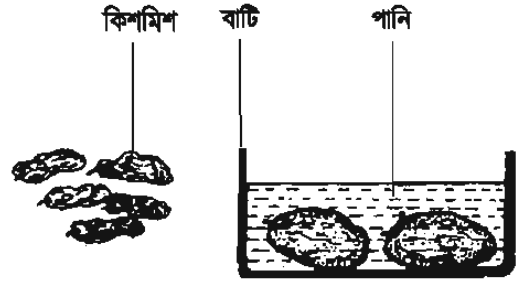
অভিস্রবণের পরীক্ষণ

উপকরণ : কয়েকটি অক্ষত শুকনা কিশমিশ, ছোট কাচের বাটি এবং কিছু পানি।

পদ্ধতি : বাটিতে পরিমাণ মত পানি নাও। এবার কয়েকটি কিশমিশ বাটির পানিতে ছেড়ে দাও।

পর্যবেক্ষণ : দু'ঘণ্টা পর পানিতে নিমজ্জিত কিশমিশগুলোর অবস্থা লক্ষ কর। দেখবে যে কিশমিশগুলো ফুলে উঠেছে।

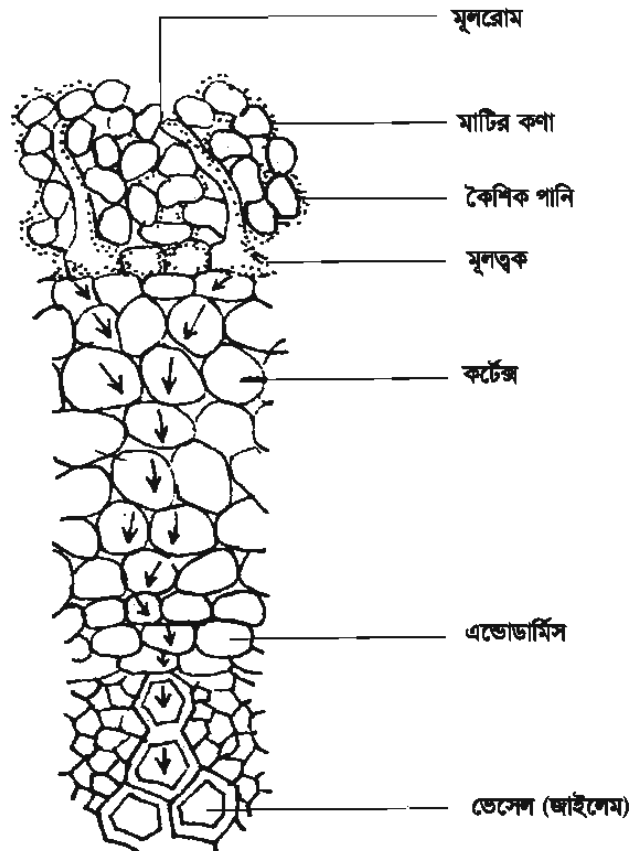
সিদ্ধান্ত : এ থেকে বুঝা যায় যে, অভিস্রবণের ফলে বাটির পানি কিশমিশে প্রবেশ করায় কিশমিশগুলো ফুলে উঠেছে।



চিত্র ১০.২ : কিশমিশের সাহায্যে অভিস্রবণ পরীক্ষণ

পানি শোষণ (Absorption of Water)

উদ্ভিদের অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে পানি গ্রহণ করাকে শোষণ বলে। শোষণও একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ দেহপৃষ্ঠ অথবা মূলের ন্যায় বিশেষ অঙ্গ দিয়ে এবং উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে।



চিত্র ১০.৩ : মূলরোম দিয়ে পানি শোষণ

মূলরোমসহ কোনো একটি উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মূলরোম থেকে শুরু করে মজ্জা পর্যন্ত পরিবহন কোষগুলোর পরস্পর যোগাযোগ আছে। তাছাড়া প্রতিটি সজীব কোষে রসপূর্ণ গহ্বর আছে। উদ্ভিদের কোষরস সাধারণত মাটির রসের চেয়ে বেশি ঘন। কোষরসের ঘনত্ব আবার মূলরোম থেকে মজ্জা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বেশি। তাই অভিস্রবণের ফলে মাটির কম ঘন রস থেকে পানি প্রথমে মূলরোমের অধিক ঘন কোষ রসবিশিষ্ট গহ্বরে প্রবেশ করে। পরে একই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে পানি মূলরোম থেকে অন্তঃস্থ কোষের কোষে পৌঁছায়। মূলজ চাপের ফলে অন্তঃস্থক থেকে পানি জাইলেমে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন অংশে চলে যায়।

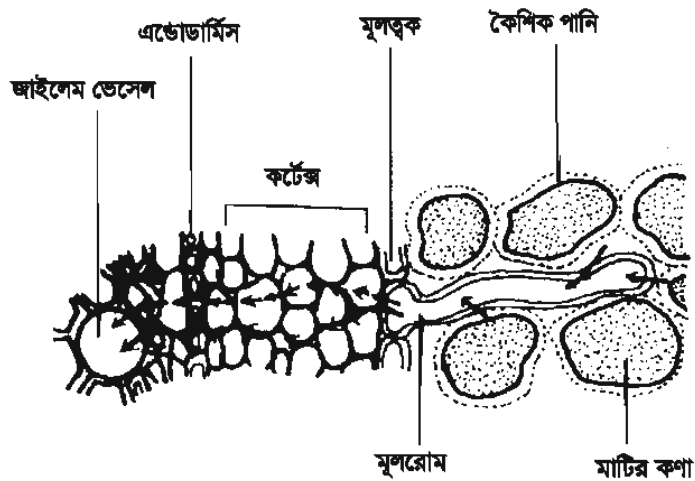
ব্যাপন (Diffusion)

ব্যাপন এক ধরনের ভৌত প্রক্রিয়া যাতে বেশি ঘন এলাকা থেকে পদার্থের অণুগুলো কম ঘন এলাকায় গমন করে। সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত হয়ে ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একটি আবদ্ধ কন্টেনার এক কোণে আতর বা অন্য স্রাব্য দ্রবের শিশি খোলা রাখলে কিছু সময় পরেই ঘরের অন্যান্য কোণ থেকেও স্রাব পাওয়া যাবে। অনুরূপে, এক জগ পানিতে দু এক চামচ লাল সিরাপ ঢাললে নাড়াচাড়া ছাড়াই কিছুক্ষণের মধ্যে জগের সমস্ত পানি হালকা লাল রং ধারণ করে। কেন এমন ঘটে? ব্যাপন প্রক্রিয়ার জন্যই এরূপ ঘটেছে।

অণুগুলোর ঘনত্বের তারতম্যের ওপর ব্যাপনের হার নির্ভর করে। অণুগুলোর মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য বেশি হলে ব্যাপনের হার বেশি হবে। আর ঘনত্বের পার্থক্য কম হলে ব্যাপনের হার কম হবে। আর যে পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে ব্যাপন ঘটেবে তাও যতদূর সম্ভব বড় হওয়া দরকার। উদ্ভিদের কোষ পৃষ্ঠ দিয়ে ব্যাপন ঘটে। বহুকোষী উদ্ভিদের দেহ ছোট ছোট অনেক কোষ দিয়ে গঠিত। এককভাবে এদের পৃষ্ঠ খুব ছোট হলেও সকলের সম্মিলিত আয়তন ব্যাপনের জন্য একটি বৃহৎ পৃষ্ঠ। ব্যাপন প্রক্রিয়াতেই মূল খনিজ লবণ গ্রহণ করে।

খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals)

মাটির রসে প্রচুর পরিমাণ খনিজ লবণ থাকে। সে তুলনায় মূলরোমের কোষে লবণের পরিমাণ কম। সুতরাং নিজে লবণের ঘন এলাকার মাটি থেকে খনিজ লবণ ব্যাপনের মাধ্যমে মূলরোমে প্রবেশ করে। ফলে ১০.৪ নম্বর চিত্রের ১ নম্বর কোষে খনিজ লবণের ঘনত্ব পাশের কোষগুলোর তুলনায় বেড়ে যায়। তাই একই প্রক্রিয়ায় বেশি ঘন এলাকা ১ নম্বর কোষ থেকে খনিজ লবণ ২ নম্বর কোষে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে খনিজ লবণ ক্রমান্বয়ে ২, ৩ ও ৪ নম্বর কোষ হয়ে তার পরের কোষগুলোতে পৌঁছাতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা জাইলেম বাহিকায় পৌঁছে কাণ্ডের উপরের দিকে চলে যায়। এভাবে উদ্ভিদের মূল থেকে শাখা-প্রশাখা ও পাতা পর্যন্ত খনিজ লবণ শোষণের একটি চলমান প্রক্রিয়ার শৃঙ্খল স্থাপিত হয়।



চিত্র ১০.৪ : মূলরোম দিয়ে লবণ শোষণ

প্রস্বেদন ও পরিবহণ

অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে মূলরোমের ভেতরে পানি প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে এক কোষ থেকে অন্য কোষের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে মূলের পরিবহণ টিস্যুতে পৌঁছে। এক পর্যায়ে এ পানি পাতার মাঝখানের মেসোফিল কোষগুলোতে পৌঁছায়। মূল থেকে পানি কীভাবে পাতায় পৌঁছায়, কীভাবে উদ্ভিদ থেকে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয় এবং পাতায় উৎপন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য কীভাবে উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়, তাই আমরা এখানে জানব।

প্রস্বেদন (Transpiration)

স্থলজ উদ্ভিদের মাটির উপরের অংশগুলো থেকে শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে জীবিত কোষের নিয়ন্ত্রণে দেহের বিভিন্ন ছিদ্রপথে বাষ্পাকারে অপ্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলে।

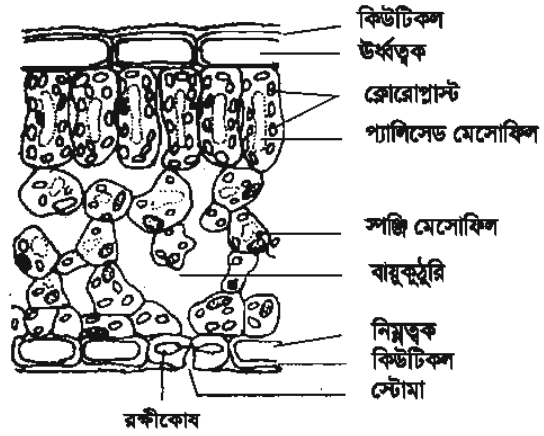
প্রস্বেদন অঙ্গ

পাতার নিম্ন বহিঃত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র পথ আছে। এ সব ছিদ্রকেই পত্ররন্ধ্র বলে। প্রত্যেকটি পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রপথ দুটি বিশেষ ধরনের ত্বকীয় কোষ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ কোষ দুটিই রক্ষীকোষ (Guard Cell) চিত্র ১০.৫। এই পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমেই বেশিরভাগ (৮০-৯০) প্রস্বেদন ঘটে। একে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে। পাতার উর্ধ্ব বহিঃত্বকের উপরে স্বচ্ছ আবরণীকে বলা হয় কিউটিক্যাল। এর মাধ্যমেও কিছু জলীয়বাষ্প নিষ্কাশিত হয়, একে বলা হয় ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন। এছাড়াও অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডের লেন্টিসেলের মাধ্যমেও কিছু প্রস্বেদন হয়। একে বলে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন। কাণ্ডের বহিঃত্বক শোলা বা কর্কে রূপান্তরিত হওয়ার সময় কতকগুলো টিলা কোষের বেটুনীবান্ধ ছিদ্র সৃষ্টি হয়। এগুলো লেন্টিসেল (Lenticel)।

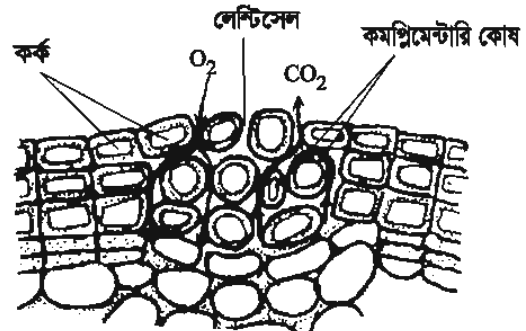
প্রস্বেদন প্রক্রিয়া

পত্ররন্ধ্র সাধারণত দিনের আলোতে খোলা থাকে এবং রাতের অন্ধকারে বন্ধ হয়। পত্ররন্ধ্র খোলা থাকাকালে বায়ু পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র পথে পাতার ভেতরে ঢুকে মেসোফিল স্তরে পৌঁছায়। মেসোফিল স্তরের কোষগুলোর পৃষ্ঠদেশ সবসময়

ভেজা থাকায় এগুলো সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করতে পারে। অপর দিকে তাপের প্রভাবে ও ব্যাপন চাপের পার্থক্যের ফলে এ সব কোষ থেকে পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়ে কোষগুলোর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পত্ররন্ধ্রের নিচের প্রকোষ্ঠে গিয়ে জমা হয় এবং সেখান থেকে পত্ররন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। দেহের ভেতরের কোষ থেকে এভাবে বাষ্পাকারে পানি বের হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় প্রস্বেদন। উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ পানি হারায় তার প্রায় সমপরিমাণ পানি মাটি থেকে আহরণ করে। মেসোফিলের কোষখাটীর থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ায় তা পূরণের জন্য পাতার শিরার জাইলেম থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। এভাবে কাণ্ডের



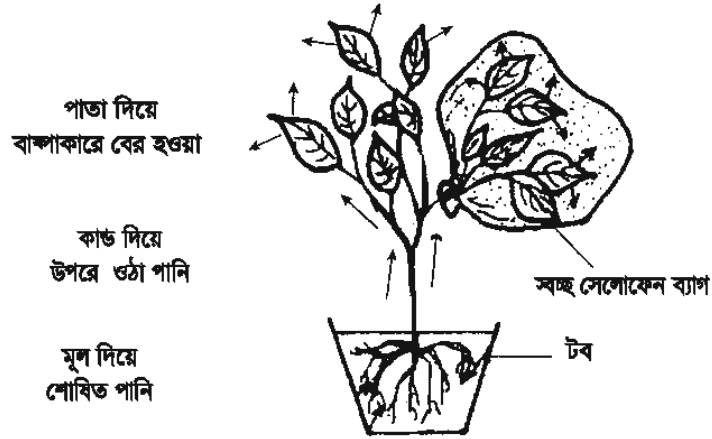
চিত্র ১০.৫: পাতার প্রস্বেদন



চিত্র ১০.৬: কাণ্ডের প্রস্বেদন

জাইলেমের মাধ্যমে পাতার সাথে মূলরোম দিয়ে শোষিত পানির একটি অবিরাম প্রবাহ স্রোত প্রতিষ্ঠিত হয়।

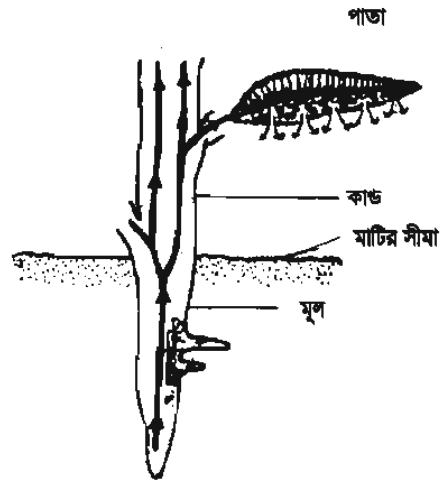
প্রস্বেদনে পানি বাষ্পাকারে নির্গমনের পরীক্ষণ : টবে জন্মানো সুস্থ সবল বেশি পাতাবিশিষ্ট একটি গাছ নির্বাচন কর। টবের মাটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখ। গাছটির শাখা-প্রশাখার একটি অংশ স্বচ্ছ সিলোফেন কাগজের ব্যাগ দিয়ে মুড়ে এমনভাবে বেঁধে রাখ যাতে বাইরের ও ভেতরের বায়ুর যাতায়াত বন্ধ হয়। এর আধঘণ্টা পরে লক্ষ করলে দেখা যাবে স্বচ্ছ সিলোফেন ব্যাগের ভেতরের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি জমেছে। পাতার মেসোফিল কোষগুলোর ভেজা কোষপ্রাচীর থেকে শারীরক্রিয়ার ফলে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হওয়ার জন্যই এরূপ হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ থেকে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়েছে।



চিত্র ১০.৭ : প্রস্বেদনে পানি নির্গমনের পরীক্ষণ

পরিবহণ ব্যবস্থা (Transport System) :

উদ্ভিদ দেহে দ্রবণীয় জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যের স্থানান্তরকে পরিবহণ বলে। এই পরিবহণের জন্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে বিশেষ ধরনের টিস্যুর বিন্যাস রয়েছে তা-ই পরিবহণ তন্ত্র বা পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। কাণ্ডের জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ। যেমন-মূল থেকে পাতায় পৌঁছায়, তেমনি পাতা থেকে সালোকসংশ্লেষণে তৈরি শর্করা খাদ্য পানির সঙ্গে কাণ্ডের ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। রসের এই উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী পরিবহণ প্রক্রিয়া বুঝতে হলে মূল, কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে সূষ্ঠা ধারণা থাকা প্রয়োজন।



চিত্র ১০.৮ : মূল ও কাণ্ডের পরিবহণ টিস্যুর সঙ্গে পাতার পরিবহণ টিস্যুর সংযোগ

পরিবহণ টিস্যু (Vascular tissue)

মূলের কেন্দ্রচক্রে, কাণ্ডের পরিবহণ বলয়ে এবং পাতার শিরায় জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র থাকে। এতে জাইলেম বাহিকাতন্ত্রগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে সরু নলের আকারে মূল, কাণ্ড ও পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। তবে জাইলেম বাহিকাগুলো মৃত। ফ্লোয়েম টিস্যু জাইলেম টিস্যুর চারপাশে সজ্জিত থাকে। এদের সীত টিউবগুলো

পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জাইলেমের অনুরূপ নল তৈরি করে। ফ্লোয়েম টিস্যুগুলো জীবন্ত। জাইলেম নলের মাধ্যমে মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। ফ্লোয়েম নলের মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্যদ্রব্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে।

রস আরোহণ (Ascent of Sap)

মূল থেকে উপরের দিকে কাণ্ড, পাতা ও অন্যান্য অংশে পানির আরোহণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় রস আরোহণ। মূল থেকে পানি কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে উপরের দিকে ওঠে ও পাতা পর্যন্ত পৌঁছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেননি। অনেক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অভিস্রবণ, জাইলেমের কৈশিকতা, মূলজ চাপ প্রভৃতিকে রস আরোহণের কারণ বলে উল্লেখ করলেও এগুলো পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

রস আরোহণ বিষয়ে সাধারণ ধারণা হচ্ছে, অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে মূলরোম মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পরে এক কোষ থেকে আর এক কোষে পর্যায়ক্রমে অভিস্রবণের ফলে পানি মূলরোম থেকে অন্তঃস্থ কোষগুলোতে গিয়ে পৌঁছে। অন্তঃস্থ কোষগুলো পানিকে জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করায় একে মূলজ চাপ বলে। পাতা থেকে প্রস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি বেরিয়ে যাওয়ায় কৈশিক নালীরূপ জাইলেমে পানির ঘাটতি সৃষ্টি করে এর ভেতর দিয়ে পানিকে উপরে ওঠতে সাহায্য করে। পানির সঙ্গে মূলরোমের সাহায্যে আহরিত খনিজ লবণও কাণ্ড বেয়ে উপরে ওঠে যায়।

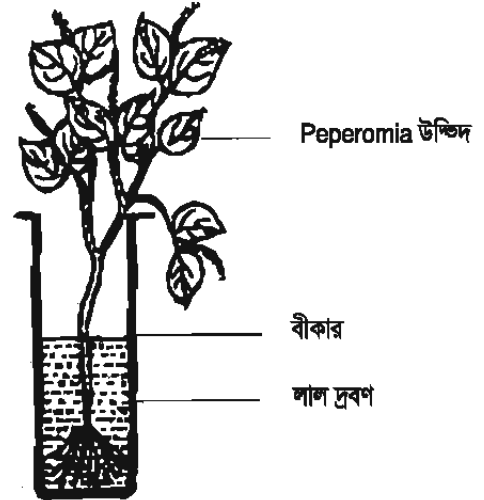
Peperomia উদ্ভিদের সাহায্যে জাইলেম টিস্যুর রস

আরোহণের পরীক্ষণ : উদ্ভিদের কাণ্ডের জাইলেম টিস্যুর যে মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পাতায় পরিবহণ করে তা খুব সাধারণ একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখানো যায়। একটি সতেজ Peperomia উদ্ভিদ খুব সাবধানে মূলসহ মাটি খুঁড়ে তুলে নাও। উদ্ভিদের মূলের অংশটুকু একটা পাত্রে পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে আলগা মাটি মূল থেকে পড়ে যাবে। Peperomia উদ্ভিদ স্বচ্ছ এবং হালকা সবুজ রং বিশিষ্ট।

এবার একটি বীকার বা কাচের গ্লাসের পানিতে দুই ফোঁটা লাল কালি গুলে নিয়ে তার মধ্যে উদ্ভিদটির মূল ডুবিয়ে রাখ। উদ্ভিদটির এখনকার রং লক্ষ কর। আধঘণ্টা পরে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উদ্ভিদটির কাণ্ড এবং পাতার রং লাল হয়ে গেছে। কারণ মূল পাত্রে লাল পানি শোষণ করে কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাতায় পৌঁছে দিয়েছে। এখন কাণ্ডের একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে যে জাইলেম-বাহিকাগুলো লাল বর্ণ ধারণ করেছে, কারণ এতে লাল পানি রয়েছে।

খাদ্য পরিবহণ (Transport of Food)

উদ্ভিদের পাতার ও কচি কাণ্ডের সবুজ কোষে প্রস্তুতকৃত শর্করা খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তরকে খাদ্য পরিবহণ বলে। উদ্ভিদের জীবন ধারণ, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। সালোকসংশ্লেষণে পাতায় তৈরি শর্করা খাদ্যকে ফ্লোয়েম টিস্যু উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়। ফ্লোয়েমের জীবিত কোষগুলো খাদ্য পরিবহণের সঙ্গে জড়িত। এ কারণে খাদ্য পরিবহণ একটি সজীব ও সক্রিয় প্রক্রিয়া, যা শুধু জীবিত উদ্ভিদেই দেখা যায়।

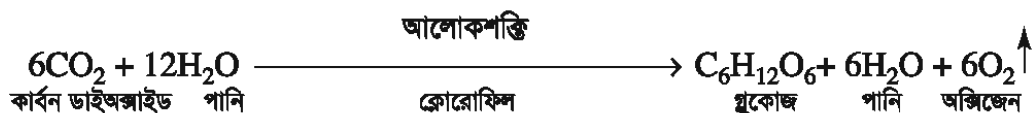


চিত্র ১০.৯ : Peperomia উদ্ভিদের সাহায্যে রস আরোহণের পরীক্ষণ

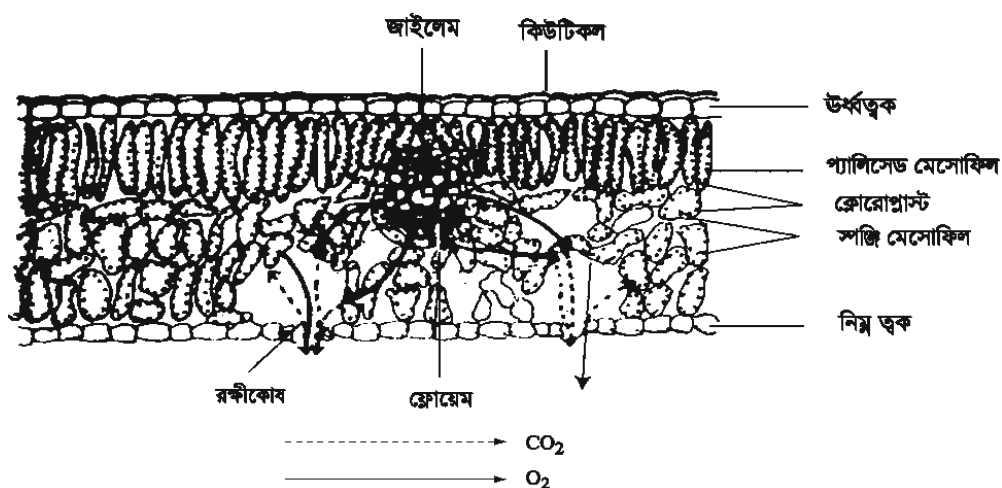
প্রস্রবদনের সাথে কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রস্রবদনের মাধ্যমে সাধারণত যে পরিমাণ পানি বের হয়ে যায়, গাছ মাটি থেকে প্রায় তার সমপরিমাণ পানি শোষণ করে। অনবরত প্রস্রবদনের ফলে এভাবে মাটিতে পানির পরিমাণ কমেতে থাকে। গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণতার কারণে এ অবস্থা আরও প্রকট হয়। এ অবস্থায় পানি সেচ অথবা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটিতে পানির অভাব পূরণ না হলে গাছ শুকিয়ে মরে যায়। এ দুটি প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর ফসল উৎপাদনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এ জন্যে কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জীব দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা আমরা প্রধানত শর্করা খাদ্য থেকে পাই, যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। প্রাণী জগতের শর্করা খাদ্যের প্রাথমিক উৎস সবুজ উদ্ভিদ। বিভিন্ন প্রাণী খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালের মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে শর্করা খাদ্য পেয়ে থাকে। প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে শর্করা খাদ্য তৈরি করে তা আমরা এ অংশে জানব।

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ক্লোরোকিলের সাহায্যে আলোকশক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সমন্বয়ে শর্করা (গ্লুকোজ) জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন হিসাবে অক্সিজেন ত্যাগ করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। এ প্রক্রিয়াটিকে নিচের সাধারণ রাসায়নিক সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে :



সালোকসংশ্লেষণে খাদ্য উৎপাদনের বেশিরভাগই সবুজ পাতাতে ঘটে। তাই পাতাকে শর্করা উৎপাদনের প্রাকৃতিক কারখানা বলা হয়। কচি সবুজ কাণ্ডেও এভাবে খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়াটি বুঝার জন্য পাতার অভ্যন্তরীণ



চিত্র ১০.১০: পাতার প্রস্থচ্ছেদ

গঠন সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা থাকা অত্যাৱশ্যক। এখানে শুধু সালোকসংশ্লেষণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কোষগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। একটি পাতার প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, এটা অনেকগুলো কোষস্তরের সমন্বয়ে গঠিত। একেবারে উপরের কোষস্তরটি হচ্ছে উর্ধ্ব বহিঃত্বক। এ কোষস্তর থেকে মোমজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়ে বহিঃত্বকের উপরে একটি আবরণের সৃষ্টি করে যা কোষ থেকে পানি নিরুদন (Dehydration) রোধ করে। মাঝের স্তরের কোষগুলোকে একত্রে মেসোফিল স্তর বলে। মেসোফিল স্তর আবার দুটি স্তরে বিভক্ত। যেমন— (১) প্যালিসেড মেসোফিল এবং (২) স্পঞ্জি মেসোফিল। এ উভয় স্তরই সরল প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে তৈরি। প্যালিসেড কোষগুলোতে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এবং এ স্তরেই সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার কোষগুলো অত্যন্ত টিলাভাবে সাজানো, তাই এদের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গাগুলো দিয়ে বায়ু চলাচল করার ফলে তা থেকে পাতার কোষগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করতে পারে এবং সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন অক্সিজেন পাতা থেকে বের করে দিতে পারে। নিম্নবহিঃত্বক পাতার নিচের দিকের বাইরের স্তর। এ স্তরেই সাধারণত পত্ররন্ধ্র (Stomata) থাকে। পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়েই বায়ু পাতার ভেতরের কোষগুলোর কাছে পৌঁছায়। দিনে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানোর জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে, ফলে এর মাধ্যমে পাতায় বায়ু প্রবেশ করতে পারে। রাতে সালোকসংশ্লেষণ না হওয়ায় পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুটি পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ষীকোষে ক্লোরোফিল থাকার জন্য দিনে এগুলোতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে এবং এর ফলেই পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

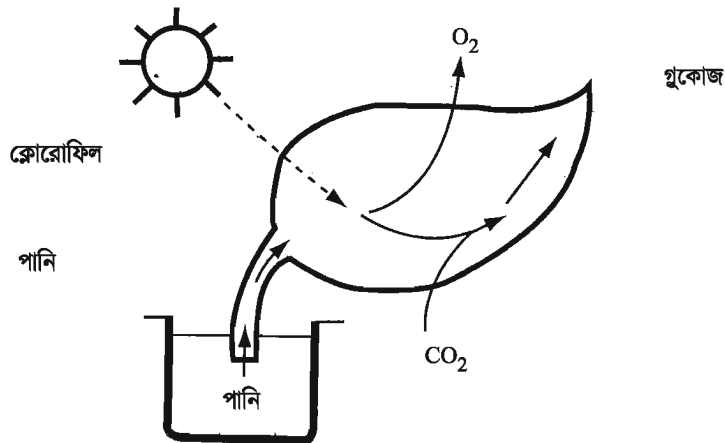
সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যার অনেকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে শর্করা উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়াকে প্রধানত দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা— আলোক পর্যায় ও অন্ধকার পর্যায়।

আলোক পর্যায় (Light Reaction) : আলোক পর্যায়ে ক্লোরোফিল আলোকশক্তিকে গ্রহণ করে ও তা কাজে লাগিয়ে পানির অণুকে ভেঙে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে। অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে বের হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। হাইড্রোজেন সালোকসংশ্লেষণের পরবর্তী অন্যান্য বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

অন্ধকার পর্যায় (Dark Reaction) : অন্ধকার পর্যায়ে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন হাইড্রোজেন অনেকগুলো ধারাবাহিক জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সরল শর্করা উৎপন্ন করে। এসব শর্করা পরে উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার জটিল শর্করায় রূপান্তরিত হয়। এ রাসায়নিক বিক্রিয়া দিনে ঘটলেও এর জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না।

উদ্ভিদের দেহে সঞ্চয়ের জন্য সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন শর্করা অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিবর্তিত হয়।



চিত্র ১০.১১ : সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায় ও আলোক পর্যায়

সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস : সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত পানি থেকেই অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নয়। অক্সিজেনের রেডিও আইসোটোপ (Isotope) দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষণের পরীক্ষণ

(১) সালোকসংশ্লেষণে শ্বেতসার উৎপন্ন হওয়ার পরীক্ষণ

উপকরণ : একটি সতেজ পাতা, স্পিরিট ল্যাম্প, মেথিলেটেড স্পিরিট, আয়োডিন, বীকার ইত্যাদি।

পদ্ধতি : সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত একটি পাতা নরম না হওয়া পর্যন্ত পানিতে সিঁধ কর। তারপর পাতাটিকে মেথিলেটেড স্পিরিটে সিঁধ কর যাতে সব ক্লোরোফিল বের হয়ে আসে। পাতা সিঁধ করার সময় স্পিরিটে যাতে আগুন ধরতে না পারে, তাই এ কাজটি পানির ‘বাথে’ রেখে করতে হবে। এভাবে সিঁধ পাতাটি ভাল করে পানিতে ধুয়ে ফেলে পাতলা আয়োডিন দ্রবণে ডুবাত।

ফলাফল : দেখা যাবে পাতাটি কালচে রং ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত : সালোকসংশ্লেষণের ফলে পাতায় শ্বেতসার উৎপন্ন হয়েছে।

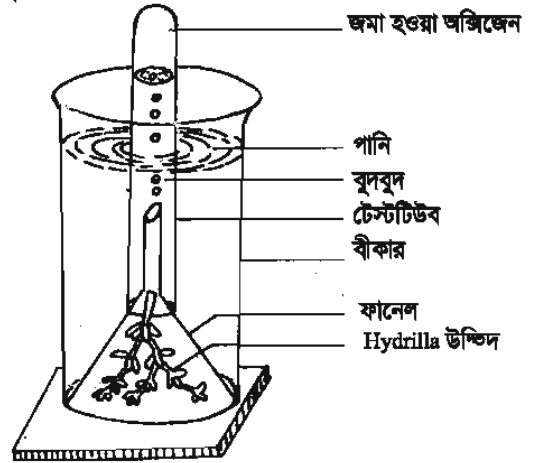
(২) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমনের পরীক্ষণ

উপকরণ : একটি বীকার, টেস্টটিউব, কাচের ফানেল, কিছু পানি এবং কয়েকটি ছোট জলজ আগাছা। যেমন—হাইড্রিলা (Hydrilla)

পদ্ধতি : বইয়ের চিত্রের অনুরূপে উপকরণগুলো স্থাপন করে আলোতে রাখ। টেস্টটিউবে গ্যাস জমে পানি নেমে যেতে থাকবে। টেস্টটিউবের ৪-৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ স্থান খালি হলে এটাকে সতর্কতার সাথে সরিয়ে নিয়ে শিখাইন জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে গ্যাসটিকে পরীক্ষা কর।

ফলাফল : শিখাইন জ্বলন্ত কাঠিটি দগ করে জ্বলে ওঠে।

সিদ্ধান্ত : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হয়।



চিত্র ১০.১২ : সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমনের পরীক্ষণ

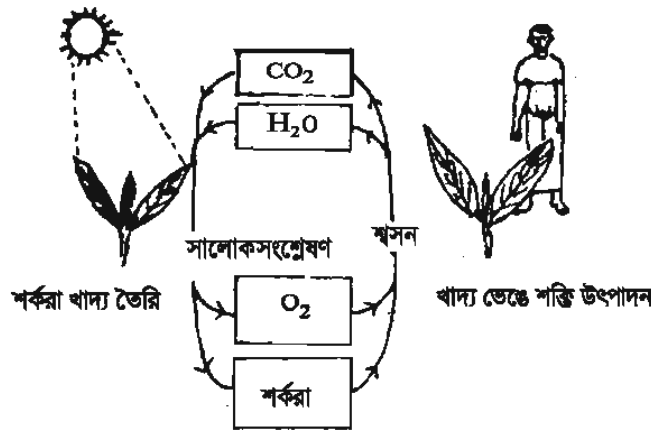
সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস সূর্য। জীব বিভিন্ন জৈবিক কাজকর্মে সূর্যের শক্তিতেই ব্যবহার করে। তবে সূর্যের আলোকশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না, একে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হয়। পৃথিবীতে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই সূর্যের আলোকশক্তিকে ব্যবহারোপযোগী রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করতে সক্ষম। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তির এই রূপান্তর ঘটে। সবুজ উদ্ভিদের তৈরি শর্করা খাদ্যে সূর্যের আলোকশক্তিই রাসায়নিক শক্তিরূপে জমা থাকে। জীবদেহে শ্বসনের সময় এই শর্করা খাদ্য ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়, যা জীব তার বিভিন্ন জৈবিক কাজে ব্যবহার করে।

বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। জীব শ্বসনে অক্সিজেন ব্যবহার করে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন করে, যা জৈবিক কাজে লাগে। শ্বসনের উপজাত হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিতে যদি এককভাবে শুধু জীবদের শ্বসন কাজ চলতে থাকত তাহলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি হত যে জীবদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত। সবুজ উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়

অক্সিজেন তৈরি করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত বজায় রাখছে। এ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, মানুষের জন্য উদ্ভিদরাজি কত গুরুত্বপূর্ণ। সবুজ উদ্ভিদ প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী। কাজেই সালোকসংশ্লেষণে শর্করা তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বেশি পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যাবে। এতে এদের উৎপাদন বাড়বে, যা বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যে পরিমাণ সূর্যালোক পৌঁছে, ক্ষেত্রবিশেষে তার মাত্র ১-২% সালোকসংশ্লেষণে শর্করা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই উদ্ভিদের জন্য প্রচুর আলোকশক্তি রয়েছে যা গ্রহণ করে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে বেশি করে শর্করা তৈরি করা সম্ভব।



চিত্র ১০.১৩ : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য

উদ্ভিদের শ্বসন (Plant Respiration) : উদ্ভিদ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মতো চলাফেরা না করলেও এর শক্তির প্রয়োজন হয়। কেননা এর প্রতিটি সজীব কোষে সংঘটিত নানা ধরনের রাসায়নিক ও ভৌত কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। আবার উদ্ভিদ আজীবন বাড়তে থাকায় দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ তৈরির প্রয়োজন হয়। নতুন কোষ তৈরির জন্য কোষের বিভিন্ন উপাদান, যেমন—সেলুলোজ, প্রোটিন, নিউক্লিয়িক এসিড ইত্যাদি নতুন করে তৈরি করতে হয়। এসব তৈরির কাজে শক্তির ব্যবহার হয়। পুরাতন কোষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেও শক্তি লাগে। বংশ বিস্তারের জন্য ফুল এবং বীজ উৎপাদনেও শক্তি লাগে। এমনকি সালোকসংশ্লেষণে তৈরি শর্করা খাদ্য দেহের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতেও শক্তির প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ কীভাবে এসব শক্তি শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য থেকে পেয়ে থাকে তাই আমরা এখানে জানব।

শ্বসন (Respiration)

সজীব কোষে জৈব খাদ্য (শর্করা, আমিষ ইত্যাদি) উৎসেচকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাহায্যে জারণের মাধ্যমে ভেঙে শক্তি নির্গত হওয়া এবং উপজাত, হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলে। শ্বসনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা জীবের শক্তি ব্যয়কারী কাজে ব্যবহৃত হয়।

শ্বসন অঙ্গ

উদ্ভিদের প্রতিটি জীবন্ত কোষেই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা শ্বসন কাজ চলে থাকে। কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বসন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। তবে কোষীয় মাইটোকন্ড্রিয়াই শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ।

শ্বসনিক বস্তু

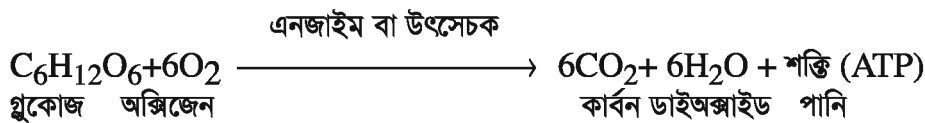
শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক বস্তুসমূহ জারিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয় সে সব বস্তুকে শ্বসনিক বস্তু বলে। শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং জৈবিক এসিডসমূহ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শ্বসনের প্রকারভেদ

শ্বসন প্রধানত দুই প্রকার, যেমন— সর্বাঙ্গ শ্বসন ও অব্যবস্থিত শ্বসন। বায়ুস্থ মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বসন হয় তাকে সর্বাঙ্গ শ্বসন বলে। আর যে শ্বসন মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই ঘটে তাকে অব্যবস্থিত শ্বসন বলে। অব্যবস্থিত শ্বসনে সর্বাঙ্গ শ্বসনের তুলনায় কম শক্তি উৎপন্ন হয়।

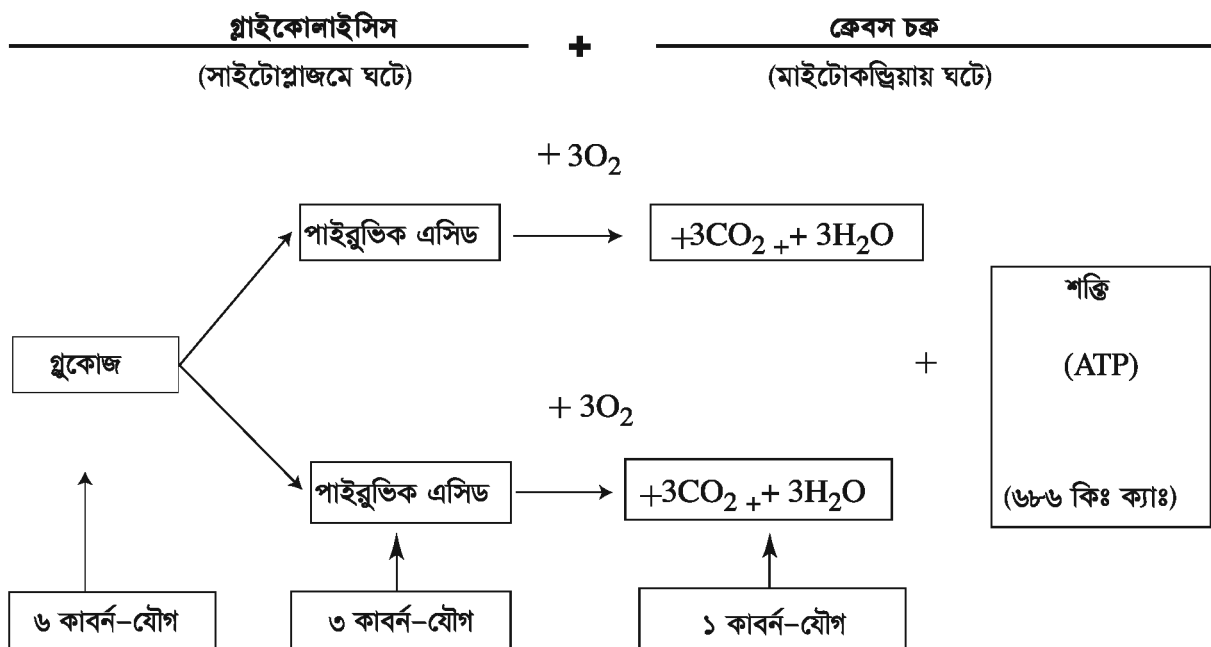
সর্বাঙ্গ শ্বসন (Aerobic Respiration)

শ্বসন বলতে সাধারণত সর্বাঙ্গ শ্বসনকেই বুঝায়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এটি স্বাভাবিক শ্বসন। সর্বাঙ্গ শ্বসনের ক্ষেত্রে বায়ুর অক্সিজেন ব্যাপনের মাধ্যমে কোষে পৌঁছে পানিতে দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত এ অক্সিজেন শ্বসনিক বস্তুতে সম্পূর্ণ জারিত করে এবং অধিক পরিমাণে শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে। গ্লুকোজ যদি শ্বসনিক বস্তু হয় তবে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :



গ্লুকোজ এক ধরনের উচ্চশক্তিসম্পন্ন যৌগ। ১৮০ গ্রাম গ্লুকোজ (গ্রাম আণবিক ওজন বা মোল) সম্পূর্ণ জারিত হয়ে ২৮৩০ কিলো জুল (৬৮৬ কিলো ক্যালরি) শক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্বসনের জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনেকগুলো ধারাবাহিক ধাপে ঘটে, যার প্রতিটি এক একটি উৎসেচক বা এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে পুরো শ্বসন প্রক্রিয়াটি প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, যথা—গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) এবং ক্রেবস চক্র (Krebs Cycle)। এ দুটি পর্যায়ের প্রথমটিতে এক অণু গ্লুকোজ (৬টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট শর্করা) ভেঙে ২ অণু পাইরুভিক এসিড (৩টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট যৌগ) তৈরি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ কার্বনের প্রতিটি পাইরুভিক এসিড কার্বন ডাইঅক্সাইডের ৩টি অণুতে পরিণত হয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গ শ্বসনের প্রতি অণু গ্লুকোজ থেকে ৬ অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া এতে ৬ অণু পানি এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ জৈব শক্তি (ATP) ও তাপ উৎপন্ন হয়।

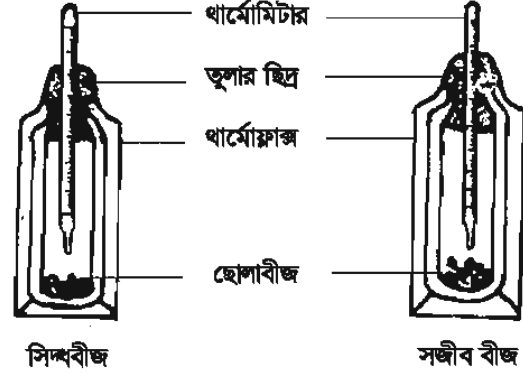


চিত্র ১০.১৪ : সর্বাঙ্গ শ্বসনে গ্লুকোজের জারণ

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়টি গ্লাইকোলাইসিস এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি ক্রেবস চক্র হিসেবে পরিচিত। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং ক্রেবস চক্র মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে। শ্বসনে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (ATP) নামক কতকগুলো শক্তিবাহী যৌগ উৎপন্ন হয়, যা কোষের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

সবাত শ্বসনের পরীক্ষণ

এ পরীক্ষণের জন্য ২০০টি ভাল অঙ্কুরিত ছোলাবীজ বেছে নাও। ১০০টি আলাদা করে নিয়ে সিঁধ করে নাও যাতে বীজের ভূণ মরে যায় এবং শ্বসন সংঘটিত না হয়। সিঁধ বীজগুলো ঠাণ্ডা হলে পরে দুটি থার্মোস্ফাজের একটিতে ১০০টি সিঁধ করা বীজ এবং অপরটিতে ১০০টি সতেজ বীজ ভরে স্ফাজের মুখ তুলার ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দাও। তুলার ছিপির মধ্য দিয়ে থার্মোমিটার স্ফাজের ভেতরে ঢুকাও। স্ফাজ দুটিকে ৪-৫ দিন একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দাও। প্রতিদিন এর উত্তাপ পর্যবেক্ষণ কর।



চিত্র ১০.১৫ : অঙ্কুরিত ছোলাবীজের সবাত শ্বসন

যে স্ফাজটিতে সিঁধ করা বীজ রয়েছে সেই স্ফাজের থার্মোমিটারে শুধু ঐ দিনের তাপমাত্রা দেখা যাবে। কিন্তু যে স্ফাজে অঙ্কুরিত বীজ রয়েছে তার তাপমাত্রা ঐ দিনের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অঙ্কুরিত বীজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে তাপ উৎপন্ন করে।

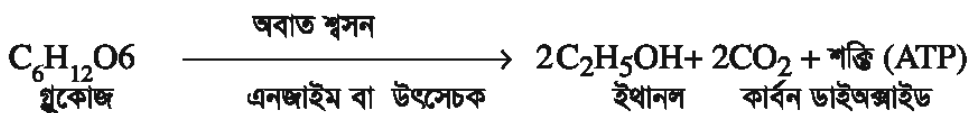
অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration)

এটি মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া খাদ্যদ্রব্য থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যগুলো পুরোপুরি না ভেঙে আংশিকভাবে ভাঙে এবং কতকগুলো মধ্যবর্তী যৌগ, যেমন— ইথানল উৎপন্ন করে। খাদ্য অসম্পূর্ণরূপে ভাঙার কারণে অবাত শ্বসনে সবাত শ্বসনের চেয়ে কম শক্তি নির্গত হয়।

নিম্নশ্রেণীর কিছু উদ্ভিদ। যেমন— ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক ছাড়া খুব কম সংখ্যক জীবই সম্পূর্ণরূপে অবাত শ্বসনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে। উন্নত শ্রেণীর কিছু উদ্ভিদের মূলের চারদিকের মাটি প্রাবিত হলে কণস্থায়ী অবস্থায় অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া চালাতে পারে।

ইস্ট অবাত শ্বসনে অভ্যস্ত এক ধরনের এককোষী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, যা শর্করা খাদ্য ব্যবহার করে অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মধ্যবর্তী যৌগ ইথানল উৎপন্ন করে। অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় ইস্টের ইথানল উৎপাদনকে গাঁজান বলে। ইথানল বিভিন্ন শিল্পে, ইনজেকশন দেওয়ার পূর্বে দেহপৃষ্ঠের জীবাণুনাশক হিসেবে এবং স্পিরিট ল্যাম্পে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জ্বালানি খরচ কমাবার জন্য পেট্রলের সাথে ইথানল ব্যবহার করা হয়। পাউরুটির কারখানায় রুটিকে ফুলিয়ে ফাঁপা করার জন্য ময়দার লেইতে ইস্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। ইস্ট লেইতে মিশানো চিনি অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এ গ্যাস রুটির ভেতরে জমে থেকে রুটিকে নরম ও ফাঁপা করে তোলে।

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াটিকে নিচের সাধারণ সমীকরণের সাহায্যে দেখানো হয় :



তবে মধ্যবর্তী যৌগে অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করা হলে ইথানল পুরোপুরি জারিত হয়ে অবশিষ্ট শক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয়।

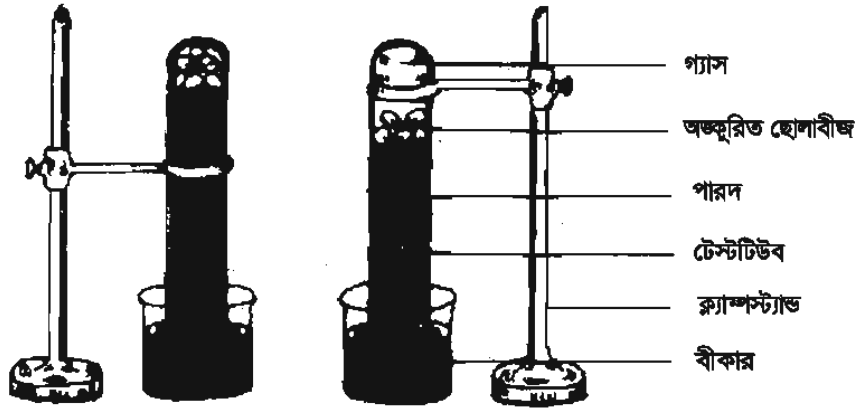
অবাত শ্বসনে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্নের পরীক্ষণ

উপকরণ : এ পরীক্ষণটির জন্য ১০-১২টি অঙ্কুরিত ছোলাবীজ, একটি মোটা টেস্টটিউব, একটি ছোট বীকার, একটি ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যান্ড, কিছু কস্টিক পটাশ এবং কিছু পরিমাণ পারদ প্রয়োজন হবে।

পদ্ধতি : বীকারে কিছুটা পারদ নাও। টেস্টটিউবটিকে পারদপূর্ণ কর। এখন সতর্কতার সঙ্গে টেস্টটিউবের মুখ বুড়ো আজুল দিয়ে চেপে ধরে বীকারের পারদে উল্টো করে বসিয়ে দাও। তারপর বীকারটিকে স্ট্যান্ডের পাশে রেখে ক্ল্যাম্প দিয়ে টেস্টটিউবটিকে এমনভাবে আটকাও যাতে বীকারের তলা ও টেস্টটিউবের খোলা মুখের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকে। এবার অঙ্কুরিত ছোলাবীজগুলোর বীজ আবরণ ছাড়িয়ে ফেল। চিমটার সাহায্যে বীজগুলোকে টেস্টটিউবে ঢুকিয়ে দাও। বীজগুলো ভেসে টেস্টটিউবের মাথায় গিয়ে জমবে। পরীক্ষণটি স্থাপন করার সময় সতর্ক হতে হবে যাতে টেস্টটিউবে বায়ু না ঢোকে।

পর্যবেক্ষণ : দুই ঘণ্টা পরে লক্ষ করলে দেখবে টেস্টটিউবের মাথায় পারদ খালি হয়ে গ্যাস জমেছে।

প্রমাণ : এ অবস্থায় চিমটার সাহায্যে কিছু পরিমাণ কস্টিক পটাশ টিউবে ঢুকালে তা দ্রুত গ্যাস শুষে নেবে, ফলে টেস্টটিউবটি আবার পারদে পূর্ণ হবে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, টেস্টটিউবের মধ্যে উৎপন্ন গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড।



চিত্র ১০.১৬ : অঙ্কুরিত ছোলাবীজের অবাত শ্বসন

সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের তুলনা

সবাত শ্বসন

- ১। বেশি কার্যকরী, বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়।
- ২। উচ্চ শ্রেণীর জীব, যেমন বটগাছ, হাতি যাদের বেশি শক্তির প্রয়োজন তারা সবাত শ্বসনকারী।
- ৩। খাদ্য ভেঙে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করে।
- ৪। সাইটোপ্রাজম এবং মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে।
- ৫। অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।
- ৬। বিক্রিয়া শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

অবাত শ্বসন

- ১। কম কার্যকরী, কম শক্তি উৎপন্ন হয়।
- ২। কিছু ছোট ছোট নিম্নশ্রেণীর জীব। যেমন-ইস্ট, ছত্রাক, টিটেনাস ব্যাকটেরিয়া অবাত শ্বসনকারী।
- ৩। খাদ্য সম্পূর্ণ ভাঙে না, উপজাত দ্রব্যে শক্তি আবদ্ধ থাকে। উপজাত দ্রব্য অনেক ক্ষেত্রে শিল্পকারখানায় কাজে লাগে।
- ৪। শুধুমাত্র সাইটোপ্রাজমে ঘটে।
- ৫। অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
- ৬। বিক্রিয়া শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইথানল ও শক্তি (কম) উৎপন্ন হয়।

শ্বসনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

জীবের জীবনে শ্বসনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষেই দিনরাত সব সময়ই শ্বসন চলছে এবং খাদ্য ভেঙে শক্তি তৈরি করছে।

শ্বসনে উপজাত হিসেবে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আবার সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন অক্সিজেন শক্তি উৎপাদনের জন্য শ্বসনে ব্যবহৃত হয়। এভাবে শ্বসন এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দুটি পৃথিবীতে জীবন প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন (২০.৭১%) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (০.০৩%) এর ভারসাম্য বজায় রাখে। মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বিনষ্ট করছে। জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সুসম ভারসাম্যটি বজায় রাখা অপরিহার্য।

প্রতিটি জীবের জৈবিক প্রক্রিয়া যেমন—বৃদ্ধি, বংশ বিস্তার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তির প্রয়োজন, আর এ শক্তি আসে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন (Plant Growth and Development)

বৃদ্ধি জীবের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা দেহের অভ্যন্তরে জৈব ক্রিয়ার ফলে ঘটে। বৃদ্ধির কারণে দেহের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির নির্দিষ্ট বয়সসীমা আছে। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এরূপ বয়সসীমা নেই। তবে পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে তা সাধারণত দেহের অগ্রভাগেই, অর্থাৎ মূল ও কাণ্ডের শীর্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড গৌণবৃদ্ধির ফলে পাশের দিকে বাড়তে থাকে। উদ্ভিদের এ বৃদ্ধি কীভাবে ঘটে তা আমরা জানি কি?

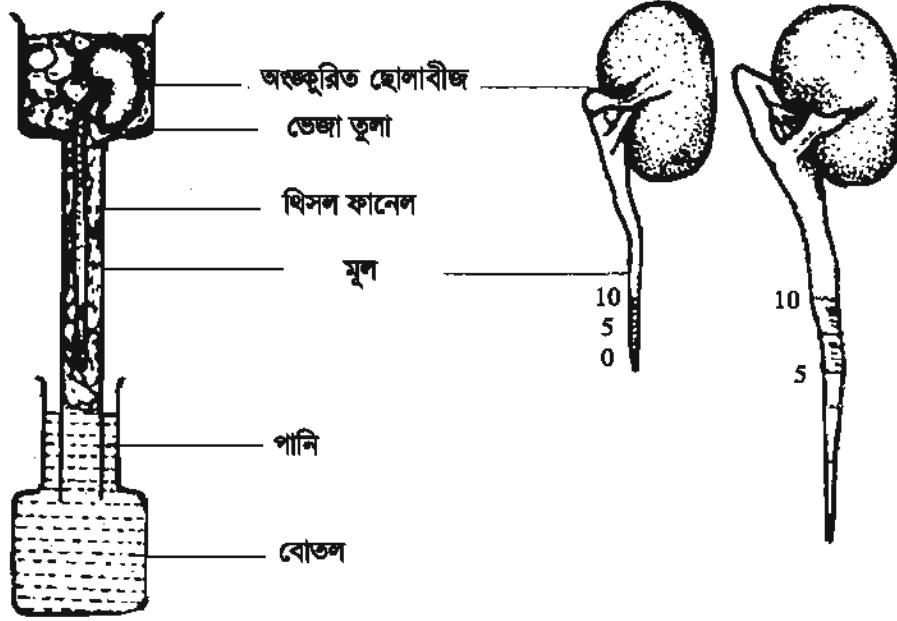
বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

বৃদ্ধি উদ্ভিদের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলেও বৃদ্ধির মাত্রা দেহের সর্বত্র একই রকম হয় না। বৃদ্ধির ফলে আকার ও আয়তনে বেড়ে গাছ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি পরিণত গাছ চারাগাছের তুলনায় বেশি টিকে থাকতে সক্ষম। একটি চারাগাছ সহজেই তৃণভোজী প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়। আবার লম্বায় খাটো হলে বড় গাছের ছায়ায় থেকে খাদ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সূর্যালোক পেতেও এদের অসুবিধা হয়। মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ আহরণের ক্ষেত্রেও উদ্ভিদের প্রতিযোগিতা করতে হয়। প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ পদার্থ আহরণের সুবিধার্থে মূল শাখা-প্রশাখা গজিয়ে চারদিকে ছড়ায়। কাণ্ড মাটির উপরে পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। সূর্যালোক আহরণের উপযোগী পাতার সংখ্যা বেশি হলে বেশি খাদ্য তৈরি হয়। ফুল ও ফল বেশি উৎপন্ন হয়, ফলে বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়ে। এসব কারণেই, অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে টিকে থাকার জন্যই উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বৃদ্ধির স্থান

উদ্ভিদের দেহের সকল অংশই কমবেশি বৃদ্ধি পায়। তবে বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ড এবং মূলের অগ্রভাগেই উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। উদ্ভিদের কোন অংশ কি হারে বাড়ে তা একটা সাধারণ পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

পরীক্ষণ : উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজন হবে কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলাবীজ, একটি খিসল ফানেল, খিসল ফানেল বসানোর উপযোগী একটি বোতল, পানিতে গলে না এমন কালো রঙের কাগজ ও পানি। অঙ্কুরিত



চিত্র ১০.১৭ : মূলের বৃদ্ধির অঞ্চল নির্ণয়ের পরীক্ষণ

ছোলাবীজের মূলটি গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সমান দূরত্বে দাগ কেটে নিতে হবে। তারপর দাগকাটা বীজটিকে এমনভাবে ফানেলে বসাতে হবে যাতে মূলটি এর নলের ভেতরে থাকে এবং মোটা অংশ উপরে থাকে। এবার বোতলটিতে পানি ভরে তার মধ্যে ফানেলটিকে ঝাড়াভাবে বসাতে হবে। তবে এর আগে ফানেলের নলটিকে কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে যাতে মূলে সরাসরি আলো না পৌঁছতে পারে। একদিন পরে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, মূল লম্বায় বেড়েছে এবং মূলের দাগগুলো আর সমান দূরত্বে নেই। মূলের অগ্রভাগের একটু পেছনের দাগগুলোর মধ্যকার দূরত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি বেড়েছে। এর কারণ কী? কারণ এ অঞ্চলের বৃদ্ধি হয়েছে, মূল লম্বা হয়েছে, ফলে দাগগুলোর দূরত্ব বেড়ে গেছে।

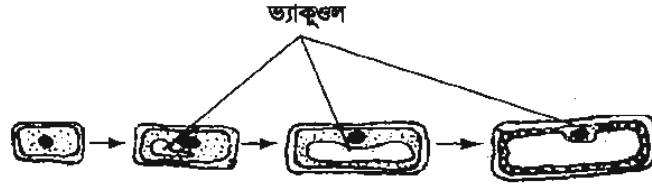
মূলের বর্ধিস্থ অঞ্চল

বর্ধনশীল একটি মূলকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন ভাজক অঞ্চল, দীর্ঘায়ন অঞ্চল এবং পরিস্ফুরণ অঞ্চল।

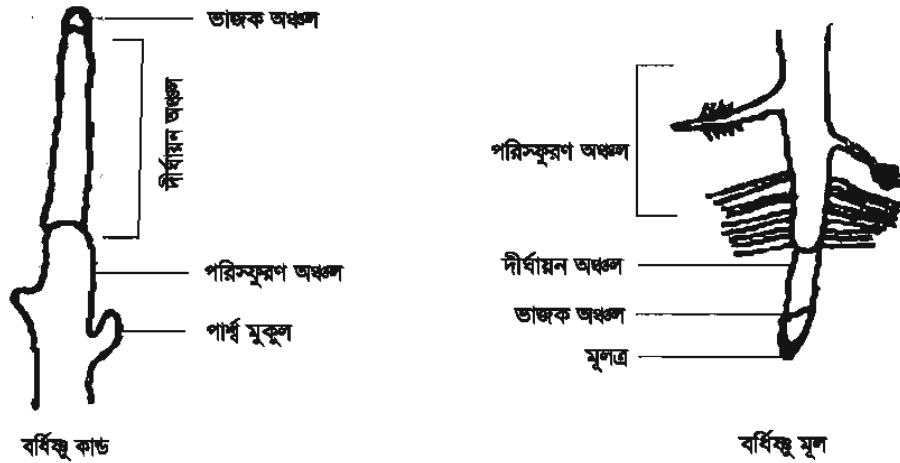
(১) **ভাজক অঞ্চল :** মূলের এ অঞ্চলে বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। মূলত্রের ঠিক পরেই ভাজক অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলের কোষগুলো অবিরত বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করার ফলে মূলের বৃদ্ধি ঘটে।

(২) **দীর্ঘায়ন অঞ্চল :** ভাজক অঞ্চলের পরেই থাকে দীর্ঘায়ন অঞ্চল। এখানে ভাজক অঞ্চলে সৃষ্ট নতুন কোষগুলোর প্রাচীর দীর্ঘ হয়ে লম্বালম্বিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত আকার লাভ করে। এ জন্য কোষকে অতিরিক্ত প্রাচীর ও প্রাজ্ঞামেমব্রেন গঠনের বস্তু। যেমন— সেলুলোজ, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি উৎপন্ন করতে হয়। তবে কোষের সাইটোপ্রাজমের পরিমাণ আনুগাতিক হারে বৃদ্ধি ন পাওয়ায় এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষগুলোতে বড় গহ্বর বিশিষ্ট ভ্যাকুওল সৃষ্টি হয়।

(৩) **পরিস্ফুরণ অঞ্চল :** পরিস্ফুরণ অঞ্চল দীর্ঘায়ন অঞ্চলের পেছনেই অবস্থিত। এ অঞ্চলে কোষগুলো পরিপূর্ণ অবস্থা লাভ করে। এ অঞ্চল থেকেই মূলের শাখা-প্রশাখা জন্মায়। মূলের মতো বর্ধিস্থ কাণ্ডেও একই ধরনের অঞ্চল রয়েছে। নিচের চিত্রে বর্ধিস্থ মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল দেখানো হয়েছে :



চিত্র ১০.১৮ : কোষের দীর্ঘায়ন প্রক্রিয়া

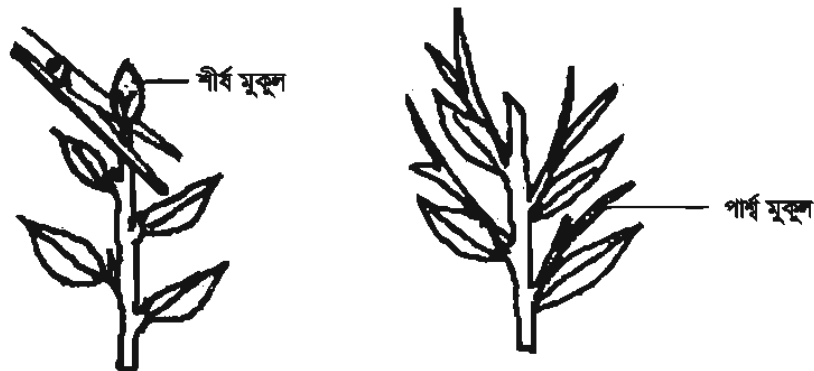


চিত্র ১০.১৯ : বর্ধিষ্ণু কাণ্ড ও মূলের বিভিন্ন অঞ্চল

পরিণত কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধি

মূল ও কাণ্ডের পরিণত অঞ্চল শুধু প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের কৌশিক গঠন প্রকৃতি অধ্যায়ে আমরা ক্যাম্বিয়াম টিস্যু সম্পর্কে জেনেছি। এগুলো বিভাজনক্ষম ভাজক টিস্যু। এরা সাধারণত জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর নতুন নতুন কোষ তৈরি করে।

ক্যাম্বিয়াম কেন্দ্রের দিকে নতুন জাইলেম এবং পরিধির দিকে নতুন ফ্লোয়েম টিস্যুর কোষ তৈরির ফলে পরিণত কাণ্ড ও মূল প্রস্থে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ মোটা হতে থাকে। যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি। এটাই উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি। যেসব উদ্ভিদে (যেমন— একবীজপত্রী উদ্ভিদ) গৌণ বৃদ্ধি হয় না সেগুলো সাধারণত সরু কাণ্ড বিশিষ্ট হয়। যেমন— সুপারি, ধান, গম, প্রভৃতি গাছ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায়।



চিত্র ১০.২০ : শীর্ষ মুকুল সরিয়ে নেওয়ার পর সুপ্ত পার্শ্ব মুকুলের বৃদ্ধি

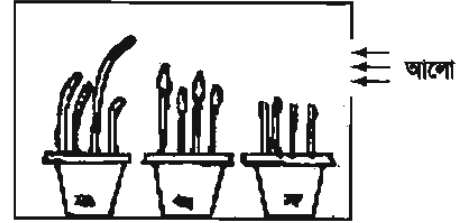
পরীক্ষণ : একটি বাড়ন্ত কাণ্ড থেকে যদি এর শীর্ষ মুকুল কেটে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কয়েকদিন পর লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ডের সুস্ত পার্শ্ব মুকুলগুলো শাখা-প্রশাখায় পরিণত হচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, এর কারণ হচ্ছে শীর্ষমুকুলে অক্সিন নামে এক ধরনের উদ্ভিদ প্রাণরস (Hormone) তৈরি হয় যা কাণ্ডের কোষগুলোকে লম্বায় বাড়তে সাহায্য করে এবং পার্শ্ব মুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ রাখে।

শীর্ষ মুকুলের এই বৈশিষ্ট্যকে শীর্ষপ্রকটতা (Apical dominance) বলে। শীর্ষমুকুল সরিয়ে নিলে কাণ্ডের শীর্ষে হরমোন তৈরি বন্ধ হয়, ফলে কাণ্ডের কোষগুলোর দীর্ঘায়নও বন্ধ হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পার্শ্ব মুকুলগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে গোল আলু ক্ষেতে লাগানোর সময় আস্ত আলু না লাগিয়ে এক একটি চোখসহ টুকরো টুকরো করে লাগানো হয়।

বৃদ্ধির দিক নিয়ন্ত্রণ

উদ্ভিদ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। আলো, পানি, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদের কোনো অংশের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়াকে দিকমুখিতা (Tropism) বলে। উদ্দীপনার দিকে উদ্ভিদ অঙ্গের সাড়া দেওয়াকে বলা হয় ধনাত্মক দিকমুখিতা (Positive tropism)। দিকমুখিতা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে :

ক) আলোক দিকমুখিতা (Phototropism) : কাণ্ড আলোর দিকে বাড়ে তাই কাণ্ড ধনাত্মক আলোক-দিকমুখী। মূল আলোর বিপরীতে বাড়ে তাই মূল ঋণাত্মক আলোক-দিকমুখী। এরূপ ঘটার কারণ কী? চারা উদ্ভিদের মুকুলাবরণ (Coleoptile) নিয়ে নিম্নরূপ একটি পরীক্ষণ থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একবীজপত্রী ভূণ থেকে সর্বপ্রথমে জনানো বিটপই হচ্ছে মুকুলাবরণ। ভুট্টার মুকুলাবরণ আলোর দিকে বাঁকা হয়ে বাড়ে। কিন্তু এর শীর্ষদেশ যদি পাতলা টিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় অথবা ধারালো ছুরি দিয়ে সাবধানে কেটে নেওয়া হয় তাহলে এটি আর আলোর দিকে বাঁকে না।



ক) স্বাভাবিক চারা।

খ) চারাগাছের শীর্ষভাগ সিলতার ফয়েল দ্বারা আবৃত

গ) চারাগাছের অগ্রভাগ কাটা

চিত্র ১০.২১ : আলোক দিকমুখিতা



(১) চারাগাছ স্বাভাবিক অবস্থায়
(খাড়াভাবে)



(২) চারাগাছ আনুভূমিক অবস্থায়



(৩) কাণ্ড উপরের দিকে এবং
মূল নিচের দিকে বেঁকেছে

চিত্র ১০.২২ : ভূ-দিকমুখিতা

এ পরীক্ষণ থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, আলোর উপস্থিতিতে উদ্ভিদের শীর্ষ মুকুলে এক ধরনের হরমোন সৃষ্টি হয় যা মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায়। মুকুল ঢেকে রাখলে অথবা কেটে নিলে হরমোন তৈরি হয় না, ফলে বৃদ্ধি বন্ধ থাকে।

খ) ভূ-দিকমুখিতা (Geotropism) : বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় লক্ষ করা যায় যে, ভূগমূল নিচের দিকে অর্থাৎ মাটির দিকে বাড়ে এবং কাণ্ড উপরে দিকে অর্থাৎ মাটির বিপরীত দিকে বাড়ে। মূলের জন্য এটা ধনাত্মক ভূ-দিকমুখিতা। কিন্তু কাণ্ডের জন্য এটা ঋণাত্মক ভূ-দিকমুখিতা।

গ) পানি-দিকমুখিতা (Hydrotropism) : গাছের মূল পানির দিকে বাড়ে এবং কাণ্ড পানির বিপরীত দিকে বাড়ে। এ কারণে মূল ধনাত্মক পানি দিকমুখী। চারাগাছের এক পাশে পানি রেখে দেখা গেছে মূল সরাসরি নিচের দিকে না গিয়ে বেকে পানির দিকে গেছে।

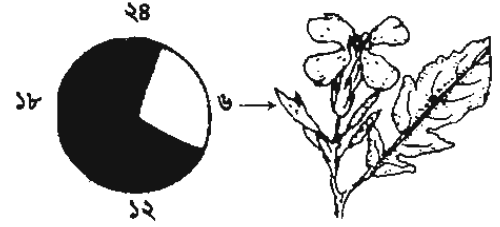
ঘ) রাসায়নিক দিকমুখিতা (Chemotropism) : কোনো রাসায়নিক পদার্থের উদ্দীপনায় যে বৃদ্ধি হয় তাকে রাসায়নিক-দিকমুখিতা বলা হয়। গর্ভাশয় হতে নিঃসৃত এক প্রকার বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের উদ্দীপনায় গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে গর্ভাশয়ের ডিম্বকের দিকে পরাগনাগীর বৃদ্ধি রাসায়নিক দিকমুখিতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

উদ্ভিদে আলো ও তাপের প্রভাব

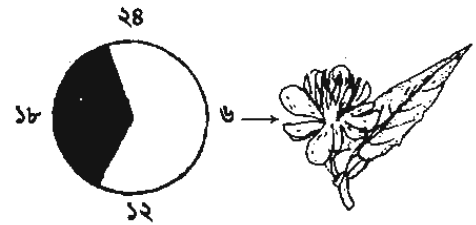
উদ্ভিদের মৌসুমি বৃদ্ধির ও ফলনের জন্য আলো ও তাপের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশে দেশে ঋতুভেদে দৈনিক আলো ও তাপের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকার মৌসুমি উদ্ভিদ ও ফুল-ফল জন্মে। শীতপ্রধান অঞ্চলের দেশসমূহে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপ এবং আমেরিকার কিয়দংশে এ ঘটনা খুবই প্রকটরূপে দেখা যায়। এসব দেশে শীতের মাসগুলোর হিমশীতল ঠান্ডা আবহাওয়ায় ছোট দিনের উদ্ভিদের বৃদ্ধি থেমে যায়। আবার গ্রীষ্মের আগমনে বড় দিনের গরম আবহাওয়ায় গাছপালা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে শীত আসার আগেই ফুল-ফল উৎপন্ন করে। আমাদের দেশে এসব ঘটনার প্রকটতা অনেক কম।

ক) ফটোপিরিওডিজম (Photoperiodism) : উদ্ভিদের ফুল ধারণে আলো-অন্ধকার বা দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে বলা হয় ফটোপিরিওডিজম। আলোর দৈনিক স্থিতিকালের সাথে ফুল ধারণের সম্পর্ক অনুসারে সপুষ্পক উদ্ভিদ তিন প্রকারের হয়। যেমন) (১) ছোট দিনের উদ্ভিদ (২) বড় দিনের উদ্ভিদ এবং (৩) দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ।

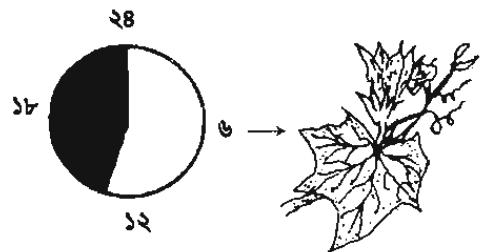
(১) ছোট দিনের উদ্ভিদ : ফুল ধরার জন্য এসব উদ্ভিদের দৈনিক গড়ে প্রায় ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা অবিরাম আলোর দরকার হয়। যেমন- আমন ধান, সরিষা, ডালিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ। শীতকালে দিন ছোট হয়ে আসলে এসব উদ্ভিদে পুষ্পমুকুল উৎপন্ন হয় যা পরে ফুল-ফলে পরিণত হয়।



ক) ছোট দিনের উদ্ভিদ (সরিষা)



খ) বড় দিনের উদ্ভিদ (পাট)



গ) দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (কুমড়া)

চিত্র ১০.২৩ : ফটোপিরিওডিজম (কালো অংশে অন্ধকার ও সাদা অংশে আলো বুঝানো হয়েছে)।

(২) বড় দিনের উদ্ভিদ : পুষ্পমুকুল তৈরির জন্য এসব উদ্ভিদের দৈনিক গড়ে প্রায় ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা অবিরাম আলো লাগে। যেমন—পাটগাছ।

(৩) দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের পুষ্পমুকুল জন্মানো দৈনিক আলোর স্থিতিকালের ওপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ এরা আলো-অন্ধকার নিরপেক্ষ। যেমন—তুলা, কুমড়া, মরিচ, পেঁপে প্রভৃতি গাছ এ জাতীয়।

ফটোপিরিওডিজমের গুরুত্ব : অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ফটোপিরিওডিজমের গুরুত্ব অপরিমিত। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক ঋতুর ফসল অন্য ঋতুতে ফলানো সম্ভব। এর ফলে সুবিধাজনক সময়ে ফসল উৎপন্ন করে তাকে বন্যা, ঝড়, তুষারপাত, রোগবালাই প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া এক ঋতুর ফসল উৎপন্ন ও বাজারজাত করে ভিন্ন মৌসুমের ফসল হিসাবে প্রচুর আয় করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষিক্ষেত্রে ফটোপিরিওডিজম পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। তাই এসব দেশে বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, শিম প্রভৃতি শাক-সবজি এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সব ঋতুতে পাওয়া যায়।

(খ) ভার্নালাইজেশন (Vernalization)

নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদের বীজ ৩-৪ সপ্তাহ যথাক্রমে নিম্ন (0°সেঃ) ও উচ্চ (8°সেঃ) তাপে রেখে যে গাছ জন্মে তাতে তাপ প্রয়োগ করা হয়নি এমন বীজ থেকে জন্মানো গাছের চেয়ে আগে ফুল ধরে। এ থেকে বুঝা যায়, বীজ বপনের আগে প্রয়োজনীয় তাপ প্রয়োগ উদ্ভিদের ফুল ধারণের সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করে। অর্থাৎ তাপ উদ্ভিদের ফুল ধারণের সময়কালকে নির্ধারণ করে। বীজ বপনের আগে তাতে প্রয়োজনমত নিম্ন বা উচ্চ তাপ প্রয়োগ করে স্বাভাবিক সময়কালের আগে উদ্ভিদে ফুল ধরানোর এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভার্নালাইজেশন।

আসলে তাপমাত্রা উদ্ভিদের জীবনচক্রে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ শীতকালে খুব কম তাপমাত্রায় জীবনধারণে সক্ষম। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে হলে সাধারণত এসব উদ্ভিদ বেঁচে থাকলেও এ সময় এদের বৃদ্ধি ঘটে না। তবে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকলে এক বিশেষ তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়া সচল হয়, সালোকসংশ্লেষণ চালু হয় এবং গাছের বৃদ্ধি শুরু হয়। এমনভাবে একটি বিশেষ তাপমাত্রা অনেক উদ্ভিদের ফুল উৎপাদন প্রভাবিত করে। আউশ ও বোরো ধানের ফসল সংগ্রহের সময়কালও তাপমাত্রার পরিবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোরো ধানের ফুল এবং দানা তৈরি হতে থাকে, তবে এসব উদ্ভিদের জীবনচক্রে ফুল-ফল ধরার পর্যায়ের অব্যবহিত পূর্বের পর্যায়ে নিম্ন তাপমাত্রা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই বলা যায়, ফুল-ফল উৎপাদনের জন্য কোনো উদ্ভিদের বা বীজের জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে নিম্ন তাপমাত্রা প্রাপ্তিই ভার্নালাইজেশন।

ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি : তাপ কীভাবে ফুল ধারণকে প্রভাবিত করে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। রুশ-বিজ্ঞানী কাজলাকজান (১৯৩৬)-এর মতে ফ্লোরিজেন নামক এক প্রকার হরমোন উদ্ভিদের ফুল ধারণের জন্য দায়ী, যার কার্যকারিতা ভার্নালিন নামক অন্য একটি হরমোনের ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। বপনের আগে বীজ উপযুক্ত তাপ পেলে ভার্নালিন উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। ফলে ফ্লোরিজেনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও তাড়াতাড়ি ফুল ধরে।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের গাছের জাতীয় দ্বি-বর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বীজ থেকে গজানো গাছের প্রথম বছর প্রধান মূলে খাদ্য সংরক্ষণ করে। শীতকালে গাছ মরে গেলেও প্রধান মূল মাটির নিচে অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়। শীতের নিম্ন তাপমাত্রায় এ মূলে ভার্নালাইজেশন ঘটে। দ্বিতীয় বর্ষে এ মূল থেকে নতুন গাছ জন্মে, যা সঞ্চিত খাদ্য ব্যবহার করে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও ফুল ধারণ করে।

শীতপ্রধান দেশে অনেক বীজের এভাবে নিম্ন তাপমাত্রায় ভার্নালাইজেশন না হওয়া পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম হয় না। এ প্রক্রিয়া শীতকালে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজের অঙ্কুরোদগম বন্ধ রাখে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করে গাছকে বংশরক্ষার সুযোগ দেয়। তাপমাত্রার প্রভাবে প্রবর্তিত এ ক্রিয়াগুলো উদ্ভিদের হরমোন সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব : ভার্নালাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক শীতপ্রধান দেশে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়েছে। বছরের উল্লেখযোগ্য সময় হিমশীতল আবহাওয়া ও তুষারপাতের ফলে সেসব দেশের সর্বত্র সারাবছর স্বাভাবিক কৃষিকাজ সম্ভব হয় না। তাই সে সব দেশে অনুকূল আবহাওয়া থাকার কয়েক মাসের মধ্যেই ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অল্প সময়ে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ পদ্ধতিতে এক দেশের উদ্ভিদকে আর এক দেশের অনুপযোগী আবহাওয়ায় সহজেই খাপ খাওয়ানো যায়।

এ পদ্ধতিতে আমাদের দেশেও কৃষিকাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এ পদ্ধতিতে ধান, পাট প্রভৃতি ফসল অল্প সময়ে উৎপন্ন করে খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা, রোগবালাই প্রভৃতি থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। আবার একই জমিতে একাধিক ফসলও ফলানো যেতে পারে। তবে এ জন্য উদ্যোগ, চেষ্টা ও গবেষণা প্রয়োজন।

কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোনের ব্যবহার

আমরা জানি, উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূলে রয়েছে উদ্ভিদ হরমোন। কৃত্রিম হরমোন ছিটিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। তবে যে উদ্ভিদ বেশি হরমোন শোষণ করতে পারবে তারই বৃদ্ধি বেশি হবে। উদ্ভিদ ও হরমোনের এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে অনেক হরমোনকে আগাছানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শস্যক্ষেতে বিশেষ ধরনের হরমোন ছিটালে বড় পাতাবিশিষ্ট আগাছাসমূহ সরু পাতা বিশিষ্ট শস্য উদ্ভিদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ হরমোন শোষণ করে এবং পরিণামে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মারা যায়। কম হরমোন শোষণ করায় শস্য উদ্ভিদ বেঁচে থাকে এবং জমি আগাছামুক্ত হয়। আমাদের দেশে আগাছা দমনে হরমোনের ব্যবহার খুবই সীমিত। ক্ষেত্রবিশেষে কখনও কখনও ২,৪ ডি নামক হরমোন ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম উপায়ে বংশ বৃদ্ধিতেও হরমোন ব্যবহৃত হয়। মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়ার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে পছন্দমত উদ্ভিদ থেকে কাটিং বা কলম তৈরি করা। তবে কলম তৈরি সময় সাপেক্ষ, কারণ কাটা অংশে স্বাভাবিকভাবে মূল গজাতে সময় বেশি লাগে। এ ক্ষেত্রে হরমোন ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। উদ্ভিদের কাটা অংশ হরমোন দ্রবণে চুবিয়ে নিলে এতে দ্রুত শিকড় গজায়।

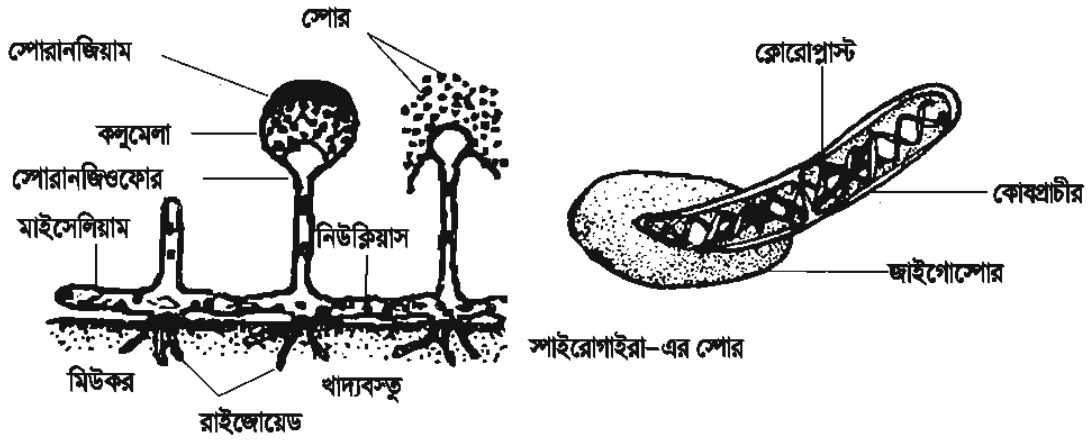
উদ্ভিদ প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি

একটি উদ্ভিদ থেকে অনুরূপ আর একটি উদ্ভিদের উৎপত্তি হওয়াকেই প্রজনন বলে। উদ্ভিদের প্রজনন পদ্ধতিগুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজনন।

অযৌন প্রজনন (Asexual Reproduction)

পুংজনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষের মিলন ব্যতিরেকে যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন প্রজনন বলে। অযৌন প্রজনন দুই প্রকার। যথা—অনুবীজ প্রজনন ও অঙ্গাজ প্রজনন।

অনুবীজ প্রজনন (Spores) : অনেক উদ্ভিদ বিশেষ করে অপুষ্পক উদ্ভিদ কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ (স্পোর) উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। ছত্রাক, শৈবাল, মস, ফার্ন ইত্যাদি জাতীয় উদ্ভিদ বংশ বিস্তারের জন্য রেণু থলি জন্মায়। এ রেণু থলিতে এক ধরনের এক কোষী রেণু বা স্পোর (Spores) উৎপন্ন হয়। পরিপক্ব প্রতিটি রেণু থেকে উপযুক্ত পরিবেশে অনুরূপ নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।



চিত্র ১০.২৪ : বিভিন্ন ধরনের অযৌন প্রজনন

অঙ্গজ প্রজনন (Vegetative Reproduction)

ফুল ও বিশেষত জনন অঙ্গ ছাড়াই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নতুন উদ্ভিদের উৎপত্তি হওয়াকেই অঙ্গজ প্রজনন বলে। এ নতুন উদ্ভিদ সাধারণত মাতৃ-উদ্ভিদের সমগুণাগুণ সম্পন্ন হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে নতুন উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো যায়। অঙ্গজ প্রজনন দুই উপায়ে ঘটে থাকে।

স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন

উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন যে যে উপায়ে সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে তা আলোচনা করা হল :

(১) দেহের খন্ডায়ন : দেহ একাধিক খন্ডে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি খন্ড একটি উদ্ভিদে পরিণত হয়। যেমন-স্পাইরোগাইরা, রিকসিয়া প্রভৃতি।

(২) মূলের মাধ্যমে : মূলের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রজনন আবার দু'ভাবে হয় :

- ক) সাধারণ মূলের মাধ্যমে। যেমন-পটোল
- খ) কন্দাল মূলের মাধ্যমে। যেমন-মিষ্টি আলু।

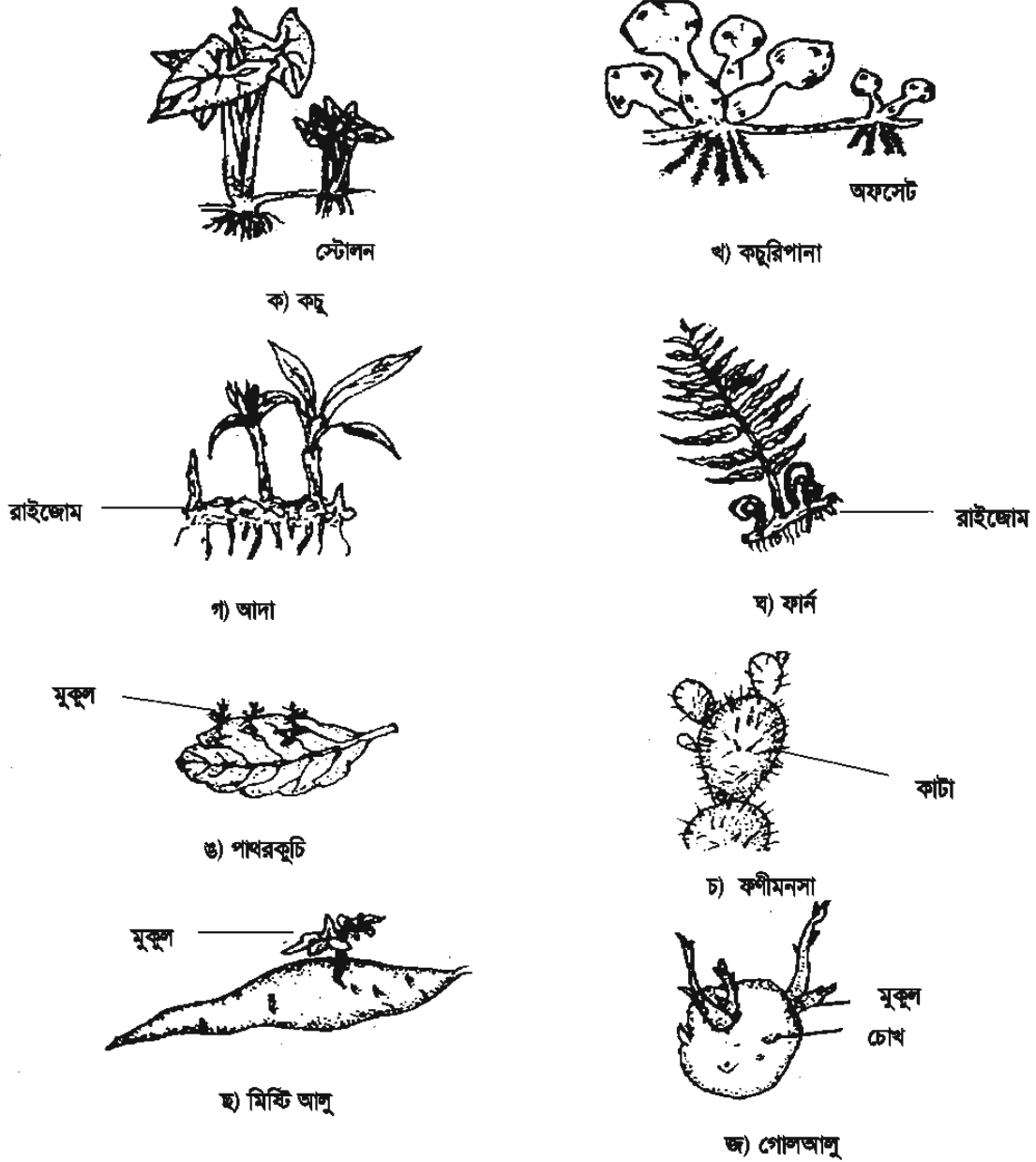
সেখানে মূলের চোখ থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

(৩) কাণ্ডের কন্দাল : কাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রজনন নিচে উল্লেখিত বিভিন্ন উপায়ে হয় :

- ক) স্টোলন : মাটির ওপর সমান্তরাল বিস্তৃত কাণ্ড বা স্টোলনের গিট বা পর্বসন্ধি থেকে নতুন গাছ জন্মে।
যেমন- কচু, কচুরিপানা প্রভৃতি।
- খ) রাইজোম : মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থিত আঁশযুক্ত কাণ্ডের মুকুল থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়।
যেমন- আদা, ফার্ন প্রভৃতি।
- গ) পর্নকাণ্ড : অনেক উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে। এসব কাণ্ডের অংশ থেকে নতুন গাছ জন্মে। যেমন-ফণীমনসা।
- ঘ) কন্দ : কন্দের চোখ বা মুকুল থেকে নতুন গাছ জন্মে। যেমন- গোল আলু।
- ঙ) কন্দাল কাণ্ড : কন্দের পার্শ্বীয় ও শীর্ষমুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মে। যেমন-পিয়াজ।

(৪) পাতার মাধ্যমে : পাতার কিনারায় উৎপন্ন মুকুল থেকে নতুন গাছ উৎপন্ন হয়। যেমন—পাথরকুচি।

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে গাছের কোনো কোনো অংশ স্বাভাবিকভাবেই নতুন গাছে পরিণত হয়। এভাবে উৎপন্ন গাছগুলো মাতৃগাছের সমগুণাগুণ সম্পন্ন হয়। একটি ভাল জাতের গাছের অবিকল সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এসব প্রক্রিয়া খুব সুবিধাজনক। তবে এ প্রক্রিয়ায় সাধারণ কাক্ষিত নতুন বৈশিষ্ট্যধারী উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় না। বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষের ক্ষেত্রে এসব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।



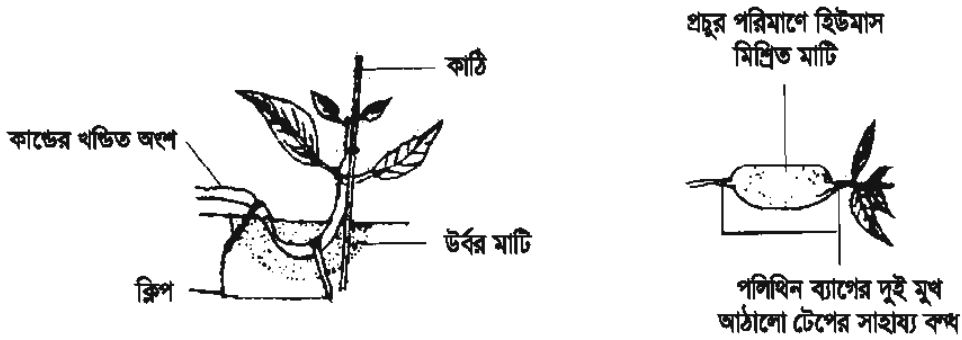
চিত্র ১০.২৫ : বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন

কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন

এ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের কোনো অংশ থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন করা হয়। এখানে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল :

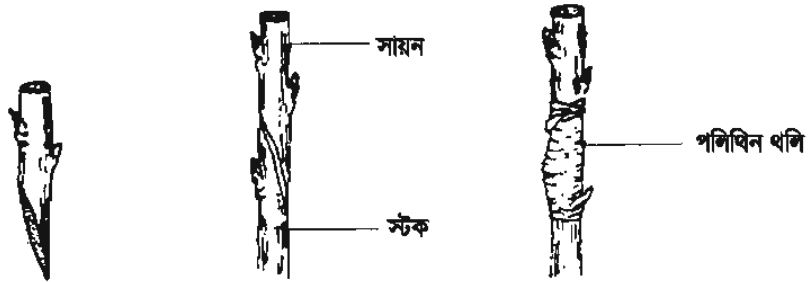
(১) **শাখা কলম (Cutting)** : এ পদ্ধতিতে গাছের একটি শাখা কেটে নিয়ে ভেজা মাটিতে লাগানো হয়। শাখাটি স্বাভাবিকভাবে নতুন গাছে পরিণত হয়। যেমন—গোলাপ, পাতাবাহার, আখ ইত্যাদি। হরমোন প্রয়োগ করলে শাখা কলম বা কাটিং—এ দ্রুত মূল গজায়।

(২) **কলম (Rooting or Layering)** : এ পদ্ধতিতে গাছের কচি শাখার একটি অংশে কৃত্রিম উপায়ে মূল গজানো হয় এবং মূলসহ শাখাটিকে কেটে মাটিতে লাগানো হয়। যেমন— দাবা কলম, গুটি কলম ইত্যাদি। এতে গাছের একটি নিচু শাখাকে টেনে নামিয়ে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায়ই তার কিছু অংশ মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অথবা হিউমাস মেশানো মাটি পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। মূল গজানোর পর শাখাটিকে কেটে মাটিতে লাগানো হয়।



চিত্র ১০.২৬ : দাবা কলম ও গুটি কলম

(৩) **জোড় কলম (Grafting)** : এ পদ্ধতিতে সাধারণত এক জাতীয় দুটি গাছের একটির কাণ্ডের সঙ্গে অপরটির (ভালজাতের) শাখা কৃত্রিম উপায়ে জোড়া দিয়ে নতুন গাছ উৎপন্ন করা হয়। শাখা অংশটিকে উপজোড় বা সাইগন (Scion) এবং কাণ্ড অংশটিকে আদি জোড় বা রুট স্টক (Root stock) বলে।

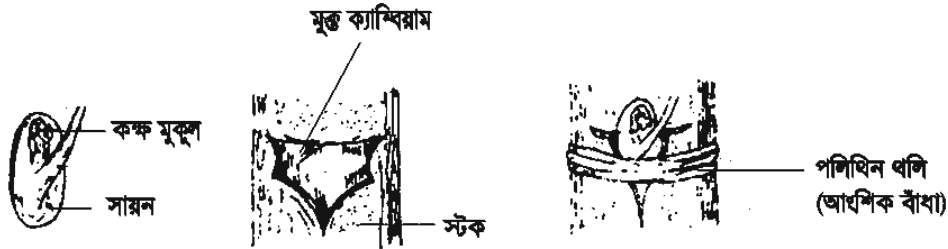


চিত্র ১০.২৭ : জোড় কলম

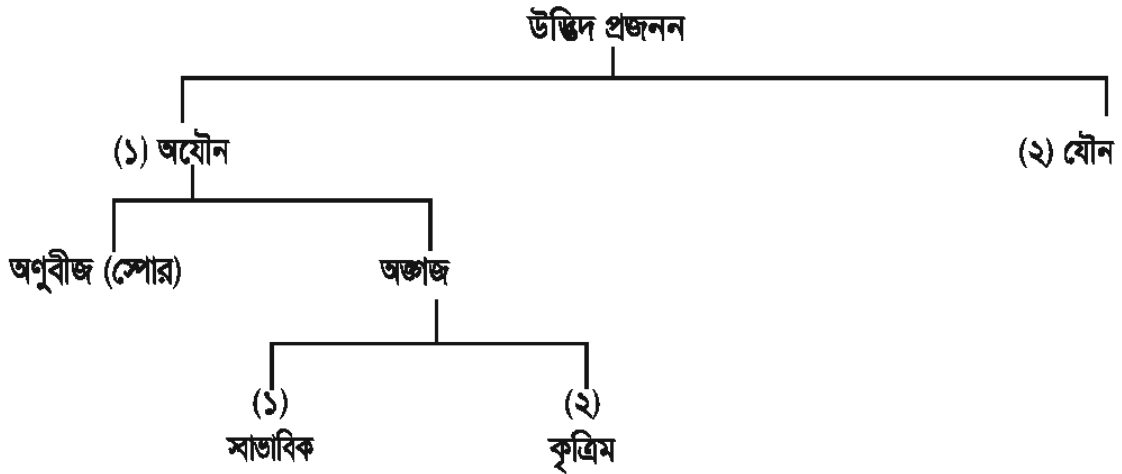
এক্ষেত্রে প্রথমে রুটস্টকের মাথা ধারালো চাকু দিয়ে একটি নির্দিষ্ট আকারে (যেমন—N আকার) কেটে নিতে হয়। পরে সাইগনের নিচের প্রান্ত একইভাবে কেটে রুট স্টকের মাথায় ঠিকমত বসিয়ে মোম ও ছত্রাকনাশক ওষুধ লাগিয়ে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়। গ্রাফটিং সফল হলে রুট স্টক থেকে গজানো সব শাখা ও মুকুল কেটে ফেলতে হয়। লেবু জাতীয় গাছ ও আমগাছে এভাবে কৃত্রিম উপায়ে অজ্ঞান প্রজনন ঘটানো যেতে পারে।

(৪) **চোখ কলম বা কুঁড়ি সংযোজন (Budding)** : এ ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে এক গাছের মুকুল তুলে এনে অপর গাছে সংযোজন করা হয়। প্রথমে যে কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার বাকলে সুবিধাজনক স্থানে চাকু দিয়ে T আকারে একটি গর্ত করতে হবে। পরে যে গাছের কলম তৈরি করা হবে সে গাছের একটি মুকুল চাকু দিয়ে বাকলসহ

তুলে নিয়ে T আকারে কাটতে হবে এবং গর্ত করা অংশে যত্নসহকারে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর মোটা সুতা দিয়ে জড়িয়ে মুকুলটিকে কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।



চিত্র ১০.২৮ : চোখ কলম



যৌন প্রজনন (Sexual Reproduction)

পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে সংঘটিত প্রজননকেই বলা হয় যৌন প্রজনন। এতে পুংজনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষের মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয়। এ জাইগোট থেকেই পরে নতুন বংশধরের আবির্ভাব ঘটে। এখানে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

যৌন প্রজনন অজ্ঞা

ফুল উন্নত উদ্ভিদের যৌন প্রজননের অজ্ঞা। ফুলের ভেতর পুংজনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষের সৃষ্টি হয়। এদের মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নতুন উদ্ভিদের জন্য দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। বড় হয়ে এসব উদ্ভিদও ফুল ধারণ করে। এভাবে চক্রাকারে উদ্ভিদের জীবনপ্রবাহ চলতে থাকে।

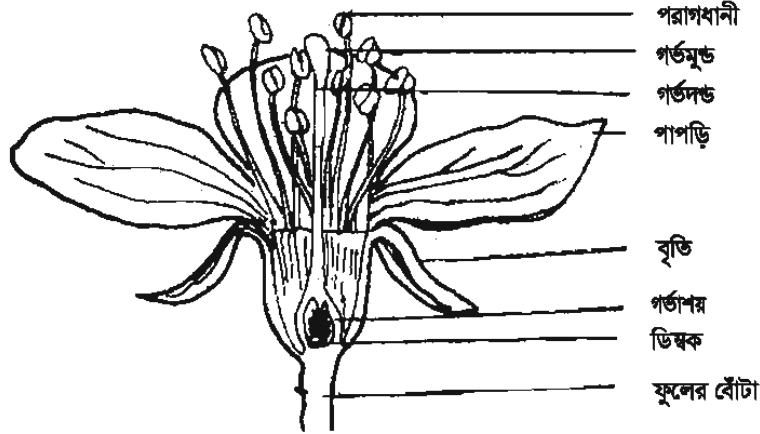
উদ্ভিদের যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র ধাপে সংঘটিত হয়। যেমন—পরাগায়ন—নিষেককরণ—ফল ও বীজ উৎপাদন— ফল ও বীজ বিস্তরণ— বীজের অঙ্কুরোদগম। এ ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি ফুলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর একবার সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হল :

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ভালোভাবে বুঝার জন্য আমাদের ফুলের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

বৃতি : বৃতি পুষ্প মুকুলকে রক্ষা করে। এগুলো সাধারণত সবুজ রঙের হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা পাপড়ির মতো রঙিন হয়ে থাকে।

পাপড়ি : পরপরাগী ফুলে পাপড়িগুলো পরপরাগায়নের জন্য কীটপতঙ্গ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল বর্ণের হয়। এদের পাদদেশে অবস্থিত মধুগ্রন্থি থেকে মধু আহরণ করতে গিয়েই কীটপতঙ্গ ফুলের পরাগায়ন ঘটায়।

পুংকেশর : পুংকেশরের মাথায় থলির মতো অংশই পরাগধানী। এতে পরাগরেণু তৈরি হয়। পরাগধানীর নিচের দিকের বৃন্তের মতো অংশ হচ্ছে পুংদণ্ড। পরাগরেণুতে পুংনিউক্লিয়াস থাকে।



চিত্র ১০.২৯ : একটি আদর্শ ফুলের লম্বচ্ছেদ

স্ত্রীকেশর : স্ত্রীকেশর গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ডে বিভক্ত। গর্ভাশয়ে ডিম্বকের ভেতর স্ত্রী নিউক্লিয়াস বা ডিম্বাণু থাকে।

পরাগায়ন (Pollination)

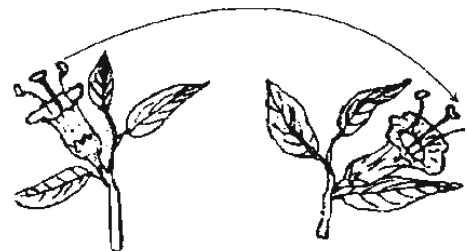
পরাগধানী থেকে পরাগরেণুর একই ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলা হয়। পরাগায়ন প্রধানত দুই প্রকারের হয়। যেমন—স্বপরাগায়ন ও পরপরাগায়ন।

স্বপরাগায়ন : একটি ফুলের পরাগরেণু ঐ ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে অথবা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াই স্বপরাগায়ন। স্বপরাগায়নের ফলে উদ্ভিদ প্রকরণ বা পার্থক্য খুবই কম হয়। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে এ উদ্ভিদ সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু চাষের জন্য স্বপরাগিত উদ্ভিদ সুবিধাজনক—কারণ এদের ফুল ও ফল ধারণের সময় এক হওয়াতে চাষাবাদ ও শস্য আহরণে সুবিধা হয়।



চিত্র ১০.৩০ : স্বপরাগায়ন

পরপরাগায়ন : একটি ফুলের পরাগরেণু একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াই পরপরাগায়ন। পরপরাগায়নের ফলে সূক্ষ্ম উদ্ভিদে প্রকরণ দেখা যায়, যা উদ্ভিদকে পরিবর্তনশীল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। যেমন—প্রকরণের ফলে কোনো কোনো উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের চেয়ে লম্বা হতে পারে। আলো প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় এরা খাটো উদ্ভিদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

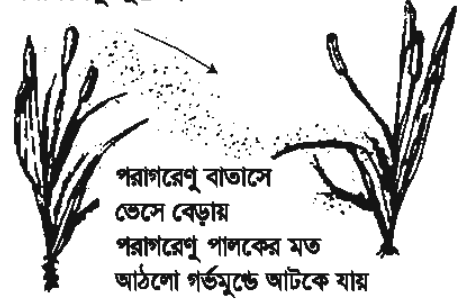


চিত্র ১০.৩১ : পরপরাগায়ন

সাধারণত বায়ু, পানি, কীটপতঙ্গ এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমের নাম অনুসারে পরাগায়ন প্রক্রিয়ার নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়।

বায়ু পরাগায়ন : বায়ু দ্বারা পরাগায়িত ফুলগুলোকে বায়ু পরাগী ফুল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে বায়ু পরাগায়ন বলে। বায়ু পরাগী ফুল সাধারণত খুবই ক্ষুদ্র হয়। এদের পরাগরেণু খুব হালকা হয় যাতে বায়ুতে ভেসে বেড়াতে পারে। এসব ফুলের পরাগধানী অসংখ্য পরাগরেণু তৈরি করে। বাতাসে ভেসে আসা পরাগরেণু ধরার জন্য এ জাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডে পাখির পালকের মতো রোমশ থাকে। এদের উজ্জ্বল পাপড়ি ও মধুগ্রন্থির প্রয়োজন হয় না। ধান, গম, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে এ রকম ফুল হয়।

বড় আকারের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু মুক্ত হয়।



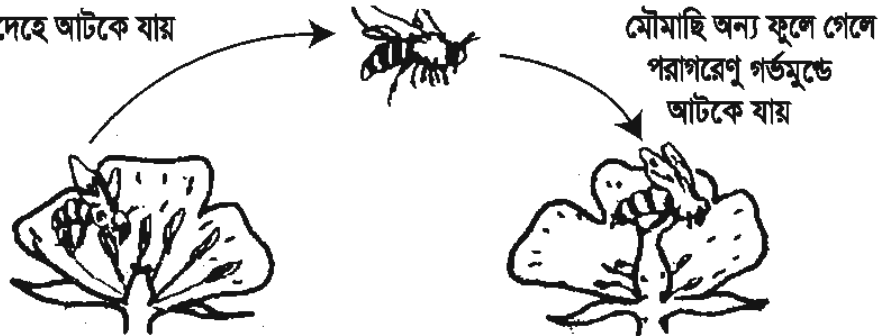
চিত্র ১০.৩২ : বায়ু পরাগায়ন

পতঙ্গ পরাগায়ন : কীটপতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়িত ফুলগুলোকে পতঙ্গ পরাগীফুল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে পতঙ্গ পরাগায়ন বলে। পতঙ্গ পরাগী ফুলের উজ্জ্বল বর্ণ, সুগন্ধ এবং মধুগ্রন্থি থাকে। বর্ণ, গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধু সঞ্চারের জন্য ফুলে ঢোকার সময় পতঙ্গের দেহে পরাগরেণু লেগে যায়। এ পতঙ্গ মধু সঞ্চারের জন্য যখন একই প্রজাতির অন্য ফুলে ঢোকে তখন এদের দেহে লেগে থাকা পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে পরাগায়ন ঘটায়। বেশিরভাগ উদ্ভিদের ফুলই এ জাতীয়।

মৌমাছি পরাগরেণু বহন করে

ফুল থেকে মধু আহরণের

সময় পরাগরেণু মৌমাছির দেহে আটকে যায়

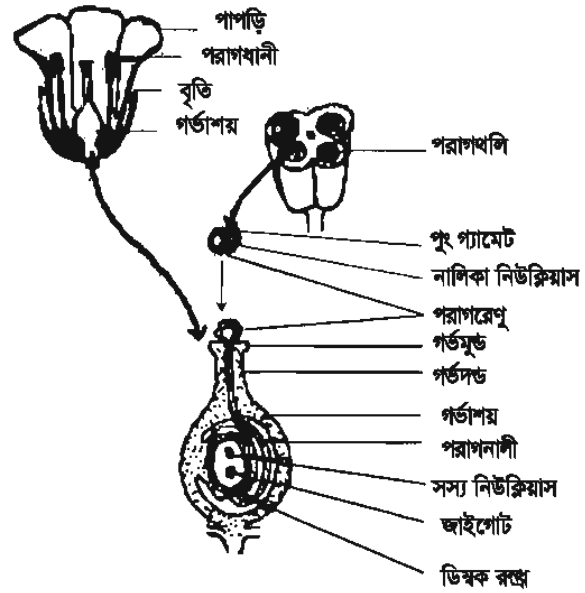


চিত্র ১০.৩৩ : পতঙ্গ পরাগায়ন

পানি পরাগায়ন : পাতা শেওলা, কাঁটা শেওলা প্রভৃতি উদ্ভিদে পরাগায়ন পানির মাধ্যমে হয় বিধায় একে পানি পরাগায়ন বলে।

প্রাণী পরাগায়ন : কিছু কিছু ফুলের পরাগায়ন পাখি, বাদুড়, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি প্রাণীর সাহায্যে হয়। যেমন— শিমুল, কদম ইত্যাদি। এ পরাগায়নকে প্রাণী পরাগায়ন বলে।

নিষেক (Fertilization) : পুং নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রী নিউক্লিয়াসের মিলনই নিষেক বা গর্ভাধান বলা হয়। নিষেকের জন্য গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত পরাগরেণু থেকে পরাগনালী বের হয়ে তা গর্ভদণ্ড হয়ে গর্ভাশয়ের ডিম্বকে পৌঁছে। পুং নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রী নিউক্লিয়াস উভয়ের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্যাপলয়েড অর্থাৎ দেহকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক। সুতরাং এদের মিলনে যে ডাইগোটের সৃষ্টি হয় তা ডিপ্লয়েড। নিষিক্ত হওয়ার পর ফুলের গর্ভাশয়টি সাধারণত ফলে এবং ডিম্বকটি বীজে পরিণত হয়। ফল ও বীজ বিভিন্নভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে উদ্ভিদের বংশবিস্তার করে।



চিত্র ১০.৩৪ : নিষেক বা গর্ভাধান

ফল ও বীজের বিস্তরণ

ফল ও বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তায় ঐগুলোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় ফল ও বীজের বিস্তরণ।

যে সব মাধ্যমের সাহায্যে ফল ও বীজ বিস্তার লাভ করে তাদের নাম অনুসারে বিস্তরণ প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়। বিস্তরণের প্রধান উপায় বা মাধ্যমগুলো হচ্ছে—বায়ু, পানি, সবেগ স্ফুটন এবং প্রাণী।

পানি স্রোত : নারকেল, তাল প্রভৃতি ফল পানিতে ভেসে থেকে পানির স্রোতের সঙ্গে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। শাপলা, পদ্ম এদের ফলও পানি দিয়ে বিস্তার লাভ করে।

স্ফুটন : অনেক ফল পরিপক্ব হলে সবেগে ফেটে গিয়ে বীজ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন—মাষকলাই, মটরশুঁটি, রেড়ি প্রভৃতি ফল।

প্রাণী : প্রাণীর সাহায্যে নানানভাবে ফল ও বীজ ছড়ায়। আম, জাম, লিচু, কুল এসব রসালো ফল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দূর-দূরান্তে নিয়ে যায়। ফল খাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ সেখানে ফেলে দিয়ে বীজের বিস্তরণে সাহায্য করে।

শিম, কুল, পেয়ারা কাঁঠাল প্রভৃতি ফল কাক, বাদুড় খেলে অনেক সময় বীজও পাকস্থলীতে চলে যায়, যা হজম হয় না। মলের সঙ্গে এসব বীজ বের হয়ে আসে। এভাবে এসব বীজ দূরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘাসের বীজ, যেমন চোরকাঁটা পথচারীর কাপড়ে আটকে দূরে চলে যায়। এখানে প্রাণীদেহের ত্বক কিংবা লোমে আটকেও এ ধরনের বীজ দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

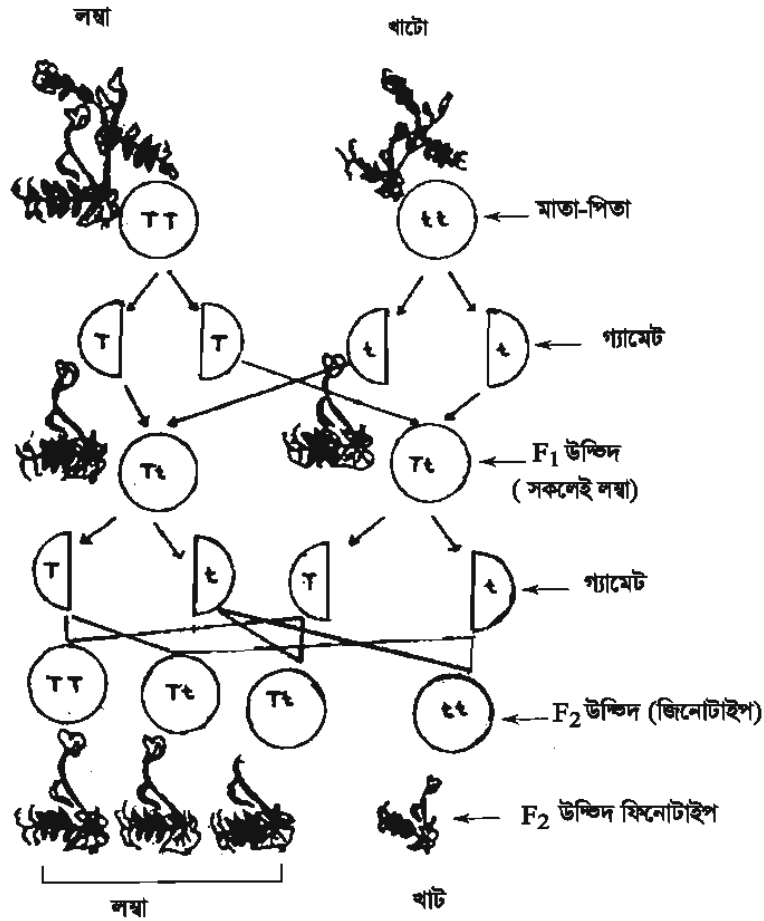
বিস্তরণের গুরুত্ব : প্রতিটি সপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে সাধারণত প্রচুর সংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। এসব বীজের সফল অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মাটি, পানি, বায়ু, আলো ও স্থান সংকুলান। প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব বজায়ের উপযুক্ত পরিবেশের জন্য ফল ও বীজের বিস্তরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

উদ্ভিদের প্রকরণ (Variation)

আমরা জেনেছি, পরাগায়নের ফলে ডিম্বক নিষিক্ত হলে তা থেকে উৎপন্ন বীজের বিভিন্নতা দেখা যায়। কারণ নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুং নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রী নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে বংশধর বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদের বংশধরদের মধ্যে কিতাবে প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

মেন্ডেল একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা গাছের পরাগরেণু খাটো গাছের গর্ভমুণ্ডে এবং খাটো গাছের পরাগরেণু লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে এদের প্রজনন ঘটান। অন্য কোনো পরাগরেণু যাতে আসতে



চিত্র ১০.৩৫ : মেন্ডেলের পরীক্ষণ

না পারে সে জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা নেন। এ থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল সব গাছই লম্বা হয়েছে; কোনো খাটো গাছ নেই। এদের একটি গাছকে স্বপরাগায়নের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে তা থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল যে এতে লম্বা ও খাটো দূরকমের গাছই রয়েছে। যার মধ্যে ৩ ভাগ লম্বা গাছ ও ১ ভাগ খাটো গাছ।

মেন্ডেলের এই তত্ত্ব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুপ্রজননে প্রয়োগ করা হয়। কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বংশধর সৃষ্টি করা হয়। এদের মধ্যে থেকে কৃত্রিম বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে সুপ্রজননের মাধ্যমে কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে উন্নত জাতের শস্য উৎপাদনে এই পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করা হয়।

উদ্ভিদের কৃত্রিম যৌন প্রজনন (Artificial Sexual Reproduction in Plants)

পরাগনালীর পুং নিউক্লিয়াস ও ডিম্বকের স্ত্রী নিউক্লিয়াসের মিলনে নিষেকের ফলে জাইগোট থেকে যে বীজ তৈরি হয় তা থেকে উৎপন্ন নতুন গাছে কিছু প্রকরণ দেখা দেয়। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণও ডিম্বক উৎপাদনকারী পিতৃ-মাতৃ উদ্ভিদ

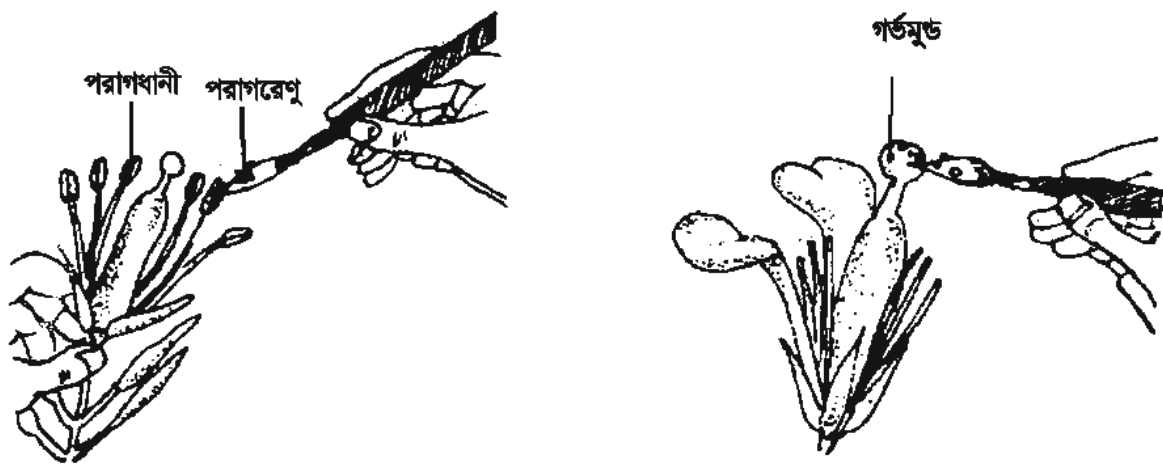
নিয়ন্ত্রণ করে একই জাতের নতুন ধরনের উদ্ভিদ উদ্ভাবন করতে পারেন। এদেরকে পরীক্ষা করে যেগুলো উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত সেগুলোকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। এভাবে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ আশা করতে পারেন যে, নির্বাচিত নতুন জাত উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক অথবা একটি বিশেষ পরিবেশে ভালো জন্মাবে। যেমন লবণাক্ত মাটির ধান, গভীর জলের ধান গাছ। নিয়ন্ত্রিত পরাগায়নের মাধ্যমে উৎপন্ন বীজ থেকে জন্মানো শত শত চারাগাছের মধ্যে অন্তত দু'চারটি কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জনক উদ্ভিদের চেয়ে উন্নত ধরনের হবে। যদি পছন্দমত এরকম কোনো গাছ পাওয়া যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করে তা ভালো বলে গণ্য হয়, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর প্রজনন ঘটিয়ে বীজ ও গাছের সংখ্যা বাড়ানো হয়। আবার কৃত্রিম উপায়ে অজ্ঞা প্রজনন ঘটিয়ে এর বংশ বৃদ্ধি করা যায়।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল : পরিপক্ব হওয়ার আগেই একটি উভলিঙ্গ ফুলের পরাগধানীগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তারপর ফুলটিকে পলিথিনের ব্যাগে ভরে গোড়ার দিক বন্ধ করে দিতে হবে। এ ফুলটি পরে নিষেকের জন্য মাতৃউদ্ভিদ বা স্ত্রী উদ্ভিদ হিসেবে কাজ করবে। তারপর পছন্দমত উদ্ভিদের পরিপক্ব পরাগধানী থেকে তুলির সাহায্যে পরাগরেণু নিয়ে তাড়াতাড়ি নির্বাচিত স্ত্রী উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে লাগিয়ে দিতে হবে। এ জন্য পলিথিন ব্যাগটি পরাগরেণু লাগানোর পরেই তা আবার বন্ধ করে দিতে হবে।

নিষেকের ফলে ফুল থেকে বীজ উৎপন্ন হবে। এ সব বীজ থেকে গাছ জন্মিয়ে তার মধ্যে থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের গাছগুলো নির্বাচিত করতে হবে। পছন্দমত উদ্ভিদ পাওয়া গেলে ঐ উদ্ভিদের বীজ ব্যবহার করে উৎপাদিত উদ্ভিদের বীজ পুনরায় বীজ হিসেবে পর পর ব্যবহার করলে ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক সময় হারিয়ে যায়। এ কারণে বংশ পরম্পরায় বীজ ব্যবহার না করে নতুন বীজ ব্যবহার করা উৎপাদনের সহায়ক। উদ্ভিদের ভালো বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ তাই সব সময়েই নতুন নতুন উদ্ভিদের প্রজনন ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করছেন।

অপুংজনি (Parthenogenesis)

নিষেক ছাড়াই মাঝে মধ্যে কোনো কোনো উদ্ভিদ জননকোষ বিশেষ করে ডিম্বাণু ভূণ গঠন করে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। উদ্ভিদের স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণুর নিষেক ছাড়াই নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেওয়াকে অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস কলা হয়। যেমন— মিউকর, স্পাইরোগাইরা, কলা ইত্যাদি।



চিত্র ১০.৩৬ : কৃত্রিম যৌন প্রজনন বা সুষ্রজনন

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

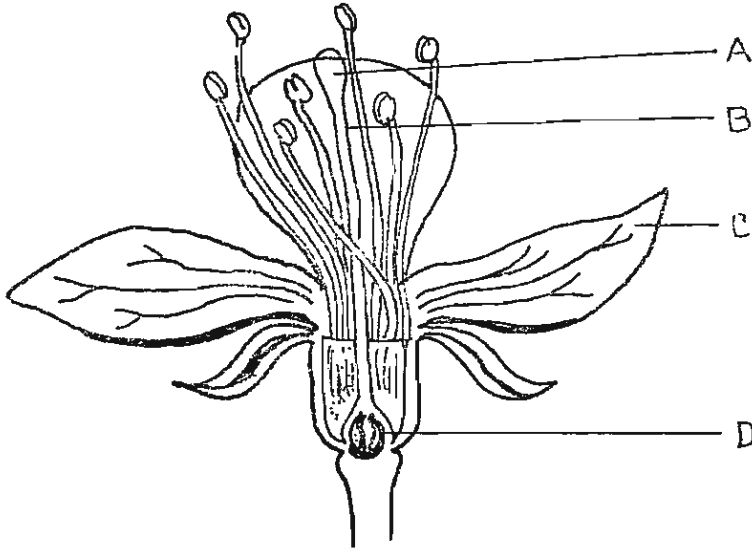
১। অজ্জুরিত বীজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে কোনটি উৎপন্ন করে?

ক. CO_2

খ. ATP

গ. O_2

ঘ. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$



উপরের চিত্রটি থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২। উপরের চিত্রের কোন অংশটি ফল উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে?

ক. A

খ. B

গ. C

ঘ. D

৩। এ ধরনের উদ্ভিদে কোন প্রক্রিয়ায় পরাগায়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

ক. স্বপরাগায়ন

খ. পরপরাগায়ন

গ. বায়ু পরাগায়ন

ঘ. পতঙ্গ পরাগায়ন

৪। পতঙ্গ পরাগায়নের ফলে

(i) মধু সঞ্চার হয়

(ii) ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়

(iii) উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

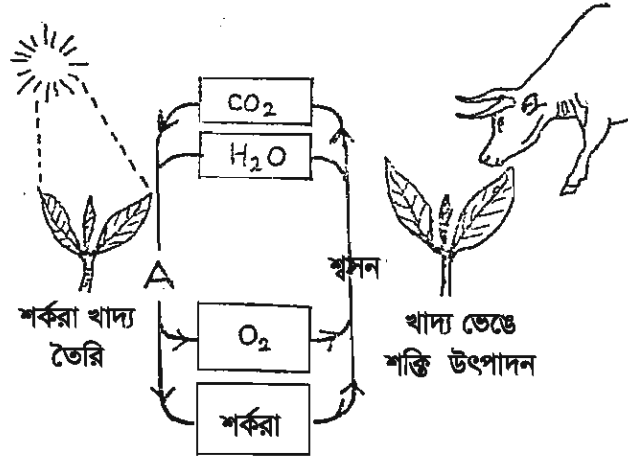
ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



- চিত্রে প্রদর্শিত A প্রক্রিয়াটির নাম কী?
- এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উপাদানসমূহ উদ্ভিদ কীভাবে পেয়ে থাকে ব্যাখ্যা কর।
- আলোর অনুপস্থিতি উপরোক্ত প্রক্রিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করবে ব্যাখ্যা কর।
- এ প্রক্রিয়াটি প্রকৃতিতে না ঘটলে উদ্ভূত অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

প্রাণীর বিভিন্নতা

এ পৃথিবী বিচিত্র ধরনের অজস্র প্রাণীর আবাস ভূমি। আণুবীক্ষণিক প্রাণী অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশালদেহী তিমির মতো নানা আকৃতি প্রকৃতির প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে রয়েছে। এদের অনেকেই মানুষের উপকার সাধন করলেও কেউ কেউ যথেষ্ট ক্ষতি করে। বিশাল প্রাণীজগৎকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার কিংবা এদের ক্ষতিকর ভূমিকা থেকে রক্ষার জন্য এদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আবশ্যিক। বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজভাবে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হল এদের শ্রেণীবিন্যাস করা। প্রাণীদের দেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

আজ পর্যন্ত প্রায় পনের লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বাড়ছে। প্রজাতি হল শ্রেণীবিন্যাসের নিম্নতম একক। উদাহরণ—মানুষ, দোয়েল পাখি, দেয়াল টিকটিকি, কুনো ব্যাং এক একটি প্রজাতি। সাধারণত একটি প্রজাতির সকল সদস্য চারিত্রিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান জন্মদানে সক্ষম।

শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাসে অ্যারিসটোটল, জন রে, ক্যারোলাস লিনিয়াস এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে লিনিয়াস শ্রেণীবিন্যাসের জনক নামে পরিচিত। কারণ তিনিই প্রথম প্রাণীদেরকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ করেন অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং একই সাথে জীবের নামকরণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

প্রজাতির নামকরণের জন্য লিনিয়াস প্রবর্তিত পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি বলা হয়। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত নামকে বৈজ্ঞানিক নামও বলা হয়। এ পদ্ধতি অনুসারে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens*, বাংলাদেশের জাতীয় প্রাণী বাঘের নাম *Panthera tigris*, ইলিশ মাছের নাম *Tenualosa ilisha*, দোয়েল পাখির নাম *Copsychus saularis*। বৈজ্ঞানিক নামের একটি সুবিধা হল, আঞ্চলিক ভাষায় একটি প্রজাতির যে নামই থাক না কেন সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা ঐ প্রাণীকে সহজে ঐ নামেই চিনতে পারে।

প্রাণীদেরকে একক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

১। কোষ সংখ্যা : দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হলে এককোষী বা প্রোটোজোয়া এবং একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত হলে বহুকোষী বা মেটাজোয়া। অ্যামিবা, ম্যালেেরিয়া জীবাণু ইত্যাদি এককোষী এবং তেলাপোকা, কেঁচো, মাছ ইত্যাদি বহুকোষী প্রাণী।

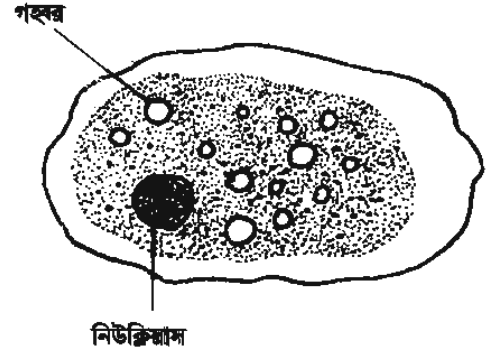
২। মেরুদণ্ড : মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া থাকলে প্রাণীকে মেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ড অনুপস্থিত থাকলে অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। অ্যামিবা, তেলাপোকা, মশা, শামুক, সামুদ্রিক তারামাছ ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মাছ, ব্যাং, বাদুড়, তিমি ইত্যাদি মেরুদণ্ডী প্রাণী।

৩। নটোকর্ড : জীবনের কোনো না কোনো দশায় নটোকর্ড থাকলে তাদেরকে কর্ডাটা এবং নটোকর্ডবিহীন প্রাণীদেরকে নন-কর্ডাটা বলে। মাছ, ব্যাং ইত্যাদি কর্ডাটা। অ্যামিবা, তেলাপোকা, কেঁচো, শামুক ইত্যাদি নন-কর্ডাটা।

প্রাণিবিজ্ঞানীগণ প্রাণীজগৎকে প্রায় ৩০টিরও অধিক দলে ভাগ করেছেন। এই দলগুলোকে পর্ব (Phylum) বলা হয়। এখানে প্রধান ১০টি পর্ব এবং এদের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও মানুষের জীবনে এদের গুরুত্ব আলোচনা করা হল :

১। প্রোটোজোয়া (Protozoa)

একটি মাত্র কোষ দ্বারা প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণীদের দেহ গঠিত। এ জন্য এদেরকে এককোষী প্রাণী বলা হয়। এরা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এদের দেহে পৃথক কোনো অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র নেই এবং সকল জৈবিক কাজ একটি মাত্র কোষের ভিতরেই সম্পাদিত হয়। এরা ক্ষণপদ, ফ্লাজেলা বা সিলিয়া নামক চলন অঙ্গ দ্বারা, কিংবা দেহ কোষের সংকোচন প্রসারণ দ্বারা চলাচল করে।

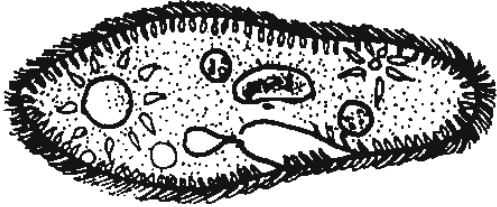


চিত্র : এন্টামিবা

অধিকাংশ প্রোটোজোয়া পানিতে বা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। অনেকেই স্বাধীনজীবী তবে বেশ কিছু প্রোটোজোয়া আছে যারা অন্য প্রাণীতে পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এ পর্বের আবিষ্কৃত প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০।

উদাহরণ : অ্যামিবা, এন্টামিবা, প্লাজমোডিয়াম, প্যারামেসিয়াম, জিয়ার্ডিয়া ইত্যাদি।

(ক) আমাশয়ের জীবাণু : এন্টামিবা একটি সরল এককোষী প্রাণী। এটি পরজীবী হিসেবে মানুষের অঙ্গে বাস করে এবং আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে। এদের দেহ সাইটোগ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত। দেহের চারদিকে পাতলা পর্দা বা কোষ আবরণী থাকে।



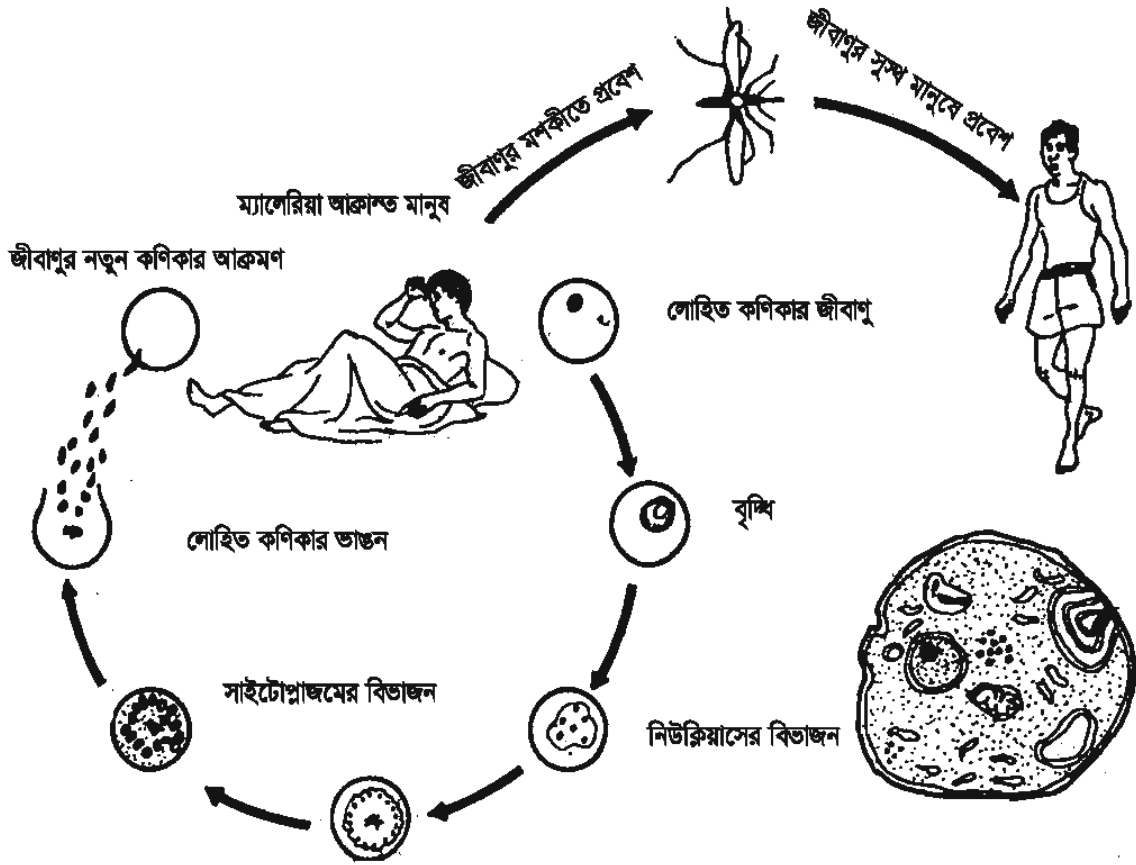
চিত্র : প্যারামেসিয়াম

এন্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত মানুষের মলের সাথে এ জীবাণু পরিবেশে ছড়ায়। পানি, শাকসবজি জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে এবং অঙ্গে আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আমাশয় রোগে তলপেটে ব্যথা হয়, মলের সাথে রক্ত ও শ্লেষ্মা বের হয়।

এ রোগ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় মলত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। টিউবওয়্যেল বা ফুটানো পানি পান, পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা এবং মাছি, আরশোলা থেকে খাদ্যদ্রব্যকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এন্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ম্যালেরিয়া জীবাণু : প্লাজমোডিয়াম এক ধরনের এককোষী পরজীবী প্রাণী। জীবন চক্রের একটি পর্যায়ে এরা মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ড প্রাণীতে এবং আরেকটি পর্যায়ে এনোফিলিস মশকীর দেহে বাস করে।

মশকীর মাধ্যমে মানুষের দেহে জীবাণুর স্পোরোজোয়েট দশা প্রবেশের পর যকৃতে বড় হয় ও বংশবৃদ্ধি করে। অতঃপর এরা লোহিত রক্ত কণিকায় বংশবৃদ্ধিকালে কণিকার ভাঙনের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টি করে। এ রোগে কাঁপুনিসহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জ্বর আসে। প্লাজমোডিয়ামের আক্রমণে দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীকে কামড়ালে রক্তের সাথে জীবাণু মশকীর দেহে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি করার পর স্পোরোজোয়েটরূপে মশকীর লাল গ্রন্থিতে অবস্থান করে।



চিত্র : ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ

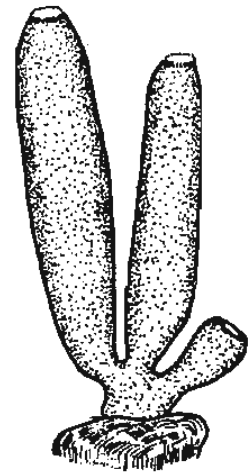
ম্যালেরিয়া জীবাণুর নিয়ন্ত্রণ

নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব :

- ক) মশা ধ্বংস করা
- খ) মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করা
- গ) মশার কামড় থেকে আত্মরক্ষা করা এবং
- ঘ) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে কুইনাইন জাতীয় ওষধ সেবন করানো।

২। পরিকেরা (Porifera)

পরিকেরা পর্বের প্রাণীদেরকে সাধারণত স্পঞ্জ বলা হয়। এদের অধিকাংশ সমুদ্রে পাওয়া যায় তবে কিছু প্রজাতি স্বাদু পানিতেও বাস করে। এরা পানির নিচে কোনো বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে। এরা বহুকোষী তবে কোষের কোন নির্দিষ্ট বিন্যাস বা কলাতন্ত্র নেই। এদের দেহপ্রাচীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত। এদের মাধ্যমে পানি, অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং একটি বড় ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের ভিতরের পানি বাইরে বের হয়ে যায়।



স্কাইফা

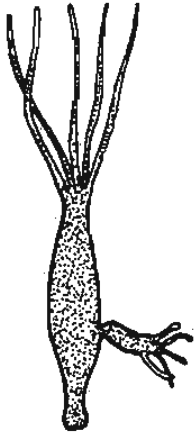
স্পঞ্জ ধোয়া-মোছা বা গোসলের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজকাল কৃত্রিম স্পঞ্জ অনেক দেশ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে। এ পর্বের আবিষ্কৃত প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০।

উদাহরণ : স্পঞ্জিলা, স্কাইফা।

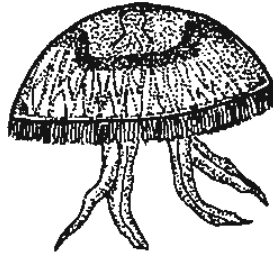
৩। নিডেরিয়া (Cnidaria)

এদের দেহ বিভিন্ন প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলো দুটি স্তরে বিন্যস্ত এবং উভয় স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে মেসোগ্লিয়া নামক জেলির মতো পদার্থ থাকে। দেহের ভিতরে একটি ফাঁপা গহ্বরও দেখা যায়। এ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। দেহে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। এ পর্বের প্রাণীরা সাধারণত সামুদ্রিক, তবে এদেরকে স্বাদু পানিতেও পাওয়া যায়। মানুষের কাছে সিলেন্টারেটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের প্রত্যক্ষভাবে তেমন গুরুত্ব নেই। আবিষ্কৃত প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ১০০০।

উদাহরণ : হাইড্রা, জেলিফিশ, প্রবাল, ওবেলিয়া।



হাইড্রা



জেলিফিশ



ওবেলিয়া

৪। প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)

এ পর্বের প্রাণীরা চ্যাস্টাকুমি নামে পরিচিত। এদের দেহ পাতা বা ফিতার মতো চ্যাস্টা, পরিপাকতন্ত্রে মুখ থাকে, পায়ু থাকে না এবং শিখা কোষ এর সাহায্যে রেচন কাজ সম্পাদন করে।

এ পর্বের অধিকাংশ প্রাণী মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীতে পরজীবী হিসেবে বসবাস করে এবং মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০।

উদাহরণ : যকৃৎকুমি, ফুসফুসকুমি, রক্তকুমি, ফিতাকুমি।



যকৃৎকুমি



ফিতাকুমি

ফিতাকৃমি (Tapeworm)

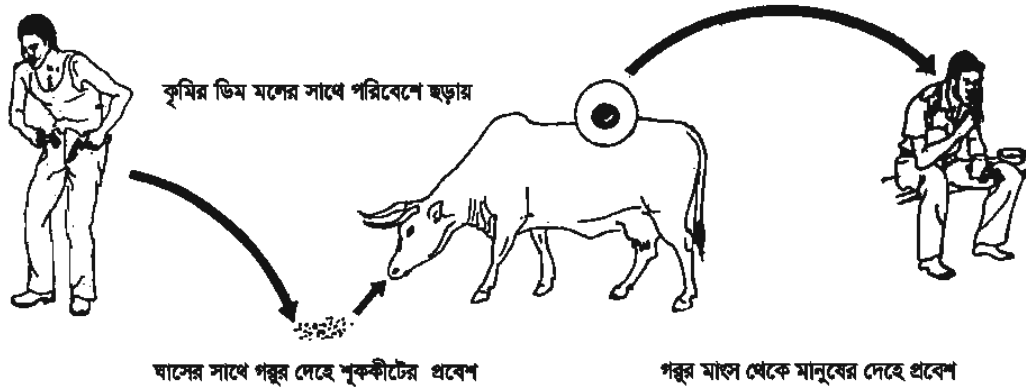
মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বেশ কয়েক ধরনের ফিতাকৃমি দেখা যায়। আমাদের দেহে টিনিয়া স্যাগিনেটা (Taenia saginata) নামক ফিতাকৃমি পাওয়া যায়। এটি মানুষের অঙ্গে পরজীবী হিসেবে বাস করে। দেহ ফিতার মতো লম্বা। আলপিনের গোল প্রান্তের মতো একটি বা স্কোলেক্স (Scolex) এবং অনেকগুলো খন্ড বা প্রোগ্লোটিড নিয়ে এদের দেহ গঠিত। চোষক এর মাধ্যমে এটি অঙ্গের দেয়ালে আটকে থাকে এবং দেহ আবরণের মাধ্যমে পোষকের হজমকৃত খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে।

পেছনের খন্ডগুলো ডিমে পূর্ণ থাকে এবং খসে গিয়ে মলের সাথে পরিবেশে ছড়ায়। গরু ঘাস খাওয়ার সময় কৃমির ডিম গরুর অঙ্গে আসে এবং ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। এরপর শূককীট অঙ্গের প্রাচীর ভেদ করে রক্তের সাহায্যে পেশিতে আশ্রয় নেয় এবং থলেকৃমিতে (Bladderworm) পরিণত হয়। থলেকৃমি আক্রান্ত গরুর মাংস কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ খেলে কৃমি পুনরায় মানুষের অঙ্গে আসে এবং পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়ে হজমকৃত খাদ্য খেতে থাকে ও কলা ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করতে থাকে। ফিতাকৃমির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় :

ক) গরুর মাংস ভালো করে সিদ্ধ করে খাওয়া এবং

খ) আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা।

ফিতাকৃমি আক্রান্ত মানুষ

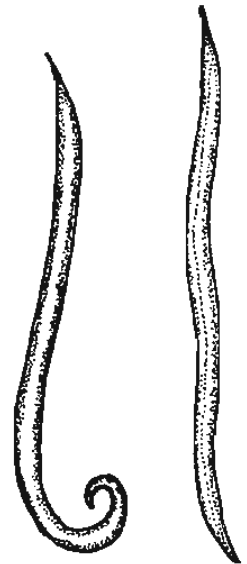


৫। নিম্যাটোডা (Nematoda)

এ পর্বের প্রাণীদেরকে সাধারণত গোলকৃমি বলে। অধিকাংশই মাধীনজীবী, তবে কিছু কিছু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অঙ্গে, রক্তসহ দেহের বিভিন্ন অংশে পরজীবী হিসেবে বসবাস করে। এদের দেহ নলাকৃতি, পরিপাকনালী সম্পূর্ণ অর্থাৎ মুখ ও পায়ু থাকে। আবিষ্কৃত প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ১২,০০০।

উদাহরণ : কেঁচোকৃমি, হুকওয়ার্ম, পিনওয়ার্ম, ফাইলেরিয়া কৃমি।

কেঁচোকৃমি (Roundworm) : কেঁচোকৃমি মানুষের অঙ্গে পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং অঙ্গের হজমকৃত খাদ্য শোষণ করে মানুষের, বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। কেঁচোকৃমি আক্রান্ত মানুষের মলের সাথে নিষিক্ত ডিম পরিবেশে ছড়ায়। নিষিক্ত ডিমটি একটি শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে আবরণের ভিতরে নিষিক্ত ডিম একটি নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করার পর সুস্থ অবস্থায় থাকে। অতঃপর খাদ্য, পানীয়, কাঁচা শাকসবজি, অপরিষ্কার হাতের আঙুল ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের অঙ্গে পৌঁছে। অঙ্গে পৌঁছার পর ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। এ শূককীট অঙ্গের



চিত্র : কেঁচোকৃমি

প্রাচীরে রক্তনালীর মাধ্যমে যকৃৎ, হৃদযন্ত্র হয়ে ফুসফুসে যায়। ফুসফুসে এরা বড় হয়ে পুনরায় ট্র্যাকিয়া ও অন্ননালীর মাধ্যমে অস্ত্রে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে এবং বংশবিস্তার করা শুরু করে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী কৃমি দিনে ২০,০০০ ডিম দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ : কেঁচোকৃমির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত :

- i) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় মলত্যাগ করা।
- ii) শাকসবজি উত্তমরূপে ধৌত করা।
- iii) খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখা।
- iv) খাদ্য গ্রহণের আগে ও শৌচকাজ শেষে ভালোভাবে হাত-মুখ পরিষ্কার করা।
- v) মাঝে মাঝে ডাক্তারের পরামর্শে কৃমিনাশক ওষধ সেবন করা।

হুকওয়ার্ম (Hookworm) : হুকওয়ার্ম মানুষের অস্ত্রঃপরজীবী হিসেবে বাস করে এবং অস্ত্র প্রাচীর থেকে রক্তচুষে পুষ্টি লাভ করে। ফলে দেহে রক্তক্ষয়তা রোগ দেখা দেয়। মলের সাথে নিষিক্ত ডিম পরিবেশে ছড়ায়। ডিম ফুটে যে শূককীট বের হয় তা সাধারণত পায়ের তলা ছিদ্র করে দেহে প্রবেশ করে। এর পর এরা রক্তের মাধ্যমে যকৃৎ, হৃদযন্ত্র হয়ে ফুসফুসে আসে। ফুসফুসে বৃন্দী লাভ করার পর ট্র্যাকিয়া ও অন্ননালীর মাধ্যমে পুনরায় অস্ত্রে আসে এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

প্রতিকার

- ১) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় মলত্যাগ করা।
- ২) নোদ্রা ভিজা মাটিতে খালি পায়ে না হাঁটা।

পিনওয়ার্ম (Pinworm) : পিনওয়ার্ম সুতাকৃমি নামে পরিচিত এবং দেহতে ২-১২ মিলিমিটার লম্বা সুতার মতো। এরা মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের অস্ত্রে বাস করে। রাত্রিকালে স্ত্রী পিনওয়ার্ম প্রাণী মলদ্বারের চারদিকে ডিম ছাড়ে। এ সময় মলদ্বারের চারিপাশ চুলকায়। মলদ্বার চুলকালে ডিম নখের সাহায্যে মুখে যায় এবং অস্ত্রে এসে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

ফাইলেরিয়াওয়ার্ম (Filariaworm) : ফাইলেরিয়া ওয়ার্ম মানুষের গোদ রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগ ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ইত্যাদি জেলায় বেশি দেখা যায়। এ কৃমি দেহতে সুতার মতো। স্ত্রী প্রাণী যে শূককীট জন্ম দেয় তাকে মাইক্রোফাইলেরিয়া শূককীট বলে। এরা রক্তে বাস করে। এ মাইক্রোফাইলেরিয়া শূককীট কিউলেক্স মশায় গেলে সেখানে বৃন্দীপ্রাপ্ত হয়। মাইক্রোফাইলেরিয়া শূককীট আক্রান্ত মশা থেকে জীবাণু পুনরায় মানবদেহে আসে এবং লসিকা গ্রন্থিতে পূর্ণতা লাভ করে।

ফাইলেরিয়া আক্রান্ত মানুষের দেহে জ্বর, মাথাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাত, পা, অভ্যর্থন ও স্তন ফুলে যায়। গোদ রোগে আক্রান্ত মানুষ অকর্মণ্য এবং দুর্বল হয়ে যায়।

প্রতিকার

- ১) মশকীর বংশবিস্তার রোধ
- ২) মশকীর কামড় থেকে আত্মরক্ষা
- ৩) ফাইলেরিয়া আক্রান্ত হলে জরুরিভাবে চিকিৎসা করা।

৬। অ্যানেলিডা (Annelida)

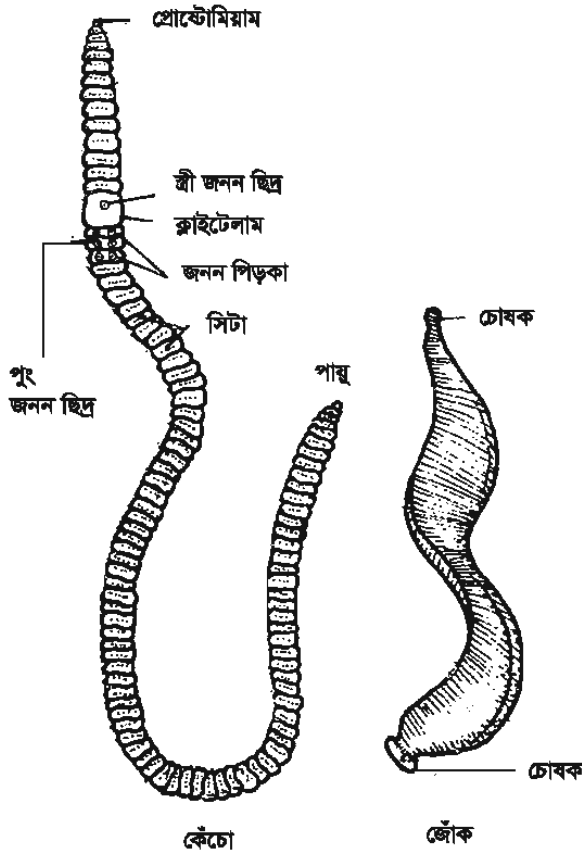
এদের দেহ নলাকার এবং আর্থটর মতো কতকগুলো খণ্ডকে বিভক্ত। পরিপাক নালী ও দেহপ্রাচীরের মধ্যে বিশেষ পর্দা ঘেরা প্রকৃত দেহগহ্বর এ পর্বের প্রাণীতে প্রথম দেখা যায়। রেচন কার্য সম্পাদনের জন্য নেফ্রিডিয়াম নামক অঙ্গ থাকে। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৯০০০।

উদাহরণ : কেঁচো, জঁক ইত্যাদি।

৭। আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

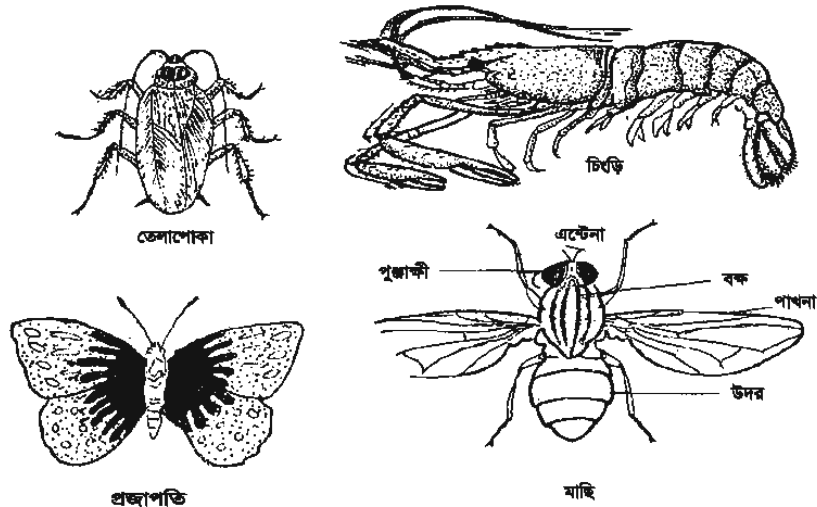
সংখ্যার দিক থেকে এটি প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ পর্ব। আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০। এদের দেহে তিন বা ততোধিক জোড়া সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ থাকে। দেহ বাহ্যিকভাবে খন্ডায়িত এবং ভিতরের নরম দেহ কাইটিন গঠিত বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত ও সুরক্ষিত।

উদাহরণ : চিথিড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, মশা, মাছি, প্রজাপতি, মথ, তেলাপোকা, শতপদী (Centipedes), হাজারপদী (Millipedes), ক্ষুদে মাকড় (Mites)



মানুষের কাছে আর্থ্রোপোডা প্রাণীদের গুরুত্ব অপরিমিত। গলদা চিথিড়ি ও বাগদা চিথিড়িসহ বিভিন্ন প্রজাতির চিথিড়ি আমিশ জাতীয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে চিথিড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগায়নে সাহায্য করে। রেশম পোকা থেকে রেশম সুতা, মৌমাছি থেকে মধু, মোম ইত্যাদি আর্থ্রোপোডা প্রাণীদের উপকারিতার উদাহরণ। অপরদিকে এ পর্বের প্রাণীরা, বিশেষ করে কীটপতঙ্গ ফসল নষ্ট করে, মারাত্মক রোগ জীবাণু বহন করে মানুষের সীমাহীন ক্ষতি করে।

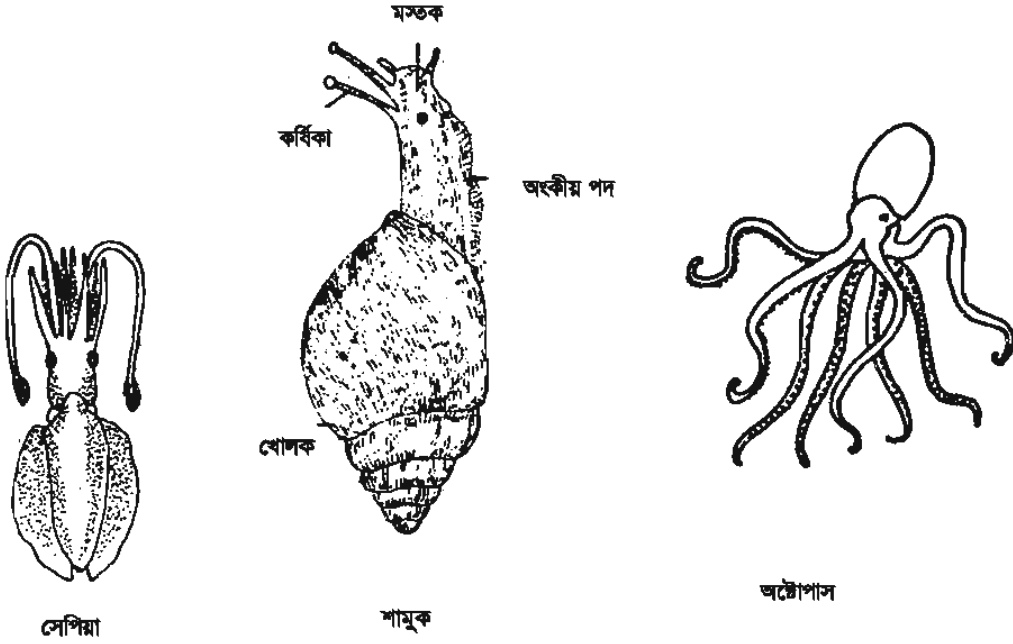
উদাহরণ : পামরী পোকা ধান গাছ নষ্ট করে, বিছা পোকা, পাটগাছ নষ্ট করে, এনোফিলিস স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু, কিউলেজ মশা গোদ রোগের জীবাণু, এডিস মশা পীতজ্বর, ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণু বহন করে। উকুন, ছারপোকা, টিকস ও মাইটস (Ticks & Mites) ইত্যাদি মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখির যথেষ্ট ক্ষতি করে। আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী উইপোকা এক ধরনের কীটপতঙ্গ যা বাড়িঘর, আসবাবপত্র ও বইপত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।



৮। মোলাস্কা (Mollusca)

দেহ অখণ্ডায়িত, নরম ও মাংসল। সাধারণত ম্যান্টল নামক পাতলা একটি আবরণ দ্বারা দেহ আবৃত এবং অনেকক্ষেত্রে এ আবরণ নিঃসৃত রস থেকে খোলক গঠিত হয়। পেশিবহুল পা দ্বারা চলাচল সম্পন্ন হয়। আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০।

উদাহরণ : শামুক, ঝিনুক, অটোপাস, সেপিয়া।



মোলাস্কা পর্বের বেশ কিছু প্রাণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। তন্মধ্যে এ পর্বের ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি উল্লেখযোগ্য। অনেক দেশে ঝিনুকের (যেমন-ওয়েস্টার) মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুক থেকে প্রাকৃতিক মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। জাহাজকীট (Shipworm) কাঠের তৈরি নৌকা, জাহাজ ফুটা করে ক্ষতিসাধন করে।

৯। ইকাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

এ পর্বের সব প্রাণী সামুদ্রিক। এদের ত্বক কাঁটায়ুক্ত। দেহে পানি সংবহন তন্ত্র থাকে এবং নালী পা চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬০০০।

উদাহরণ : তারা মাছ, সি-লিলি।

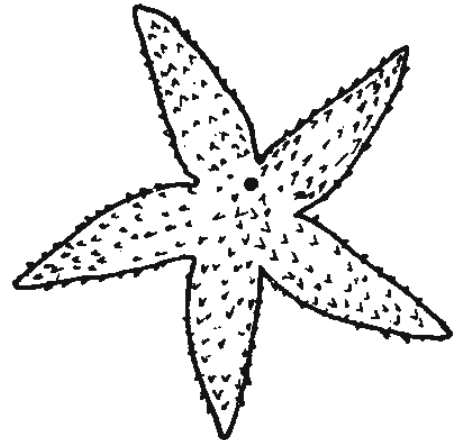
১০। কর্ডাটা (Chordata)

এ পর্বের প্রাণীতে জীবনের কোনো না কোনো সময় তিনটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে। এগুলো হল :

- ক) নটোকর্ড নামক স্থিতিস্থাপক একটি দণ্ড,
- খ) ফাঁকা পৃষ্ঠীয় শ্বাসরঞ্জক,
- গ) গলবিল অঞ্চলে ফুলকা ছিদ্র।

এ পর্বের আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬৬,০০০। কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়। যথা :

ফর্ম-১৭, মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান-৯ম



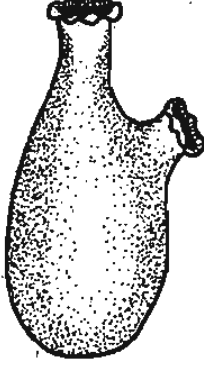
তারা মাছ

ক) ইউরোকর্ডাটা (Urochordata) : প্রাথমিক অবস্থায় নটোকর্ড, স্নায়ুরজ্জু, ফুলকা ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ : অ্যাসিডিয়া।

খ) সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata) : নটোকর্ড সারাজীবন উপস্থিত থাকে।

উদাহরণ : ব্র্যাকিওস্টোমা।



অ্যাসিডিয়া



ব্র্যাকিওস্টোমা।

গ) মেৰুদণ্ডী (Vertebrata) : কর্ভাটা পর্বের অধিকাংশ প্রাণীতে জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় নটোকর্ড উপস্থিত থাকলেও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে এটি মেৰুদণ্ডে পরিণত হয়। যে প্রাণীতে মেৰুদণ্ড থাকে তাদেরকে মেৰুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। বিবর্তনের ধারায় মেৰুদণ্ডী প্রাণীরা সবচেয়ে উন্নত। গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেৰুদণ্ডী প্রাণীদেরকে ৭টি শ্রেণীতে (Class) ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণী-১ : সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata) : এদের দেহ লম্বাটে, বাইম মাছের মতো। মুখ গোলাকার ও চোষকযুক্ত, চোয়ালবিহীন। মাছের মতো আইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে না।

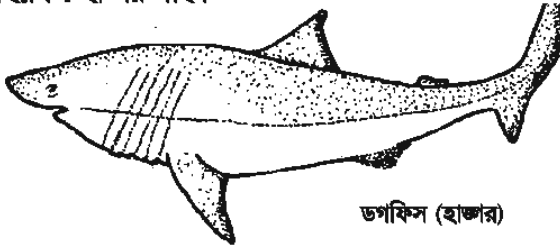
উদাহরণ : পেট্রোমাইজন।



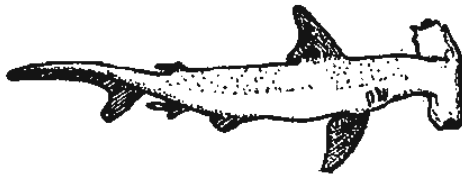
পেট্রোমাইজন

শ্রেণী-২ : কনড্রিকথিস (Chondrichthyes) : এ জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল তরুণাশ্চিময়। দেহ প্রাকয়েড ধরনের আইশে আবৃত। ৫-৭ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে এবং কোনো কানকুয়া নেই। এরা সকলেই সমুদ্রে বাস করে।

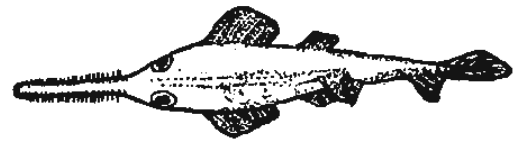
উদাহরণ : হাঙ্গার মাছ।



ডগফিস (হাঙ্গার)



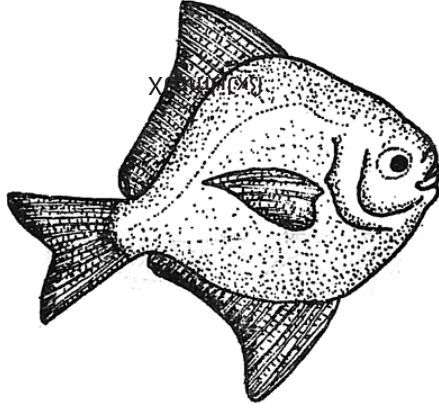
হাম্মারডি হাঙ্গার



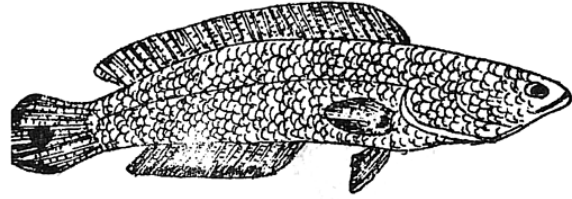
করাত হাঙ্গার

শ্রেণী-৩ : অস্টিক্‌থিস (Osteichthyes) : এ জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল অস্থি নির্মিত, দেহে সাইক্লয়েড বা টিনয়েত ধরনের আইশ থাকে, মাথার দুই পাশে ৪ জোড়া করে ফুলকা থাকে এবং কানকুয়া দ্বারা ঢাকা থাকে।

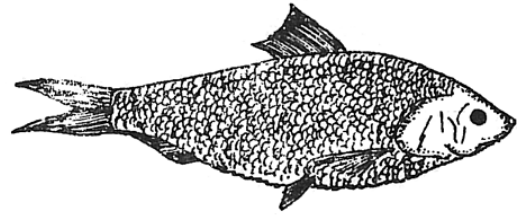
উদাহরণ : ইলিশ মাছ, কাতলা, রুই, রূপচান্দা, গজার, চিতল, উডুকু মাছ, ঘোড়া মাছ ইত্যাদি।



রূপচান্দা



টাকি



ইলিশ

মাছ (Fishes) : মাছ শীতলরক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা পানিতে বসবাসের জন্য অভিযোজিত, সাধারণত দেহ আইশ দ্বারা আবৃত, ফুলকা দ্বারা শ্বাসকার্য চালায় এবং পানিতে চলন উপযোগী জোড়া পাখনা থাকে। কনড্রিক্‌থিস ও অস্টিক্‌থিস শ্রেণীভুক্ত সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎস হিসেবে মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। মাছের যকৃতে ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’ থাকে। বাংলাদেশে প্রচুর পুকুর, ডোবা, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড় ও বিল আছে। এসমস্ত জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, মাগুর, টেংরা, পাঙ্গাস মাছ চাষের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূরীকরণসহ ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব।

শ্রেণী-৪ : উভচর (Amphibia) : এ শ্রেণীর প্রাণীদের জীবনে দুটি পর্যায় থাকে। প্রথম পর্যায়ে থাকে লার্ভা অবস্থা পর্যন্ত। এরা সাধারণত পানিতে বাস করে এবং ফুলকা দ্বারা শ্বাস কাজ চালায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রধানত ডাঙ্গায় বাস করে এবং ফুসফুস দ্বারা শ্বাস কাজ চালায়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা স্থলজ পরিবেশে বসবাস করলেও প্রজননকালে ডিম ছাড়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পানিতে আসতে হয়। জীবন চক্রের দুইটি পর্যায়ে ভিন্ন দুটি পরিবেশেই বসবাসের জন্য অভিযোজিত বলে এদেরকে উভচর প্রাণী বলা হয়। এদের ত্বক আইশবিহীন, নরম, পাতলা সিল্ক ও গ্রন্থিময়। এরা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে।

উদাহরণ : কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ।



সোনাব্যাঙ



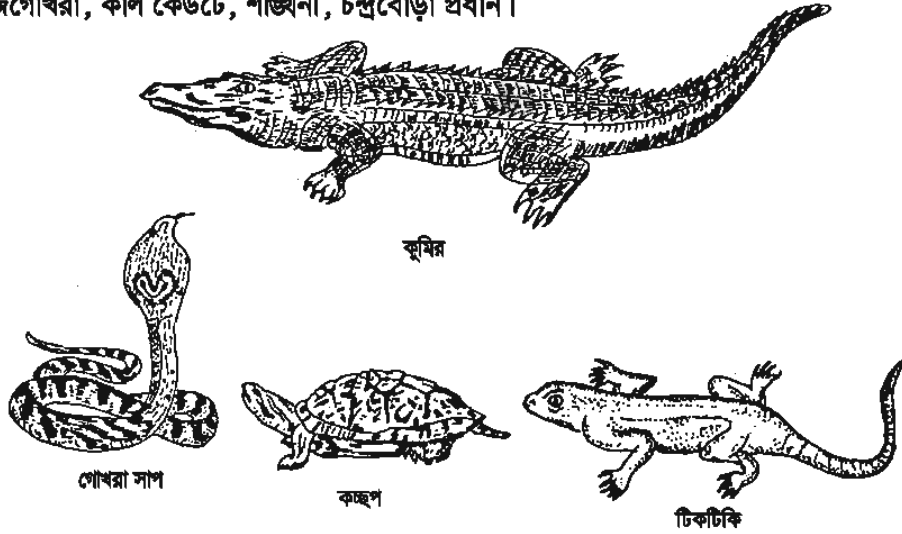
কুনোব্যাঙ

ব্যাঙ উপকারী প্রাণী। পরিবেশ সংরক্ষণে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। কুনোব্যাঙ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের উপকার করে। মশক নিধনে ব্যাঙের ভূমিকা অতুলনীয়। সোনাব্যাঙের পা বিদেশে খাদ্য হিসেবে সমাদৃত। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সোনাব্যাঙের চাষ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

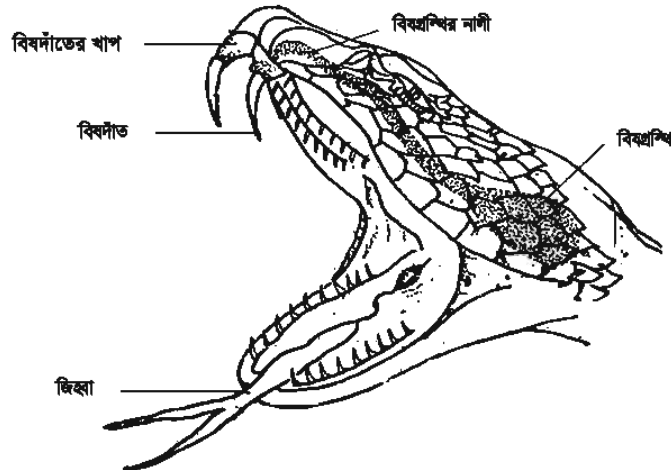
শ্রেণী-৫ : সরীসৃপ (Reptilia) : এরা বুকের ওপর ভর দিয়ে চলে এবং সম্পূর্ণভাবে স্থলে বসবাসের জন্য অভিযোজিত। দেহ ত্বক শূষ্ক ও ঝাঁশযুক্ত। দুই জোড়া পায়ের প্রতিটিতে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুল থাকে।

উদাহরণ : টিকটিকি, গোসাপ, গোখরা সাপ, কুমির, কচ্ছপ।

বিষধর সরীসৃপ : সরীসৃপের মধ্যে টিকটিকির একটি মাত্র প্রজাতি বিষধর। এর নাম গিলা মনস্টার এবং শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়। বিষধর সরীসৃপের মধ্যে সাপই প্রধান। তবে সব সাপ বিষধর নয়। বিষধর সাপের মধ্যে গোখরা, রাজগোখরা, কাল কেউটে, শঙ্খিনী, চন্দ্রবোড়া প্রধান।



সাপের বৈশিষ্ট্য : সাপ উপাঙ্গবিহীন, সরু, লম্বা দেহ এবং আঁকাবঁকা চলন সম্পন্ন সরীসৃপ। এদের কর্ণপটহ বা টিমপেনাম ও চোখের পাতা নাই। সাপ প্রকৃতপক্ষে শুনতে পায় না। দ্বিখন্ডিত লিকলিকে জিহ্বা ভ্রাণ ইন্ড্রিয়ের কাজ করে। সকল বিষধর সাপে সাধারণত দাঁতের পাশাপাশি উপরের চোয়ালে দুটি বিষদাঁত থাকে। দাঁতগুলো ফাঁপা বা নালীবিশিষ্ট এবং একজোড়া বিষথলির সাথে যুক্ত। বিষধর সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে পাশাপাশি সামান্য দূরে দুটি গভীর ছাপ থাকে কিন্তু নির্বিষ সাপ কাটলে একই সারিতে অনেকগুলো ছোট ছোট ছাপ দেখা যায়।



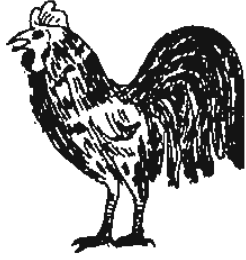
চিত্র : বিষধর সাপের (ভাইপার) বিষদাঁত ও বিষগ্রন্থি

বিষধর সাপ কাটলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যিক :

- i) ক্ষতস্থানের একটু উপরে অর্থাৎ ২-৩ ইঞ্চি উপরে রশি বা কাপড় দ্বারা দুটি শক্ত বাঁধন দিতে হবে। তবে প্রতি ৩০ মিনিট পর পর এক মিনিটের জন্য বাঁধন খুলে দিতে হবে।
- ii) ধারালো ছুরি/ব্রেড দিয়ে ক্ষত স্থান কেটে টিপে রক্ত বের করতে হবে।
- iii) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রেণী-৬ : অ্যাভিস (Aves) : এদের দেহ পালক দ্বারা আবৃত। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র পাখি এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের সামনের দুটি পা ডানায় এবং চোয়াল চঞ্চুতে পরিণত হয়েছে। উড়ার সুবিধার্থে দেহকে হালকা করার জন্য এবং শ্বসনে অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে দেহে শক্তি তৈরির জন্য দেহের ভিতরের ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে। এরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রা কমবেশি হলেও এদের দেহের তাপমাত্রা সব সময় একই থাকে। এদের দেহের বড় বড় হাড়গুলো ফাঁপা, হালকা, কিন্তু শক্ত।

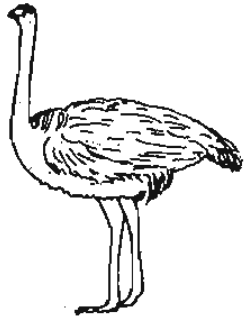
পাখি বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাখি উড়তে পারে। এদেরকে উড়বাজপাখি বলে। যেমন-বক, টিয়া, শকুন, পৈচা, ঘুঘু, দোয়েল। কিছু পাখি উড়তে পারে না। এদের পা সুগঠিত। এরা ভালোভাবে দৌড়াতে পারে। এদেরকে



মোরগ



শকুন



উটপাখি



পেঙ্গুইন



হাঁস



বক



ঘুঘুপাখি



পৈচা

দৌড়বাজ পাখি বলে। যেমন—উট পাখি। এরা পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রায় ২.২৫ মিটারের বেশি উঁচু, ১৩৫ কেজির বেশি ওজন এবং এবং ঘণ্টায় ৮০ কি.মি এর বেশি দৌড়াতে সক্ষম। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে এরা বসবাস করে। রিয়া দক্ষিণ আমেরিকা, ইমু অস্ট্রেলিয়া, ক্যাসুয়ারি নিউগিনি এবং কিউই নিউজিল্যান্ডে পাওয়া যায়। বেশ কিছু পাখি। যেমন— বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, পানিতে বসবাসের জন্য অভিযোজিত।

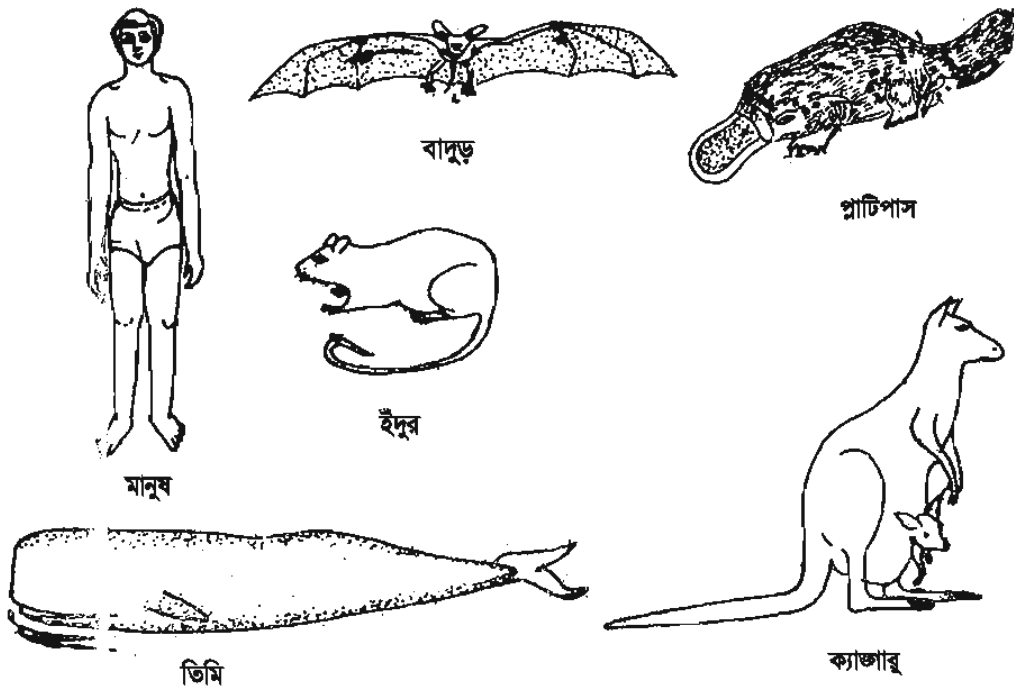
শীতের পাখি (Migratory birds) : বাংলাদেশ একটি পাখি সমৃদ্ধ দেশ। এখানে প্রায় ৬০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৪০০ স্থায়ী বাসিন্দা, আর ২০০ শীতের পাখি। হাজারে হাজারে যে সকল পাখি উত্তরের হিমালয় পর্বতমালা, ইউরোপ ও সুদূর সাইবেরিয়া থেকে শীতকালে আমাদের দেশে আসে এবং শীতের শেষে চলে যায় এরাই ‘শীতের পাখি’ বা অতিথি পাখি নামে পরিচিত।

শীতের পাখিদের মধ্যে চা পাখি, আবাবিল, খনজন, কাদাখোঁচা, চটক (Fly catcher) এবং নানা প্রজাতির হাঁস (লেনজা, নীলশীর, পাতারী, খোপা হাঁস, ভূতি হাঁস ইত্যাদি) এদেশে আসে। পাখিরা ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, ইদুর ইত্যাদি ক্ষয়সের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই এ সকল অতিথি পাখি হত্যা বা শিকার না করে, বরং এদের প্রতি যত্নবান হয়ে এদেরকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত।

শ্রেণী-৭ : স্তন্যপায়ী (Mammalia) : এ শ্রেণীর প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দেহ লোম দ্বারা আবৃত এবং স্তনগ্রন্থি থাকে। কিছু ব্যতিক্রমধর্মী স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া এরা সবই সন্তান প্রসব করে এবং স্তনগ্রন্থি নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা সন্তান লালন করে। এরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট। এদের হৃদযন্ত্র চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। দেহ গহ্বরে আড়াআড়িভাবে মধ্যচ্ছদা পর্দা থাকে। উভয় চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে এবং উট ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্ত কণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।

উদাহরণ : গরু, সিংহ, গিনিপিগ, শূকর, বাঘ, হাতি, পাখা, তিমি, বাদুড়, ইদুর, বানর, মানুষ, শূশুক ইত্যাদি। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করে তবে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে স্তন্যপায়ীদের একটি দল বাস করে যারা ডিম পাড়ে। এদেরকে মনোট্রিমাটা বলে। অবশ্য ডিমগুলো ফুটে যে বাচ্চা হয় তা মাতৃদুগ্ধ পান করে।

উদাহরণ : প্রাটিপাস এবং কণ্টকযুক্ত পিগীলিকাভুস্ত।



স্তন্যপায়ীদের আর একটি দল আছে যাদেরকে মারসুপিয়াল বলে। এদের স্ত্রী প্রাণীর উদরে মারসুপিয়াম নামক একটি থলি থাকে। থলির ভিতর স্তনগ্রন্থি থাকে। সন্তান অপরিণত অবস্থায় জরায়ু থেকে বের হয়ে মারসুপিয়ামে অবস্থান করে এবং স্তনগ্রন্থি মুখ দ্বারা ধরে রাখে। উদাহরণ—ক্যাজারু। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের বসবাস।

মানুষ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীকে যুগ যুগ থেকে গৃহপালিত পশু হিসেবে নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে। এদের মধ্যে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমিষ জাতীয় খাদ্য ও চামড়া সরবরাহের জন্য স্তন্যপায়ীদের তুলনা নেই। বিভিন্ন পশু থেকে পশম সংগ্রহের মাধ্যমেও মানুষ উপকৃত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুরই মানুষের প্রধান শত্রু। ফসল নষ্ট করে এরা আমাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি করে।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

কর্ডাটা পর্বের এই মেরুদণ্ডী উপপর্বের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রাণিজগতের মধ্যে উন্নত প্রাণী বলে বিবেচিত। আর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানুষই হল অনন্য। মানুষের মস্তিষ্ক সর্বাধিক উন্নত। মস্তিষ্কের এ উৎকর্ষ তথা বুদ্ধি বিকাশের কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হল মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারা, হাত দিয়ে ঝাঁকড়ে ধরার ক্ষমতা এবং নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ক্ষমতা।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী

মানুষের গৃহপালিত নয় এবং মানুষের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকে এমন সব উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদেরকে বন্যপ্রাণী বলে। বন্যপ্রাণীরা শুধু বনে থাকে না। হাওর-বাঁওড়, বিল-পুকুর, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, দ্বীপাঞ্চল, বসতবাড়ি সংলগ্ন বোপ-ঝাড়সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা বাস করে। বন্যপ্রাণী একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

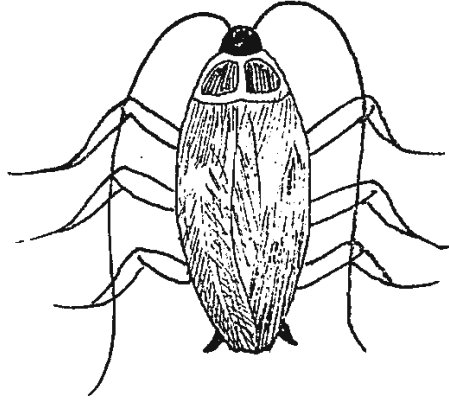
গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে গঁড়ার, বুনোমোষ, বারসিঙ্গা, পারা হরিণ, নীলগাই, নেকড়ে, গৌর, বান্টিং নামক বনগরু, লালশির হাঁস, ময়ূর, মেছোকুমির ইত্যাদি প্রধান।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৮৫০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী আছে। এদের মধ্যে ১০০-১৫০ প্রজাতির প্রাণীকে জরুরীভিত্তিতে সংরক্ষণে ব্যবস্থা করতে না পারলে শীঘ্রই এরা বাংলাদেশের মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ সব বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ডোরা বাঘ (Royal Bengal Tiger), চিতাবাঘা, বাগদাস, খাটাশ, খেকশেয়াল, চিত্রাহরিণ, কাঠবিড়ালী, বনরুই, লজ্জাবতী বানর, উল্লুক, শকুন, পেঁচা, বনমোরগ, হাড়গিলা, মদনটেক, ডাহুকপাখি, কোড়া ধনেশপাখি, ঘড়িয়াল, লোনা পানির কুমির, অজগর সাপ, বড় কাইটো, কোলাব্যাং ইত্যাদি প্রধান।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বন্যপ্রাণী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার করে। যথা—

- ১। বন্যপ্রাণী থেকে মাংস, চামড়া, পালক, দাঁত, শিং, হাড় সংগ্রহ।
- ২। বন্যপ্রাণীকে ভারবহনের কাজে ব্যবহার।
- ৩। বন্যপ্রাণী থেকে ওষুধ সংগ্রহ।
- ৪। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বন্যপ্রাণীর ব্যবহার।
- ৫। বন্যপ্রাণী পোষা মানুষের একটি শখ।
- ৬। পচা আবর্জনা পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে।
- ৭। বন্যপ্রাণী শিকারের মাধ্যমে আনন্দ লাভ।
- ৮। পরিকল্পিতভাবে ব্যবসা ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশ ও নিজের আর্থিক লাভ।



উপরের চিত্র থেকে ৪ নং এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৪। প্রাণীটি কোন পর্বের?

ক. Cnidaria

খ. Platyhelminthes

গ. Arthropoda

ঘ. Mollusca

৫। চিত্রে প্রদর্শিত প্রাণীটি যে পর্বের তার সাথে কর্ডাটা পর্বের প্রাণীর পার্থক্য হল—

(i). কর্ডাটা পর্বের প্রাণী মেরুদণ্ডযুক্ত কিন্তু এটি মেরুদণ্ডহীন।

(ii). কর্ডাটা পর্বের প্রাণী দ্বিপদী কিন্তু এটি সন্ধিপদী।

(iii). কর্ডাটা পর্বের প্রাণী বাচ্চা প্রসব করে কিন্তু এরা বাচ্চা প্রসব করে না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রতি বছর শীতকালে জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জলাশয়ে প্রচুর পাখি আসে। পাখিগুলোর বেশির ভাগই নানা প্রজাতির হাঁস। শীতকালের শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত এরা অবস্থান করে। গরমের শুরুতে চলে যায়। শুধু জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নয় ঢাকা চিড়িয়াখানার জলাশয়েও এ ধরনের পাখি দেখা যায়।

ক. এ পাখিগুলো কী নামে পরিচিত?

খ. পাখিগুলো এ সময়ে আসার কারণ কী?

গ. দেশের সব জলাশয়ে এ ধরনের পাখিদের দেখা যায় না কেন?

ঘ. ‘শুধু আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগই বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যথেষ্ট নয়’—তোমার মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবদেহ বৈচিত্র্য

মানুষ শুধু প্রাণিজগতের নয়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। বৃক্ষমস্তার জন্য পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষের বৃক্ষমস্তার জন্য মস্তিষ্কই মূল অঙ্গ। একই সাথে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং এদের সমন্বিত কার্যপ্রণালী মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সাহায্য করেছে।

অন্যান্য বহুকোষী জীবের মতো মানুষও ভ্রূণ অবস্থা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তার আকৃতি পেয়েছে। আকৃতি ও কার্যগত দিক থেকে কিছু কোষ দলবদ্ধভাবে কলা গঠন করে। বিভিন্ন কলা সমন্বয়ে অঙ্গ গঠিত হয় এবং কয়েকটি অঙ্গ সম্মিলিতভাবে তন্ত্র গঠন করে। মানুষের এ তন্ত্রগুলোর প্রত্যেকটির সমন্বিত এবং সুশৃঙ্খল কর্ম সম্পাদনের কারণেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এ ছাড়াও মানুষ বিচার, বৃদ্ধিসম্পন্ন। এ অধ্যায়ে মানুষের সকল তন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল। যথা—

কঙ্কালতন্ত্র

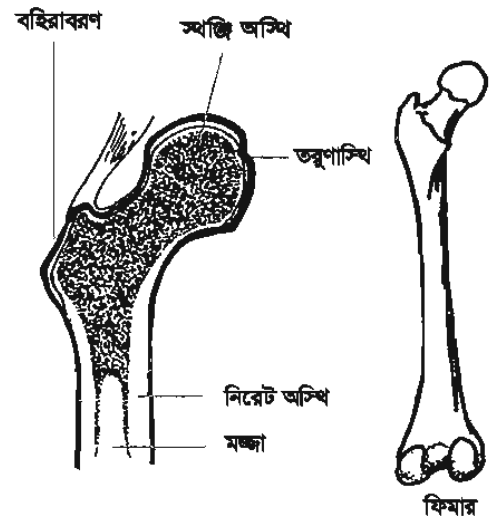
অস্থি ও তরুণাস্থি সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো গঠনের মাধ্যমে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে এবং বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানবদেহের কঙ্কাল মূলত অন্তঃকঙ্কাল। বাইরে থেকে অন্তঃকঙ্কাল দেখা যায় না।

কঙ্কালের গঠন

অস্থি ও তরুণাস্থি নিয়ে কঙ্কাল গঠিত।

অস্থি বা হাড় : জীবিত অস্থি কোষ এবং অজৈব যৌগ অস্থি সমন্বয়ে গঠিত। অজৈব যৌগের মধ্যে প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থির ৪০-৪৫ ভাগই পানি। সকল অস্থিতে রক্ত, লসিকা ও স্নায়ু সরবরাহ থাকে।

মানবদেহের অস্থিগুলো বিভিন্নভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অন্তঃকঙ্কাল তৈরি করেছে। দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বা গাঁট বলে। কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারেই অনড়। যেমন—করোটির অস্থিসন্ধি; কোনোটি আবার সামান্য নড়াচড়া করতে পারে। যেমন—কশেরুকাগুলোর মধ্যে সন্ধি। এছাড়া দেহে প্রায় ৭০টিরও বেশি স্বচ্ছন্দে সংগলনক্ষম বা সাইনোভিয়াল সন্ধি আছে। সাইনোভিয়াল সন্ধিতে অস্থি দুটি তন্তুময় বিদ্রি বা লিগামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের সন্ধিতে সাইনোভিয়াল রস নামক এক প্রকার তৈলাক্ত রস থাকায় দুটি অস্থি সহজে নড়াচড়া করতে পারে। কনুইয়ের সন্ধি, স্কল্ল সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির উদাহরণ।



চিত্র ১২.১ : একটি লম্বা অস্থি (লম্বাজ্হেদ)

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ : কঙ্কালতন্ত্রের কাজ নিম্নরূপ :

১। দেহ কাঠামো : কঙ্কালতন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

২। রক্ষণাবেক্ষণ : মস্তিষ্ক, সুস্থলাকাড, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি নরম অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

৩। চলাচল : পেশিসমূহ বিভিন্ন অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। ফলে পেশি সংকোচন প্রসারণ সম্ভব হয়। আর পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলেই অস্থি চালিত হয়ে চলন সংঘটিত হয়।

৪। লোহিত রক্ত কণিকা গঠন : কতকগুলো অস্থির লাল অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি হয়।

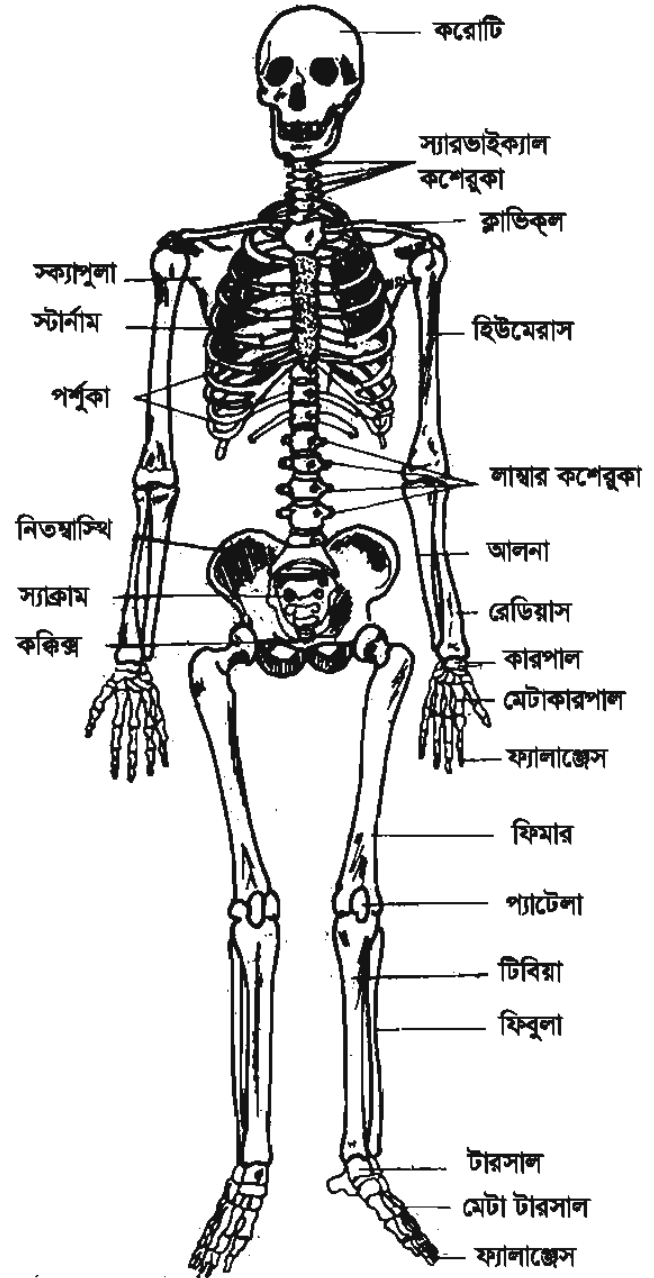
৫। সঞ্চয় : ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চয় করে।

অস্থিবিন্যাস

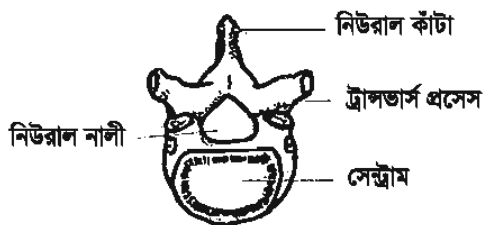
২০৬টি অস্থি পরস্পর সংযুক্তির ফলে মানুষের অন্তঃকঙ্কাল (চিত্র : ১২.২) সৃষ্টি হয়েছে। অস্থি বিন্যাস অনুযায়ী অন্তঃকঙ্কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ক্রোটি : মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকার উপর অবস্থিত ২৯টি শক্ত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত গোলাকার কাঁপা প্রকোষ্ঠকে ক্রোটি বা মাথার খুলি বলে। ক্রোটি ক্রোটিকা নামক প্রকোষ্ঠে মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া চোয়াল, ইন্দ্রিয় কোটর (নাক, কান, চোখ) ক্রোটিতে বিদ্যমান। ক্রোটির পেছনে ও নিম্নে অবস্থিত ফোরামেন ম্যাগনাম নামক ছিদ্র পথে মস্তিষ্কের পশ্চাদগ্রাস্ত থেকে সুস্থলাকাড বের হয়।

২। মেরুদণ্ড : ক্রোটির পেছন ও নিম্নভাগ থেকে শুরু করে দেহের পৃষ্ঠ রেখা বরাবর ৩৩টি অস্থি খণ্ড পর পর যুক্ত হয়ে মেরুদণ্ড গঠন করে। প্রতিটি অস্থি খণ্ডকে কশেরুকা (Vertebra) বলে।



চিত্র ১২.২ : কঙ্কালতন্ত্র



চিত্র ১২.৩ : খোরাসিক কশেরুকা

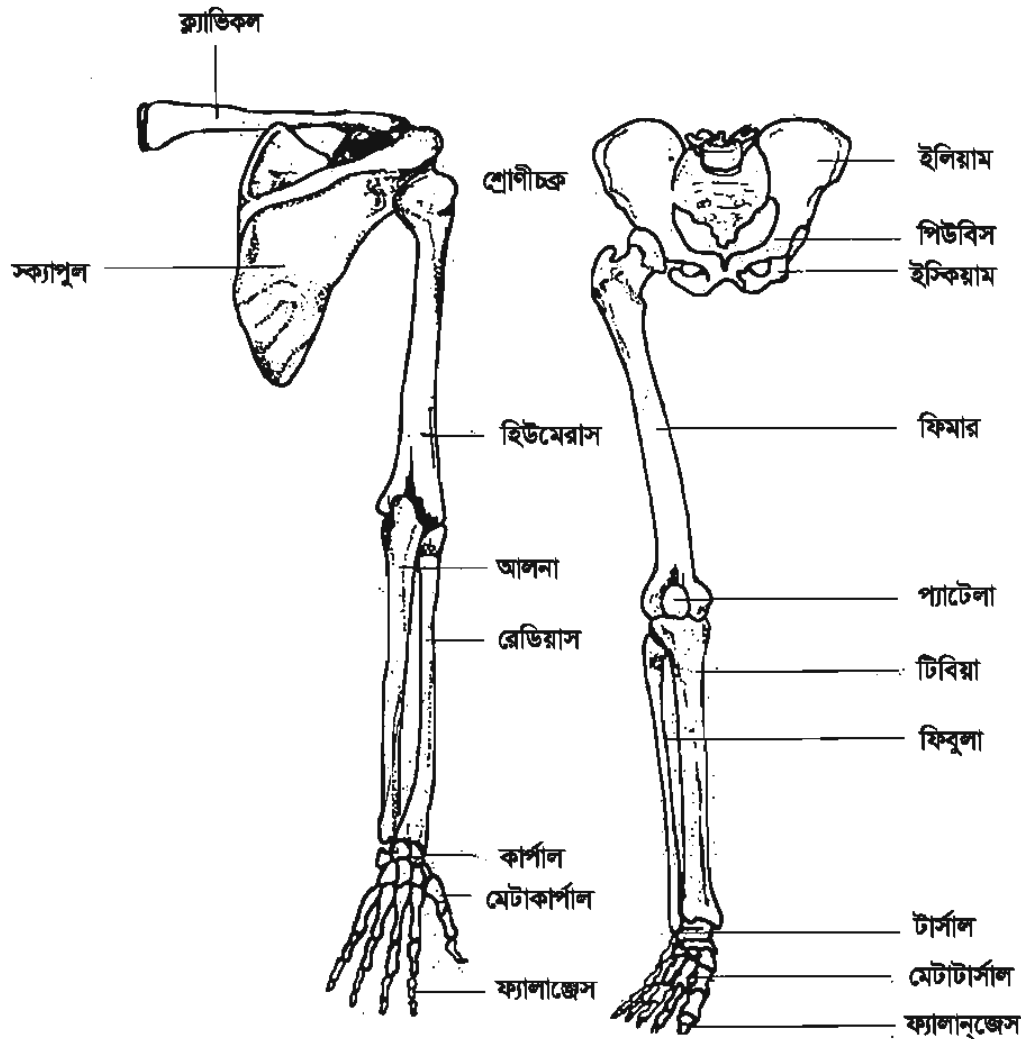
একটি কশেরুকার (চিত্র ১২.৩) মূল দেহকে সেন্ট্রাম বলে। প্রতিটি কশেরুকায় একটি নলাকার ছিদ্র থাকে। একে নিউরাল নালী (Neural canal) বলে। কশেরুকাগুলোর নিউরাল নালীসমূহ একটি অবিচ্ছিন্ন নালী গঠন করে। এর মধ্যে সুস্থলাকাড (Spinal cord) অবস্থান করে। এছাড়া কশেরুকায় নিউরাল কাঁটা এবং ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে। অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- হীবাদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ৭টি এবং হীবাদেশে অবস্থিত।
- বক্ষদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ১২টি এবং বক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত। বক্ষ অঞ্চলে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে। বক্ষপিঞ্জরে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস সুরক্ষিত থাকে।
- কটিদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ৫টি। এগুলো কটি বা নিতম্ব অঞ্চলে অবস্থিত।
- শ্রোণীদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ৫টি। কশেরুকাগুলো মিলিত হয়ে স্যাক্রাম গঠন করে।
- পৃষ্ঠদেশীয় কশেরুকা : এদের সংখ্যা ৪টি এবং মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কশেরুকাগুলো একত্রে সংযুক্ত হয়ে কক্সিজ গঠন করে।

মেরুদণ্ডের কাজ

মেরুদণ্ড দেহের ভার বহন করে, সুস্থলাকাডকে বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, বক্ষপিঞ্জর গঠনে অংশ নেয় এবং পেশি সংযোজনের স্থান দিয়ে চলাচলে সাহায্য করে।

৩। উর্ধ্বাঙ্গ (চিত্র ১২.৪) : বক্ষ অস্থিচক্র এবং বাহু সমন্বয়ে উর্ধ্বাঙ্গ গঠিত।



চিত্র ১২.৪ : উর্ধ্বাঙ্গ

চিত্র ১২.৫ : নিম্নাঙ্গ

বক্ষঅস্থি চক্র : বক্ষঅস্থি চক্রের সংখ্যা ২টি এবং এরা পৃথক। এ চক্রের মাধ্যমে বাহু মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি বক্ষ অস্থি চক্র স্কাপুলা ও ক্লাভিকল দিয়ে গঠিত। স্কাপুলার এক প্রান্তে একটি গর্তে হিউমেরাস সংযুক্ত থাকে।

বাহু : প্রতিটি বাহু নিম্নলিখিত অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।

(ক) হিউমেরাস : কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত অস্থিটি হিউমেরাস।

(খ) রেডিও-আলনা : কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি অস্থির একটি রেডিয়াস এবং অপরটি আলনা।

(গ) কার্পাল : রেডিও-আলনার নিচের দিকে দুই সারিতে ৮টি ছোট ছোট অস্থিকে কার্পাল অস্থি বলে। কার্পাল অস্থিগুলো কবজি বা মণিবন্ধ গঠন করে।

(ঘ) মেটা কার্পাল : কার্পাল অস্থির সাথে যুক্ত ৫টি সরু লম্বা সামান্য বড় অস্থিকে মেটাকার্পাল বলে। এরা হাতের তালু বা করতল গঠন করে।

(ঙ) ফ্যালাঞ্জেস : হাতের আঙুলের অস্থিগুলোকে ফ্যালাঞ্জেস বলে। এদের সংখ্যা ১৪।

৪। নিম্নাঙ্গ (চিত্র ১২.৫) : শ্রোণীচক্র ও পায়ের সমন্বয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত।

শ্রোণীচক্র : ইলিয়াম, ইস্কিয়াম ও পিউবিস নিয়ে শ্রোণীচক্র গঠিত। অস্থিসমূহ একত্রিত হয়ে নিতম্বাস্থি এবং দুটি নিতম্বাস্থি একত্রে মিলিত হয়ে শ্রোণীচক্র গঠন করে। দুটি নিতম্বাস্থির মধ্যখানে স্যাক্রাম ও কক্সিজ অবস্থিত।

শ্রোণীচক্রের গর্তে ফিমার সংযুক্ত থাকে।

পা : প্রতিটি পা নিম্নলিখিত অস্থি সমন্বয়ে গঠিত :

(ক) ফিমার : নিতম্ব থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত মানবদেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘ অস্থিটি ফিমার বা উরু অস্থি।

(খ) টিবিও-ফিবুলা : হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি অস্থির একটি টিবিয়া এবং অপরটি ফিবুলা। টিবিও-ফিবুলা এবং ফিমার অস্থির সংযোগ স্থানের সামনে গোলাকার অস্থিটির নাম প্যাটেলা।

(গ) টার্সাল : টিবিও-ফিবুলার নিচের দিকে ৭টি ছোট ছোট অস্থিকে টার্সাল বা গুঁফা অস্থি বলে। টার্সাল অস্থিগুলো পায়ের গোড়ালি গঠন করে।

(ঘ) মেটাটার্সাল : টার্সাল অস্থির সাথে যুক্ত ৫টি লম্বা অস্থিকে মেটাটার্সাল অস্থি বলে। এরা পায়ের পাতা বা পদতল গঠন করে।

(ঙ) ফ্যালানজেস : পায়ের আঙুলের অস্থিগুলোকে ফ্যালানজেস বলে। এদের সংখ্যা ১৪।

পেশিতন্ত্র

পেশি : কোষ দ্বারা পেশিকলা গঠিত। মানব দেহের মোট ওজনের ৪০-৫০ ভাগ অংশই পেশি কলা। তিন ধরনের পেশি সমন্বয়ে দেহের পেশিতন্ত্র গঠিত।

ক) ঐচ্ছিক পেশি : যে পেশির কাজ ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। দেহকে নড়াচড়া ও চলনে সাহায্য করে বলে এ ধরনের পেশিকে কঙ্কাল পেশিও বলা হয়। ঐচ্ছিক পেশিই মাংস নামে পরিচিত। বড় বড় অস্থির সংযোগ স্থলে এ পেশি থাকে।

খ) অনৈচ্ছিক পেশি : যে পেশির কাজ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে অনৈচ্ছিক পেশি বলে। পৌষ্টিক নালী, রক্ত নালী, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গ প্রাচীরে এ পেশি থাকে।

গ) হৃদপেশি : হৃদযন্ত্রের প্রাচীরে বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃদপেশি বলে। হৃদযন্ত্রের সংকোচন প্রসারণ ঘটিয়ে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হৃদপেশির কাজ।

কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্রের সম্পর্ক : কঙ্কালের সাথে পেশির একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। টেনডন-এর মাধ্যমে পেশি হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে। পেশির সংকোচনের ফলেই চলাচল এবং বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সম্ভব হয়।

কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও অসুবিধাসমূহ

রিকেটস : শরীরে ভিটামিন “ডি” এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে বাড়ন্ত শিশুদের রিকেট রোগ হয়। এ রোগে অস্থি স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না। অনেক সময় অস্থি বাঁকা হয়ে যায়। সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং উপযুক্ত পরিচর্যা দ্বারা এ রোগ প্রতিহত করা সম্ভব।

আরথ্রাইটিস বা গাঁটের ব্যথা : এ রোগে অস্থি সন্ধিতে প্রদাহ বা ব্যথা হয়, অস্থি সন্ধিগুলো নাড়ানো যায় না। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা দ্বারা এ রোগ থেকে বাঁচা সম্ভব।

অস্থির স্থানচ্যুতি এবং অস্থি ভেঙে যাওয়া : হঠাৎ কোনো আঘাত বা মাত্রাতিরিক্ত চাপে কোনো অস্থি সঠিক স্থান থেকে সরে যেতে পারে কিংবা ভেঙে বা ফেটে যেতে পারে। অস্থির স্থানচ্যুতির ফলে লিগামেন্ট এবং পেশির ক্ষতি হয়। অস্থি ভেঙে গেলে বা স্থানচ্যুত হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জরুরিভাবে দক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ আবশ্যিক।

পৌষ্টিক তন্ত্র

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাদের অধিকাংশই জটিল খাদ্য। এ জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর শোষণ করে সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের গ্রহণ উপযোগী দ্রবণীয়, সরল ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। পরিপাকের ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্য নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে আমিষ জাতীয় খাদ্য অ্যামিনো এসিডে এবং ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়।

যে তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে। পৌষ্টিক তন্ত্র (চিত্র ১২.৬) দুইটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। যথা) (১) পৌষ্টিক নালী (২) পৌষ্টিক গ্রন্থি।

পৌষ্টিক নালী

মানুষের পৌষ্টিক নালী মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটি প্যাঁচানো নালী এবং নিম্নোক্ত অংশ নিয়ে গঠিত :

ক) মুখছিদ্র (Mouth aperture) : নাকের ঠিক নিচে দুইটি ঠোঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ছিদ্র। এখান থেকেই পৌষ্টিক নালীর শুরুর।

কাজ : মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহীত হয়।

খ) মুখ-গহ্বর (Buccal cavity) : মুখ ছিদ্রের পেছনের গহ্বরটি মুখ-গহ্বর নামে পরিচিত। মুখ-গহ্বরের ভেতরে বিভিন্ন প্রকারের দাঁতসহ দুইটি চোয়াল, গ্রন্থিময় মাংসল একটি জিহ্বা এবং তিনজোড়া লালগ্রন্থি থাকে। লাল গ্রন্থিসমূহ পৃথক পৃথক নালীর মাধ্যমে মুখ-গহ্বরের সাথে যুক্ত।

কাজ

১। দাঁতের সাহায্যে খাদ্যবস্তু কর্তন ও পেষণ করা হয়।

২। জিহ্বা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যদ্রব্যকে গিলতে সাহায্য করে।

৩। লাল গ্রন্থির লালার খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং হজমে সাহায্য করে।

গ) গলবিদ্য : মুখ গহ্বরের পরের অংশকে গলবিদ্য বলে।

কাজ : মুখ গহ্বরের খাদ্যবস্তু গলবিদ্যের মাধ্যমে অনুনালীতে পৌঁছে।

ঘ) অনুনালী : গলবিদ্যের পরে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার একটি নালী। এটি পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাজ : খাদ্যবস্তু এ নালীপথে পাকস্থলীতে পৌঁছে।

ঙ) পাকস্থলী : পাকস্থলী একটি থলে আকৃতির অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশীবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নামক প্রচুর গ্রন্থি থাকে।

কাজ

(ক) খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

(খ) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচক রস পরিপাকে সাহায্য করে।

(চ) অঙ্গ : পাকস্থলীর পরের অংশ অঙ্গ। এটি একটি লম্বা প্যাচানো নালী। অঙ্গ, প্রধান দুটি অংশে বিভক্ত যথা—

১. ক্ষুদ্রান্ত (Small intestine) : পাকস্থলীর পর থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত লম্বা, প্যাচানো নালীটিকে ক্ষুদ্রান্ত বলে। ক্ষুদ্রান্ত আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— ডিওডেনাম, জেজুনা এবং ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনাম অংশের সাধারণ পিষ্ট নালী যুক্ত। সাধারণ পিষ্টনালীর মাধ্যমে যকৃৎের পিষ্টরস এবং অগ্নাশয়ের অগ্নাশয় রস ডিওডেনামে আসে। ক্ষুদ্রান্তের ইলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীরের ভিলাস (Villus) এ আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে।

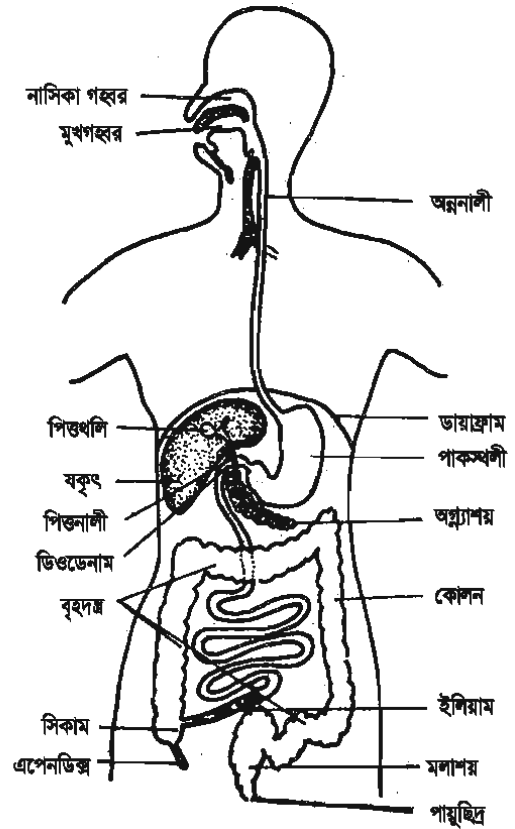
কাজ : খাদ্য পরিপাক ও পরিশোধন ক্ষুদ্রান্তের প্রধান কাজ।

২। বৃহদন্ত্র (Large intestine) : ইলিয়ামের পর থেকে পায়ু পর্যন্ত মোটা নলাকৃতি অংশই বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্রের ৩টি অংশ। যথা—সিকাম, কোলন এবং মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিকস নামক একটি প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে।

কাজ : বৃহদন্ত্রে পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং সাময়িকভাবে মল জমা থাকে।

ছ) পায়ু : পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশে অবস্থিত ছিদ্র পথকে পায়ু বলে।

কাজ : মল নিষ্কাশন।



চিত্র ১২.৬ পরিপাকতন্ত্র

পৌষ্টিক গ্রন্থি : যে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলা হয়। মানব দেহের পরিপাক গ্রন্থিসমূহ নিম্নরূপ :

ক) **লালাগ্রন্থি :** মানুষের মুখ গহ্বরে প্যারোটাইড গ্রন্থি, সাব-লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এবং সাব-ম্যান্ডিবুলার লালাগ্রন্থিসমূহ পৃথক পৃথক নালীর মাধ্যমে মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত।

লালাগ্রন্থির নিঃসৃত রসের নাম লালারস। লালারসে পানি এবং টায়ালিন নামক এনজাইম থাকে।

খ) **যকৃৎ :** মধ্যচ্ছদার নিচে এবং পাকস্থলী ডান পাশে অবস্থিত যকৃৎ দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। যকৃতের সাথে একটি পিত্তথলি যুক্ত থাকে। যকৃতে সৃষ্ট পিত্ত নামক সবুজ রঙের এক প্রকার রস পিত্তথলিতে জমা থাকে। এ রস পিত্তথলি থেকে সাধারণ পিত্তনালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে আসে। যকৃৎ পিত্তরস তৈরি ছাড়াও অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চয় করাসহ অনেক কাজ করে।

(গ) **অগ্ন্যাশয় :** পাকস্থলী ও ডিওডেনামের নিচে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত রসকে অগ্ন্যাশয় রস (pancreatic juice) বলে। এ রস অগ্ন্যাশয় নালী তথা সাধারণ পিত্তনালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে আসে। অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নামক একটি হরমোনও তৈরি করে।

(ঘ) **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি :** গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস।

(ঙ) **আন্ত্রিক গ্রন্থি :** ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের ভিলাসে পচুর আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস।

এনজাইম

এনজাইম হল জৈব রাসায়নিক ও আমিষ জাতীয় পদার্থ। জীবিত কোষের ভিতরে এনজাইম তৈরি হয়।

এনজাইমের কাজ

- ক) এনজাইম জৈব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।
- খ) একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত এনজাইম ভাল কাজ করে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অতিক্রম করলে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়।
- গ) নির্দিষ্ট এনজাইম নির্দিষ্ট কাজ করে। যেমন-ট্রিপসিন এনজাইম শুধুমাত্র আমিষের ওপর ক্রিয়া করে।
- ঘ) একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অম্লীয় বা ক্ষারীয় পরিবেশে বেশি কাজ করে।

দাঁত

দাঁত : দেহের সবচেয়ে শক্ত অংশ হলো দাঁত। মুখ গহ্বরে উপরের ও নিচের চোয়ালের প্রতিটিতে সাধারণত ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানব দেহে দু'বার দাঁত ওঠে। প্রথমবার-শিশু কালে দুধ দাঁত, দ্বিতীয় বার দুধ দাঁত পড়ে গিয়ে আঠার বছর বয়সের মধ্যে স্থায়ী দাঁত ওঠে।

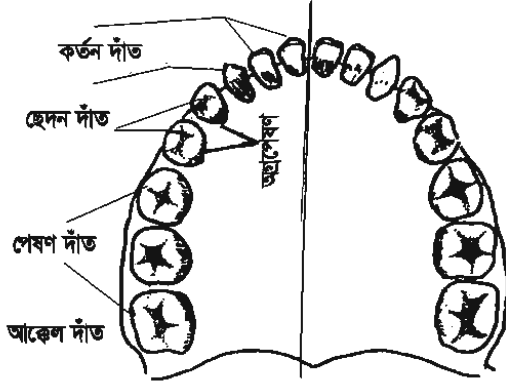
মানুষের স্থায়ী দাঁত চার প্রকার। যথা—

ক) **কর্তন দাঁত :** এ দাঁত দ্বারা খাবার কাটা বা টুকরা করা যায়।

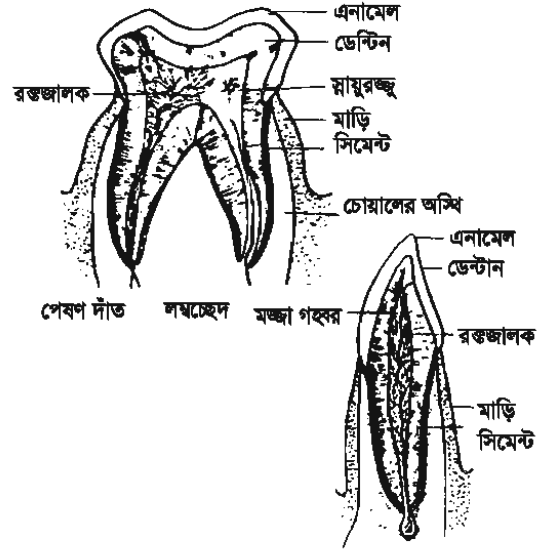
খ) **ছেদন দাঁত :** এ দাঁত দ্বারা খাবার ছেঁড়া হয়।

গ) অগ্রপেষণ দাঁত : এ দাঁত দ্বারা খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করা যায়।

ঘ) পেষণ দাঁত : দাঁতগুলো খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১২.৭ : উপরের চোয়ালের দন্ত বিন্যাস



চিত্র ১২.৮ : দাঁতের লম্বচ্ছেদ

প্রতিটি চোয়ালের (চিত্র ১২.৭) অর্ধাংশে ২টি কর্তন, ১টি ছেদন, ২টি অগ্রপেষণ এবং ৩টি করে পেষণ দাঁত থাকে।

প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে, যথা—

ক) মাড়ির উপরের অংশ : মুকুট

খ) মাড়ির ভিতরের অংশ : মূল এবং

গ) মুকুট ও মূলের মধ্যবর্তী অংশ : দাঁতের গ্রীবা

দাঁতের গঠন : প্রতিটি দাঁত (চিত্র ১২.৮) যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত তা নিম্নরূপ :

ক) ডেন্টিন : দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দ্বারা গঠিত।

খ) এনামেল : মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল ও ডেন্টিন ক্যালসিয়াম-ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ফ্লোরাইড দ্বারা তৈরি।

গ) দস্তমজ্জা : ডেন্টিনের ভিতরে সূক্ষ্ম ধমনী, শিরা, স্নায়ু ও নরম কোষসহ বস্তুকে দস্তমজ্জা বলে। দস্তমজ্জা দাঁতের ফাঁপা অংশে থাকে। দস্তমজ্জার মাধ্যমে ডেন্টিন অংশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

ঘ) সিমেন্ট : দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিন, সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণে আবৃত থাকে। এ সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথেও আটকানো থাকে।

দাঁতের রোগ : খাদ্য গ্রহণের পর দাঁতের উপর খাদ্য, লালা এবং ব্যাকটেরিয়া সমন্বয়ে একটি আঠালো আবরণ তৈরি হয়। এ আবরণকে প্লাক বলে। দাঁত এবং মাড়ির সংযোগ স্থলেও প্লাক তৈরি হতে পারে। প্লাক এর কারণে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে ডেন্টিন অংশে গর্ত সৃষ্টি হয় এবং মাড়ির দাঁতের সংযুক্তি নষ্ট হয়। ফলে অকালে দাঁত পড়ে যায়।

দাঁতের যত্ন : সকালে ও রাতে খাবারের পর নিয়মিতভাবে দাঁত মাজলে দস্তমজ্জা রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া

মুখে পরিপাক : মুখ গহ্বরে খাবার জিহ্বা ও দাঁতের সাহায্যে চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।

একই সাথে লাল গ্রন্থির নিঃসৃত লাল খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়। লাল খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালায় স্যালাভারী এমাইলেজ বা টায়ালিন নামক একটি এনজাইম থাকে। স্যালাভারী এনজাইম শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে।

মুখ থেকে খাদ্যবস্তু পেরিষ্টালিসিস প্রক্রিয়ায় অনুনালীর মাধ্যমে পাকস্থলীতে আসে। পৌষ্টিক নালীর গাত্রের মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে খাদ্যের সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে পেরিষ্টালিসিস বলে।

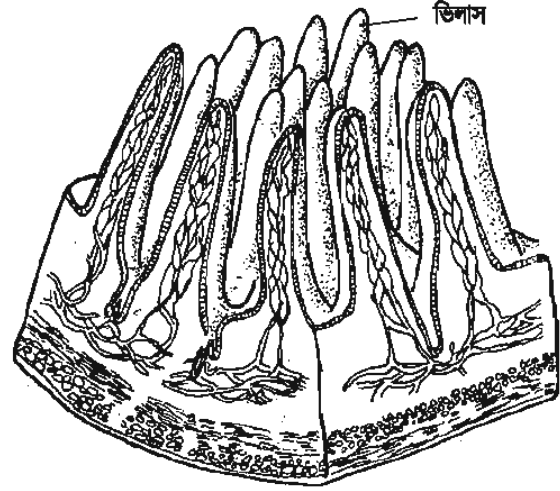
পাকস্থলীতে পরিপাক : পাকস্থলীতে খাদ্য আসার পর প্রাচীরের গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস খাদ্যের ওপর ক্রিয়া করে।

গ্যাস্ট্রিক রসে প্রধানত তিনটি উপাদান থাকে :

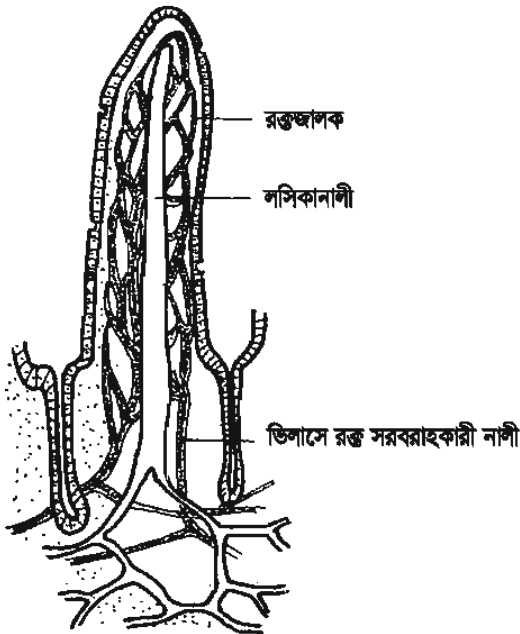
(ক) হাইড্রোক্লোরিক এসিড : হাইড্রোক্লোরিক এসিড জীবাণু ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। এছাড়া পেপসিনের কাজের জন্য অম্লীয় পরিবেশ তৈরি করে।

(খ) পেপসিন : এটি একটি এনজাইম। পেপসিন আমিষকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

(গ) রেনিন : এ এনজাইম দুধের আমিষ জাতীয় খাদ্য ক্যাসিনকে প্যারাক্যাসিনে পরিণত করে। পাকস্থলীর সংকোচন প্রসারণে গ্যাস্ট্রিক রস খাদ্যের সাথে মিশ্রণ ও ক্রিয়ার ফলে খাদ্য বস্তু নরম ও তরল অবস্থায় পরিণত হয়। একে কাইম বলে। কাইম অল্প অল্প করে পাকস্থলী থেকে অগ্নি প্রবেশ করে।



চিত্র ১২.৯ : ইলিয়ামের গঠন



চিত্র ১২.১০ : ডিলাসের গঠন

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ বা ডিওডেনামে খাদ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পিষ্টনালীর মাধ্যমে পিষ্টনথলিতে জমাকৃত পিষ্টরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস খাদ্যের সাথে এসে মিশ্রিত হয়। একই সাথে অল্প প্রাচীরের আক্সিক গ্রন্থি থেকে আক্সিক রসও খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

পিষ্টরস একটি ক্ষারীয় রস। এ রস অম্লীয় মাধ্যমকে প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। পিষ্টরস চর্বিতে ছোট ছোট কণায় পরিণত করে। অগ্ন্যাশয় রসে তিনটি এনজাইম থাকে। ট্রিপসিন পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে, লাইপেজ চর্বিতে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং এমাইলেজ, মলটোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

আক্সিক রসের মলটোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ যথাক্রমে অবশিষ্ট মলটোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ নামক সরল শর্করাকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

ক্ষুদ্রান্তের দ্বিতীয় অংশ বা ইলিয়াম অংশে ভিলাস (চিত্র ১২.৯ এবং ১২.১০) নামক আঙুলের মতো অসংখ্য অভিক্ষেপ থাকে। ভিলাস এর রক্তনালী দ্বারা গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড এবং লসিকা নালী দ্বারা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল দেহে শোষিত হয়। হজমকৃত খাদ্য শোষণের পর অপাচ্য অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে আসে।

বৃহদন্ত্রে পরিপাক : এখানে কোনো পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় না তবে অপাচ্য খাদ্যের সাথে যে পানি থাকে তা এখানে শোষিত হয়। অবশিষ্ট অংশ মল হিসেবে মলাশয়ে জমা হয় এবং অবশেষে পায়ুপথে দেহের বাইরে আসে।

সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

১) আমাশয় : আমাশয় রোগ আমাদের দেশে অতি পরিচিত একটি রোগ। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়।

ক) অ্যামিবিব আমাশয় : প্রধানত এন্টামিবা নামক এক প্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের আমাশয় রোগ হয়। একাদশ অধ্যায়ে প্রোটোজোয়া পর্বে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) ব্যাসিলারী আমাশয় : শিগেলা নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্র আক্রান্ত হলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদন্ত্রের কিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় রক্তও যায়। এ জন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। আমাশয় রোগ হলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

২) কোষ্ঠকাঠিন্য : কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়খানার বেগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে পায়খানায় না বসার ফলে এটি হয়। নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা ও নিয়মিত শাকসবজি খেলে এ অসুবিধা দূর করা যায়।

৩) গ্যাস্ট্রাইটিস : প্রধানত সময় মতো খাদ্য গ্রহণ না করলে এবং দীর্ঘদিন খাদ্য গ্রহণে অনিয়ম হলে পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্যের কারণে এ রোগ হয়। এ রোগে গলা, পেট জ্বালা করা ও পেট ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগ নিয়ন্ত্রণ না করলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে। নিয়মিতভাবে এবং সময়মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

বিপাকের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন খাদ্যবস্তু আর অক্সিজেন, ঠিক তেমনি বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তুও তৈরি হয়; যেগুলোর অপসারণ অত্যাবশ্যক। যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে ঐ সব বস্তু পরিবহণ হয় তাকে সংবহনতন্ত্র বলে।

রক্ত সংবহনতন্ত্র : রক্ত, হৃদযন্ত্র, ধমনী, শিরা ও কৈশিক নালীর জালক সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

রক্ত

রক্ত (চিত্র ১২.১১) এক ধরনের তরল যোজক কলা। এর রং লাল, স্বাদে লবণাক্ত, অস্বচ্ছ এবং স্ফারীয়। প্রধানত অস্থি মজ্জায় (Bone marrow) রক্ত কণিকা তৈরি হয়। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্ত দুই প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা— (ক) রক্তরস ও (খ) রক্তকণিকা।

(ক) রক্তরস : রক্তের তরল অংশকে রক্তরস বলে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তরসে পানির পরিমাণ ৯০-৯২%। এছাড়াও রক্তরসে গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, আমিষ (যেমন : অ্যালবুমিন, ফিব্রিনোজেন), খনিজলবণ, হরমোন, ভিটামিন, ইউরিয়া, এন্টিবডি, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ থাকে।

(খ) রক্তকণিকা : মানুষের রক্তে তিন ধরনের কণিকা থাকে। যথা—

১। লোহিত রক্তকণিকা বা ইরাইথ্রোসাইট : লোহিত রক্তকণিকা ক্ষুদ্রাকার, দ্বিঅবতল বরং চাকতির মতো। এরা নিউক্লিয়াসবিহীন। হিমোগ্লোবিন নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে কণিকাগুলো লাল দেখায়। দেহে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কণিকা তৈরি হয়। একটি লোহিত কণিকার গড় আয়ু ৪ মাস।

২। শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট : শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকার বিহীন ও নিউক্লিয়াস যুক্ত। এরা লোহিত কণিকা অপেক্ষা বড় কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। নিউক্লিয়াসের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল, লিম্ফোসাইট, মনোসাইট ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। সুস্থ মানব দেহে প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৬০০০-১১০০০ শ্বেত কণিকা থাকে। শ্বেত রক্তকণিকা ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে রোগজীবাণু ভক্ষণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।

৩। অনুচক্রিকা বা থ্রোম্বোসাইট : অনুচক্রিকা সবচেয়ে ক্ষুদ্র রক্তকণিকা। এরা গোল, ডিম্বাকার বা বৃত্তের মতো এবং গুল্মাকারে থাকে। এতে নিউক্লিয়াস থাকে না। এদেরকে প্লেটলেটও বলে।

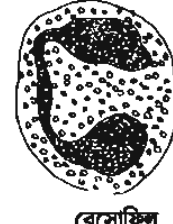
রক্তের কাজ : রক্তের প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ—

- ১। রক্ত সারা দেহে পানি ও তাপের সমতা রক্ষা করে।
- ২। লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে কোষে কোষে অক্সিজেন পরিবহণ করে।
- ৩। শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে দেহকে সুস্থ রাখে।
- ৪। দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে অনুচক্রিকা সে স্থানে রক্ত জমাট বাঁধায়। ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- ৫। রক্তরসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, ইজমকৃত খাদ্যবস্তু (যথা—গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল), হরমোন ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

হৃৎপিণ্ড

হৃদপেশি দ্বারা তৈরি হৃদযন্ত্র একটি সজীব পাম্পযন্ত্র বিশেষ। এটি বক্ষ গহবরের মধ্যচ্ছদার উপরে এবং দুই ফুসফুসের মাঝখানে বামদিকে অবস্থিত। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত O_2 সমৃদ্ধ হওয়ার পর ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা এ যন্ত্রের কাজ। সমগ্র হৃদযন্ত্র একটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পদার্থ দ্বারা আবৃত। হৃদযন্ত্রের প্রাচীরে পেশির তিনটি স্তর রয়েছে। বাইরে এপিকার্ডিয়াম, মাঝখানে মায়োকার্ডিয়াম এবং ভিতরে এন্ডোকার্ডিয়াম।

নিউট্রোফিল লিউকোসাইট



বেসোফিল



ছোট লিম্ফোসাইট



ইওসিনোফিল



মনোসাইট

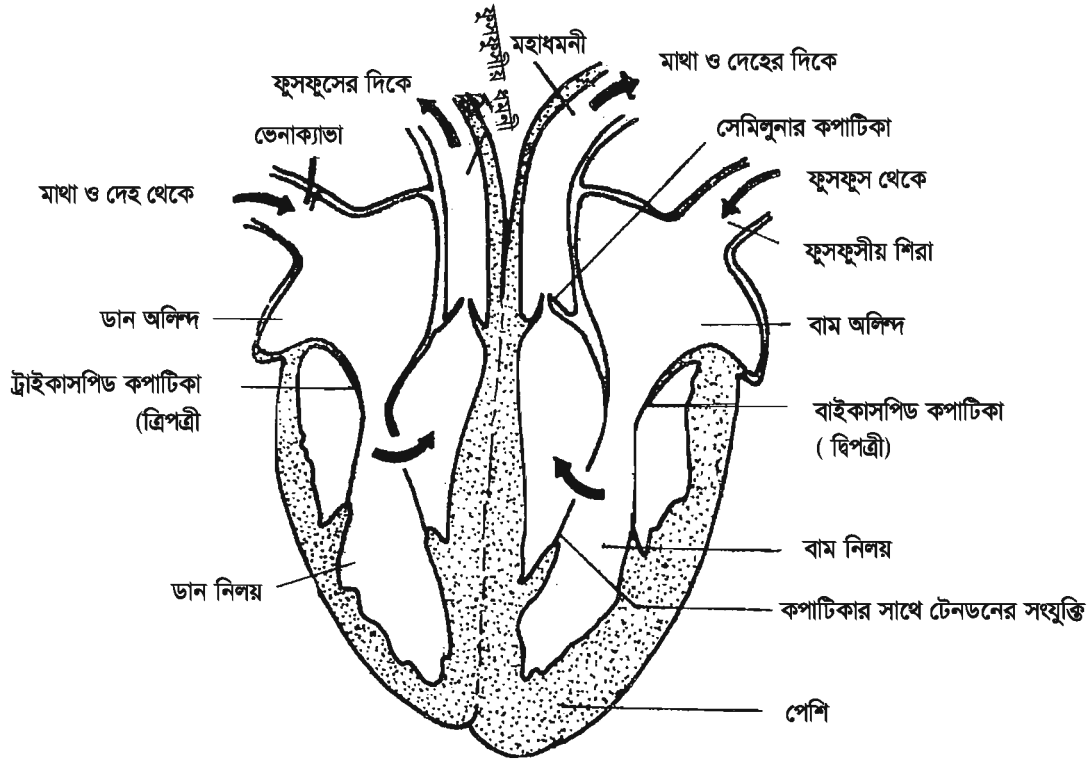


ইরাইথ্রোসাইট



অনুচক্রিকা

চিত্র ১২.১১: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা



চিত্র ১২.১২ : হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন

হৃদযন্ত্র (চিত্র ১২.১২) সম্পূর্ণভাবে চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত উপরের দুটি পাতলা প্রাচীরযুক্ত ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের দুটি পুরু প্রাচীরযুক্ত ডান ও বাম পর্দা এবং নিলয় দুটি আন্তঃনিলয় দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক।

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মধ্যে ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রপথ ট্রাইকাসপিড বা ত্রিপত্রী কপাটিকা যুক্ত। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথ বাইকাসপিড বা দ্বিপত্রী কপাটিকা যুক্ত। কপাটিকা থাকার ফলে রক্ত শুধুমাত্র অলিন্দে উর্ধ্ব মহাশিরা (সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা) ও নিম্ন মহাশিরা (ইনফেরিয়র ভেনাক্যাভা) বাম অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা, বাম নিলয়ে মহাধমনী এবং ডান নিলয়ে ফুসফুসীয় ধমনী যুক্ত থাকে। করোনারী ধমনীর মাধ্যমে হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ হয়। ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীর মুখে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বা সেমিলুনার ভালব থাকে। ফলে রক্ত শুধু নিলয় থেকে ধমনীতে প্রবেশ করতে পারে। অলিন্দে আগত শিরাগুলোর প্রবেশ পথে কোন কপাটিকা থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি

অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই হৃদযন্ত্রের রক্তসঞ্চালন সংঘটিত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহ থেকে উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে ফুসফুসীয় শিরা পথে বাম অলিন্দে আসে। অলিন্দদ্বয় সংকুচিত হলে রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এরপর নিলয় দুটি সংকুচিত হলে রক্তের চাপে একদিকে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দ্বারা বাম ও ডান অলিন্দ নিলয় ছিদ্র পথ বন্ধ হয়, অপরদিকে ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীর মুখের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা খুলে যায়। ফলে বাম নিলয়ের অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে এবং ডান নিলয়ের কার্বন ডাইঅক্সাইড

সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। এভাবে হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

রক্তচাপ এবং রক্তচাপ নির্ণয় পদ্ধতি

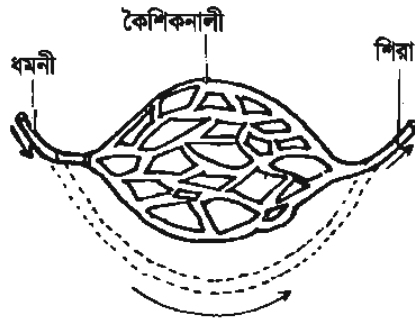
হৃদযন্ত্র থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দুই ধরনের হয়। যথা—

১। সিস্টোলিক চাপ : হৃদযন্ত্রের সংকোচনকে সিস্টোল বলে। সিস্টোল অবস্থায় ধমনীতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় সিস্টোলিক চাপ পারদ স্তম্ভের ১০০-১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

২। ডায়াস্টোলিক চাপ : হৃদযন্ত্রের প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। ডায়াস্টোলিক অবস্থায় ধমনীতে রক্তের চাপকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ডায়াস্টোলিক রক্ত চাপ পারদস্তম্ভের ৬৫-৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। রক্তচাপ মাপক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।



চিত্র : বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা



চিত্র ১২.১৩ : ধমনী, কৈশিকনালী ও শিরার মধ্য সম্পর্ক

রক্তনালী (ধমনী, শিরা, কৈশিকনালী) : যে সকল নালী পথে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে রক্তনালী বলে। দেহে তিন ধরনের রক্তনালী আছে। যথা—ধমনী, শিরা এবং কৈশিকনালী বা রক্তজালক।

ধমনী : ধমনী হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহণ করে। এরা দেহের ভেতরের দিকে অবস্থিত। ধমনীর প্রাচীর পুরু এবং ধমনী গহ্বরে কপাটিকা থাকে না।

শিরা : দেহের বিভিন্ন অঙ্গে থেকে উৎপত্তি হয়ে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃদযন্ত্রের দিকে পরিবহন করে। শিরার প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং এদের গহ্বরে প্রাচীর পাশে কপাটিকা থাকে।

রক্তজালক বা কৈশিকনালী : ধমনী ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম নালী তৈরি করে। এ সকল সূক্ষ্ম নালীকে কৈশিকনালী বলে। কৈশিকনালী দেহকোষের চারপাশে থাকে এবং মাত্র একস্তর কোষ দ্বারা এদের প্রাচীর গঠিত। কৈশিকনালী থেকে শিরার উৎপত্তি।

হৃদস্পন্দন

একবার সিস্টোল এবং তার পরবর্তী ডায়াস্টোলকে একত্রে হৃদস্পন্দন বা নাড়ি স্পন্দন বলে। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিট ৭২ বার। তবে পরিশ্রম, অসুস্থতা, ভয়, রাগ ইত্যাদি কারণে স্পন্দন যথেষ্ট বাড়ে বা কমে। কজির ওপর সহজেই হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ থেকে মানুষে রক্তদানকালে অনেক ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না হলেও কোন কোনো ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্রহীতা অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। সকল মানুষের রক্ত একই প্রকার নয় বলে এমন হয়। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে যে, মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় দুই প্রকারের এন্টিজেন এবং দুই প্রকারের এন্টিবডি থাকে। এ এন্টিজেন ও এন্টিবডির ওপর ভিত্তি করে মানুষের রক্ত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাসকে ABO রক্ত গ্রুপ বলে।

মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য

রক্ত গ্রুপ	লাল রক্তকণিকায় উপস্থিত এন্টিজেন	সেরামে উপস্থিত এন্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্তদান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	এন্টিজেন A	এন্টিবডি b	A, AB	A এবং B
B	এন্টিজেন B	এন্টিবডি a	B, AB	B এবং O
AB	এন্টিজেন A এন্টিজেন B	কোনো এন্টিবডি নেই	AB	সব গ্রুপ (AB, A, B, O)
O	কোনো এন্টিজেন নেই	এন্টিবডি a এন্টিবডি b	সব গ্রুপ (A, B, AB, O)	O

রেসাস ফ্যাক্টর বা Rh ফ্যাক্টর

রেসাস বানরের রক্তে একটি এন্টিজেন থাকে। এটিকে রেসাস এন্টিজেন বা Rh ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় রেসাস বানরের অনুরূপ রেসাস এন্টিজেন বর্তমান। রেসাস এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করে মানুষের রক্তের গ্রুপকে Rh পজিটিভ ও Rh নেগেটিভ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। Rh নেগেটিভ মানুষকে Rh পজিটিভ মানুষের রক্তদান করলে এবং Rh নেগেটিভ কোনো মহিলার সাথে Rh পজিটিভ পুরুষের বিয়ে হলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

রক্ত গ্রুপ জেনে রাখার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের ABO রক্তগ্রুপ এবং রেসাস ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের সময় রক্ত গ্রহণ বা দানকালে জটিলতা এড়ানোর জন্য প্রত্যেকের রক্তের গ্রুপ জানা দরকার।

রক্তদান : অনেক মুমূর্ষু রোগীর বা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হয়। একজন মানুষের দেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে। একটি লাল রক্তকণিকা ৪ মাস পর্যন্ত বাঁচে। প্রতিদিন বিশ হাজার কোটি লাল রক্তকণিকা তৈরি ও ধ্বংস হয়। কাজেই এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর রক্ত দান করলে কোনো অসুবিধা হয় না। এতে নিজের কোনো ক্ষতিও হয় না। অপরদিকে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

১। **রক্তচাপ :** সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তচাপ থাকে। যেমন— একজন পূর্ণ বয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০। নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিক যে চাপ থাকা উচিত যদি তার চেয়ে কম বা বেশি থাকে তবে তা রোগের নির্দেশ করে। চাপ বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ এবং কম হলে নিম্ন রক্তচাপ বলে। আধুনিক বিশ্বের একটি মারাত্মক রোগ হল উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ হলে মস্তিষ্কের সরু সরু শিরা বা ধমনী নাগিকা ছিঁড়ে যেতে পারে এবং তার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। একে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বলে।

২। **হাট অ্যাটাক :** হাট অ্যাটাক হল হঠাৎ করে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া। করোনারী ধমনী দ্বারা হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ হয়। কোনো কারণে করোনারী ধমনীর দ্বারা কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ না হলে ঐ অংশের পেশির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হাট অ্যাটাক হয়। হাট অ্যাটাকের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৩। **স্ট্রোক :** মস্তিষ্কের কোনো ধমনীতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৪। **বাত জ্বর :** ঘন ঘন জ্বর ও হৃদযন্ত্রের প্রদাহ এ রোগের লক্ষণ। এ রোগে হৃদযন্ত্রের কপাটিকার ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস এবং রোগে আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুষ্ক সেবন প্রয়োজন।

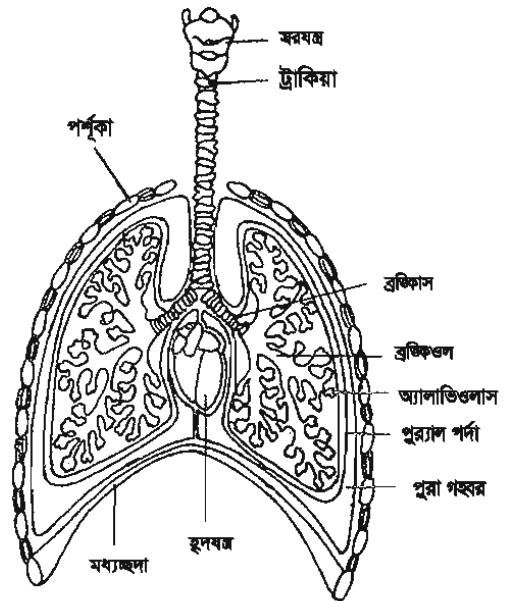
৫। **রক্তশূন্যতা :** রক্তশূন্যতা আমাদের দেশের মহিলাদের একটি সাধারণ রোগ। রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি বা লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে এ রোগ হয়।

লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যাওয়া বা লোহিত কণিকার অধিক হারে ভেঙে যাওয়া, অগুণ্ঠিত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে রক্তশূন্যতা হতে পারে। চিকিৎসকের সাহায্যে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে সময়মত চিকিৎসা এবং সুস্থ খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্বসন ও শ্বসনতন্ত্র

সকল ধরনের বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে কোষস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) দহনের মাধ্যমে শক্তি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে শ্বসন বলে।

গ্লুকোজ + অক্সিজেন → শক্তি + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি যে সকল অঙ্গ শ্বসন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। নাক, নাসা-গলবিল, স্রবযন্ত্র, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস ও ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত।



চিত্র ১২.১৪ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

নাক একটি ফাঁপা অঙ্গবিশেষ। এর অগ্রপ্রান্তের ছিদ্রদ্বয়কে নাসাছিদ্র বলে। নাকের অন্তঃস্থ গহ্বরটি নাসাগহ্বর নামে পরিচিত। নাসাগহ্বরের সামনের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম এবং পেছনের দিকে শ্লেষ্মাবিল্লি থাকে। একটি পাতলা প্রাচীর দ্বারা নাসাগহ্বর দুই ভাগে বিভক্ত।

নাসাপথে প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশ করে। প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে যে সব ধূলিকণা বা রোগজীবাণু থাকে, নাসাগহ্বরের লোম ও শ্লেষ্মাবিল্লি তাদেরকে আটকিয়ে ফুসফুসকে রক্ষা করে।

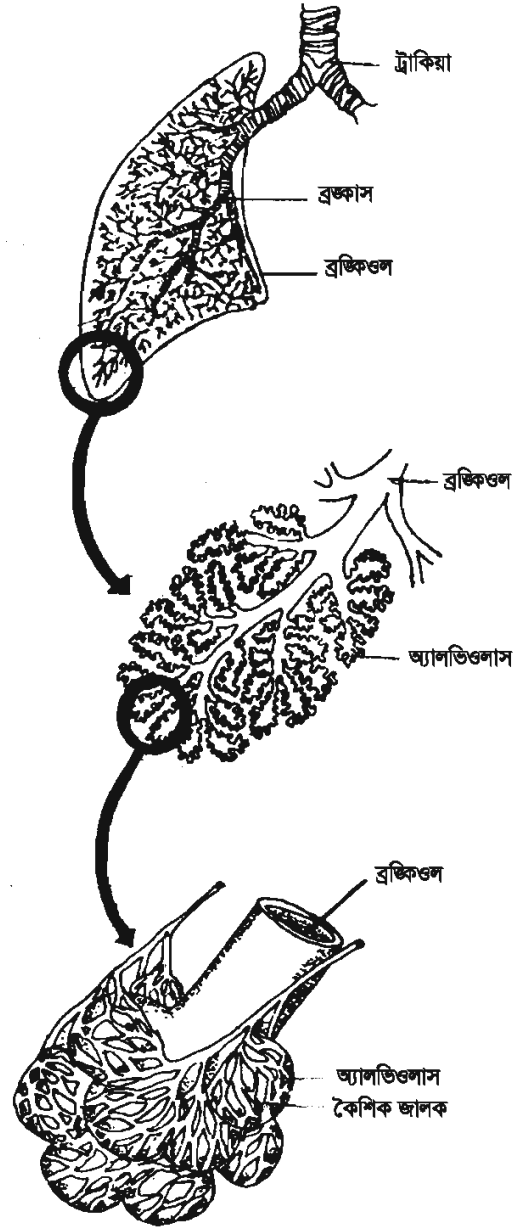
নাসাছিদ্র হতে নাসাগহ্বর গলবিলের পেছন পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশকে নাসা গলবিল বলে। গলবিলের সাথে ট্রাকিয়ার সংযোগস্থলে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের গহ্বরে একজোড়া স্থিতিস্থাপক পর্দার ন্যায় স্বররঞ্জু অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে জিহ্বা আকৃতির একটি ঢাকনা থাকে। একে গ্লটিস বা উপজিহ্বা বলে। স্বরযন্ত্রে স্বররঞ্জুর কম্পনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সময় উপজিহ্বা স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না। কোনো কারণে খাদ্যকণা ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করলে দম বন্ধ হয়ে কাশি আরম্ভ হয় এবং খাদ্যকণা ট্রাকিয়া থেকে বাইরে নিষ্কিন্ত হয়।

স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ হতে দুটি শাখায় বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত ফাঁপা নলকে ট্রাকিয়া বলে। ট্রাকিয়া বক্ষ গহ্বরে প্রবেশ করার পর দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এদের প্রত্যেকটিকে ব্রঙ্কাস বলে এবং এরা ফুসফুসের ডান ও বাম খণ্ডে প্রবেশ করে। ব্রঙ্কাস শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ব্রঙ্কিওল সৃষ্টি করে। প্রতিটি ব্রঙ্কিওলের শেষ প্রান্তে বৃদবৃদের মতো অ্যালভিওলাস থাকে। ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস ও ব্রঙ্কিওলের মাধ্যমে বাতাস অ্যালভিওলাসে আসে। অ্যালভিওলাসের চারদিক কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ। শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল ফুসফুস। প্রকৃতপক্ষে ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অসংখ্য অ্যালভিওলাস ও রক্তনালী নিয়ে ফুসফুস গঠিত। বক্ষগহ্বরের দু পাশে দুটি ফুসফুস থাকে। প্রতিটি ফুসফুস পুরা নামক দুই প্রস্থ পর্দা দ্বারা আবৃত। পর্দাদ্বয়ের ভিতরে এক প্রকার পিচ্ছিল রস থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কোনো রকম ঘর্ষণ হয় না। ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের কর্বন ডাইঅক্সাইড অ্যালভিওলাসে আসে।

বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর মধ্যচ্ছদা নামক একটি পাতলা পেশি গঠিত পর্দা দ্বারা পৃথক থাকে। মধ্যচ্ছদা সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে ফুসফুস প্রশ্বাসে ও নিঃশ্বাসে অংশ নেয়।

শ্বাস প্রক্রিয়া

শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সংগঠিত হয়। যেমন-(ক) বহিঃশ্বসন ভেন্টিলেশন (শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ) (খ) অন্তঃশ্বসন



চিত্র ১২.১৫ : ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাস ও কৈশিক জালক

(ক) বহিঃশ্বসন : ফুসফুসের অ্যালভিওলাস ও অ্যালভিওলাসের চারদিকের কৈশিকনালীর মধ্যে শ্বসন গ্যাসের (অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড) আদান-প্রদানকে বহিঃশ্বসন বলে। বহিঃশ্বসনের প্রথম পর্যায়ে পরিবেশের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ু শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে।

ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশকে প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ বলে। মধ্যচ্ছদা ও পর্শুকার পেশির সংকোচনের কারণে বক্ষ প্রসারিত হয়। ফলে বাতাস ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে পৌঁছে। অ্যালভিওলাস কৈশিকনালী দ্বারা বেষ্টিত। কৈশিকনালীর রক্তে অক্সিজেন কম থাকে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকে এবং অ্যালভিওলাসের বায়ুতে অক্সিজেন বেশি থাকে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড কম থাকে। ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওলাসের অক্সিজেন কৈশিকনালীতে প্রবেশ করে।

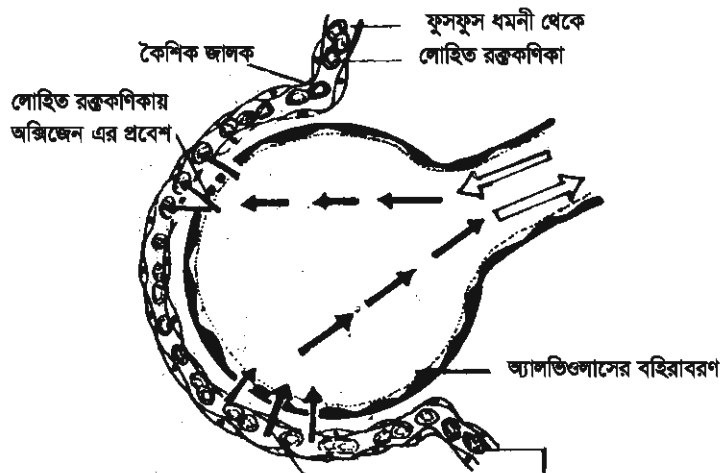
বহিঃশ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশি প্রসারণের ফলে বক্ষগহবরের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে অ্যালভিওলাসের ভিতরের বায়ু, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পসহ ফুসফুস থেকে বের হয়ে আসে। শ্বসনতন্ত্রের ফুসফুস থেকে বায়ুর পরিবেশে মুক্ত হওয়াকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ বলে।

(খ) অন্তঃশ্বসন : শ্বসন অঙ্গ থেকে অক্সিজেনের দেহকোষে গমন, কোষের ভিতরে খাদ্যবস্তু জ্বারণের মাধ্যমে শক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এর শ্বসন অঙ্গে আসা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে অন্তঃশ্বসন বলে। অন্তঃশ্বসনকে ৩টি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা—

i. শ্বসন অঙ্গ থেকে কোষ পর্যন্ত অক্সিজেনের পরিবহণ : ফুসফুসের অ্যালভিওলাস থেকে অক্সিজেন অ্যালভিওলাসের চারদিকে অবস্থিত লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে। এ অবস্থায় ধমনীর মাধ্যমে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারাদেহে প্রবাহিত হয় এবং দেহকোষের চারদিকস্থ কৈশিকনালীতে পৌঁছে। এখানে অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে কলারস এবং পরে কলাকোষে প্রবেশ করে।

ii. কোষে খাদ্যবস্তুর জ্বারণ : এ পর্যায়ে কোষের ভিতরে গ্লুকোজ এনজাইমের উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জ্বারিত হয়ে শক্তি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন শক্তি এ.টি.পি. (A.T.P অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট) নামক বিশেষ অণুতে সঞ্চিত থাকে। এ সঞ্চিত শক্তি দ্বারা দেহের সকল বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

iii. কোষে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডের শ্বসন অঙ্গ পর্যন্ত পরিবহণ : খাদ্য জ্বারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কার্বন ডাইঅক্সাইড কোষ থেকে কৈশিকনালীর রক্তে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসের মাধ্যমে প্রধানত বাইকার্বনেট রূপে ফুসফুসে পৌঁছানোর পর বাইকার্বনেট থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত হয়ে কৈশিকনালী থেকে অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে।



রক্ত থেকে CO₂ এর অ্যালভিওলাসে প্রবেশ

ফুসফুসীয় শিরার দিকে

চিত্র ১২.১৬ : CO₂ এর অ্যালভিওলাসে প্রবেশ

শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

ফুসফুস মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে রোগ সৃষ্টি করে। নিম্নে কয়েকটি রোগের বিবরণ দেওয়া হল—

নিউমোনিয়া : এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগে ফুসফুসে এক প্রকার তরল পদার্থ জমে। কাশি, জ্বর, বুকে ব্যথা এবং মাথা ব্যথা এ রোগের লক্ষণ। ডাক্তারের পরামর্শে সময়মত চিকিৎসা দ্বারা এ রোগ থেকে উপশম পাওয়া যায়।

যক্ষ্মা : টিউবারকুলোসিস ব্যাসিলাস দ্বারা আক্রান্ত হলে যক্ষ্মারোগ হয়। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অপুষ্টিকর ও অপরিপাক খাদ্যগ্রহণ এবং অধিক পরিশ্রমে এ রোগ হয়। এ রোগে বিকালের দিকে সামান্য জ্বর, কাশি, কাশির সাথে রক্ত, ওজন কমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ডাক্তারের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওষুধ সেবন ও বিশ্রাম নিলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক শিশুকে বি.সি.জি. টিকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফের সাথে এ রোগ ছড়ায়।

ব্রঙ্কাইটিস : শ্বাসনালীর ভেতরে আবৃত ঝিল্লির প্রদাহের কারণে এ রোগ হয়। ধূমপানেও এ রোগ হয়। জ্বর, ফুসফুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ। এছাড়াও ক্যান্সার, অ্যাজমা, প্রুরিসি, ইনফ্লুয়েন্জা, এমকাইসেমা ইত্যাদি রোগে ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে।

সুষম খাদ্য গ্রহণ, ধূমপান পরিহার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস এবং ঘন ঘন জ্বর বা কাশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রেচন ও রেচনতন্ত্র

বিপাকের ফলে কোষে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়। এ সকল অপ্রয়োজনীয় বস্তু অধিক পরিমাণে দেহে সঞ্চিত হলে দেহের সুস্থ অবস্থা ব্যাহত হয়। বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশনকে রেচন বলে।

রেচন পদার্থ : মানুষের রেচন পদার্থের মধ্যে বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থই প্রধান।

নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো মানুষের দেহ থেকে রেচন পদার্থ ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে :

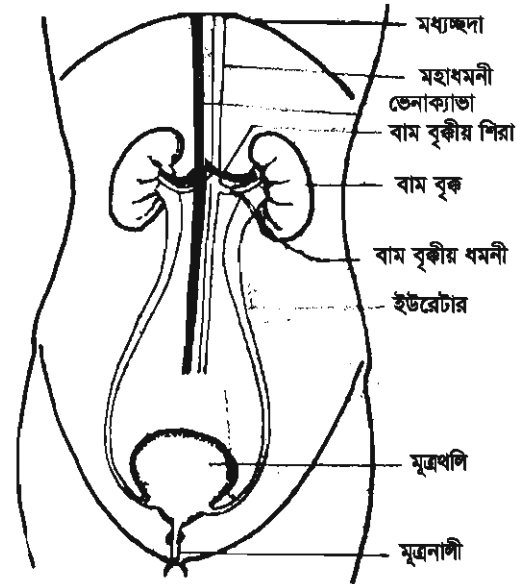
১। ত্বক (পানি, লবণ ও কিছু পরিমাণ ইউরিয়া)

২। ফুসফুস (কার্বন ডাইঅক্সাইড)

৩। বৃক্ক (পিত্তরসের পিত্তরঞ্জক)

৪। বৃক্ক (নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য, অতিরিক্ত লবণ ও পানি)।

মোট রেচন পদার্থের প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃক্ক দ্বারা নিষ্কাশিত হয় বলে বৃক্ককে প্রধান রেচন অঙ্গ বলা হয়। এখানে শুধুমাত্র বৃক্কের গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :



চিত্র ১২.১৭ : রেচন তন্ত্র

নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থের উৎপত্তি

আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। এসিডের দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হয়। এর পরও কিছু অ্যামিনো এসিড উদ্ভূত থেকে যায়। উদ্ভূত অ্যামিনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক

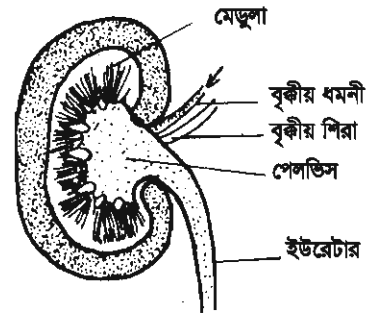
পরিবর্তনের মাধ্যমে ইউরিয়া নামক নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে। ইউরিয়া রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মানুষের নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও একটি মূত্রনালী থাকে।

বৃক্কের গঠন

তলপেটের কিছুটা উপরে উদর গহ্বরের পেছন দিকে, মেরুদণ্ডের প্রতি পাশে একটি করে মোট দুইটি বৃক্ক অবস্থিত। বৃক্ক নিরোট, খয়েরী লাল বর্ণের এবং দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মতো। পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি বৃক্ক লম্বায় প্রায় ১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ৬ সেন্টিমিটার। লম্বাচ্ছেদে বৃক্কের বাইরের দিকে কর্টেক্স এবং ভিতরের দিকে মেডুলা অঞ্চল খালি চোখে দেখা যায়। বৃক্কের যে অংশ থেকে ইউরেটার উৎপত্তি হয় সে অঞ্চলকে পেলভিস বলে। বৃক্কীয় ধমনী দ্বারা বৃক্ক রক্ত সরবরাহ হয় এবং বৃক্কীয় শিরা দ্বারা বৃক্ক থেকে বর্জ্যমুক্ত রক্ত বের হয়।

বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে নেফ্রন বলে।

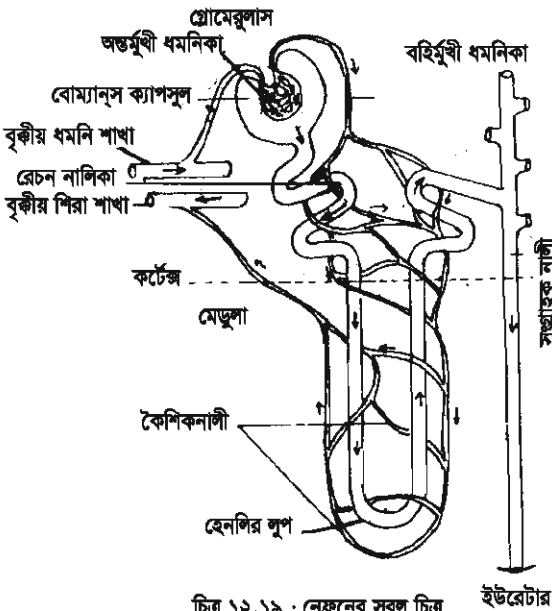
একটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। প্রতিটি নেফ্রন পেয়াল্লা আকৃতির বোম্যান্স ক্যাপসুল, গ্লোমেৰুলাস এবং বৃক্কীয় নালিকা নিয়ে গঠিত। বৃক্কীয় ধমনী থেকে সৃষ্ট অন্তর্মুখী ধমনী বোম্যান্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে কৈশিক জালকে ভাগ হয়ে গ্লোমেৰুলাস সৃষ্টি করে এবং পুনরায় একত্রিত হয়ে বহির্মুখী ধমনিকা হিসেবে বোম্যান্স ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে আসে। বোম্যান্স ক্যাপসুলের অণুীয় দেশ থেকে বৃক্কীয় নালিকার উৎপত্তি হয় এবং কুণ্ডলী ও হেনলির লুপ তৈরি শেষে সঞ্চাহক নালীর সাথে যুক্ত হয়। সঞ্চাহক নালী পরিশেষে ইউরেটারে উন্মুক্ত হয়।



চিত্র ১২.১৮ : বৃক্কের লম্বাচ্ছেদ

বৃক্কের কাজ

গ্লোমেৰুলাস এর ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহকালে রক্ত থেকে বিভিন্ন পদার্থ যথা—গ্লুকোজ, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, লবণ, পানি, ইত্যাদি বোম্যান্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। অতঃপর বৃক্কীয় নালিকা অতিক্রম করার সময় প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ, পানি, লবণ ইত্যাদি পুনরায় শোষিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মূত্র হিসেবে বের হয়। মূত্র মূলত পানি, ইউরিয়া, ইউরিক



চিত্র ১২.১৯ : নেফ্রনের সরল চিত্র

এসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি সহযোগে গঠিত।

প্রত্যেক বৃক্ক হতে একটি করে ইউরেটার বের হয়ে মূত্রাশয়ে বা মূত্রথলিতে প্রবেশ করে। অবশেষে মূত্রাশয় থেকে মূত্রনালী পথে মূত্র দেহ থেকে বের হয়।

বৃক্কের রোগ

কিছু কিছু রোগের কারণে বৃক্কে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মূত্রের সাথে গ্লুকোজ, অ্যালবুমেন (এক প্রকার আমিষ) বের হয়। বৃক্কের প্রদাহ রোগে মূত্রের সাথে লাল রক্তকণিকা বের হয়ে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কারণে বৃক্ক অকেজো হয়ে যায়। বৃক্ক অকেজো হয়ে গেলে রক্তে রোচন পদার্থ জমে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনে। বৃক্ক অকেজো হয়ে গেলে “বৃক্ক মেশিন” এর সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত থেকে রোচন

পদার্থ পৃথক করা হয়। প্রক্রিয়াটিকে ডায়ালাইসিস বলে। এছাড়া আজকাল সুস্থ ব্যক্তির বা মৃত্যুর পরপরই মৃত ব্যক্তির বৃক্ক সঞ্চার করে অসুস্থ ব্যক্তির বৃক্ক সরিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করার ফলে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

স্নায়ুতন্ত্র

মানবদেহের অঙ্গতন্ত্রসমূহ পৃথক পৃথকভাবে কাজ করে। তবে এদের সমন্বিত করার জন্য রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র। কাজেই যে তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীদেহ পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনার সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রসমূহকে সুসংবদ্ধ করে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা—ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, খ) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, গ) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

বস্তুত, মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠতম জীব। তাই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপক উন্নতি লক্ষ করা যায় তার মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের ব্যাপক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অগ্রাঞ্চল।

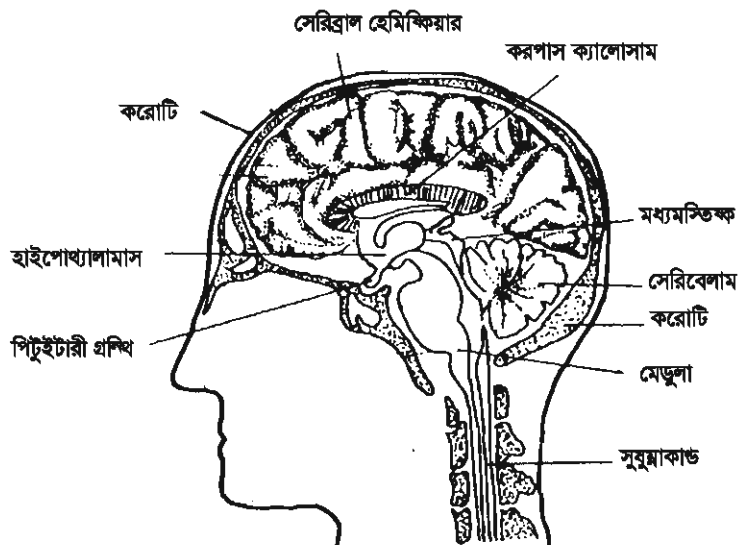
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হচ্ছে গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেডুলা।

গুরুমস্তিষ্ক বা অগ্রমস্তিষ্ক : স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মানব অগ্রমস্তিষ্কের একটি বৃহৎ অংশ পেছনের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার গঠন করে। করোটি গহ্বরের উপরিভাগে অবস্থিত এ অংশটি হল কুণ্ডলীকৃত এবং তাঁজ অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে গুরুমস্তিষ্ক।

গুরুমস্তিষ্কের বাইরের ধূসর অংশকে গ্রে-ম্যাটার এবং ভিতরের সাদা অংশকে স্বেতবস্তু বলা হয়। বাইরের ধূসর অংশে প্রায় দেড় কোটি স্নায়ুকোষ বিদ্যমান থাকে। আর ভিতরের সাদা অংশ স্নায়ুতন্ত্র বা অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত।

থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস : গুরুমস্তিষ্কের নিচের অংশ হলো থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। ক্রোধ, লজ্জা, নিদ্রা, তাপ, স্নেহাঙ্কন ইত্যাদি এ অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মধ্যমস্তিষ্ক : হাইপোথ্যালামাসের পরের অংশই মধ্যমস্তিষ্ক। এ অঞ্চল দৃষ্টি এবং শ্রবণের সাথে জড়িত।



চিত্র ১২.২০ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

লঘুমস্তিস্ক বা পশ্চাৎমস্তিস্ক : গুরুমস্তিস্ক বা সেরিব্রামের নিচেই লঘু মস্তিস্কের অবস্থান। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। চলাচল, দৌড়, নৃত্য, সাইকেল চালনা প্রভৃতি কাজের সময় শরীরের পেশিসমূহকে সংঘবদ্ধ করা লঘুমস্তিস্কের অন্যতম কাজ।

মেডুলা : মস্তিস্কের সবচেয়ে নিচের অংশকে মেডুলা বলা হয়। মস্তিস্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগ হল মেডুলা। শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ ও শরীরের তাপমাত্রা, পরিপাক রস ক্ষরণ প্রভৃতিকে অবচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হল মেডুলার কাজ।

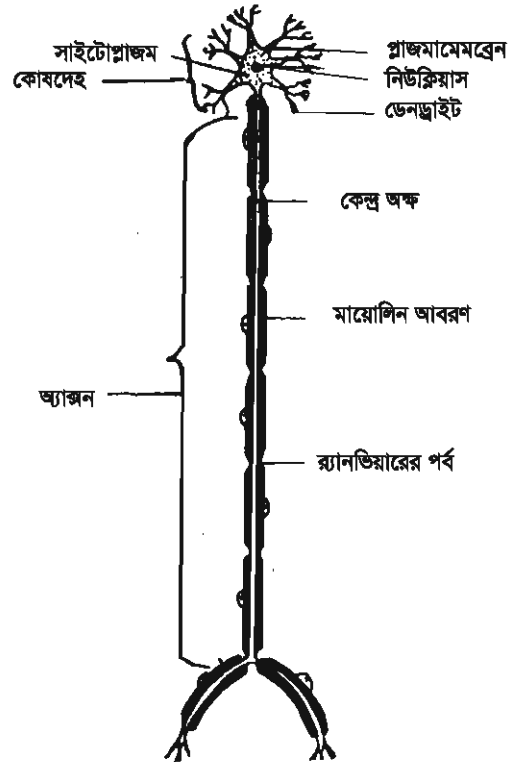
প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র : মস্তিস্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উদগত স্নায়ুসমূহকে নিয়ে গঠিত হয় প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। দেহের বিভিন্ন দূরবর্তী অংশ থেকে উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে আনয়ন ও তার প্রতিক্রিয়া বাইরে প্রেরণ করা প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ।

স্নায়ুক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে এই সব স্নায়ু দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন-তারারস্ট্র, লালগ্রন্থি, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী, মূত্রাশী প্রভৃতি অংশের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুকোষ : স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক উপাদান বা একক হল স্নায়ুকোষ। মানুষের মস্তিস্কে এরূপ করেক কোটি স্নায়ুকোষ রয়েছে যাদের প্রতিটি আবার অন্য হাজার খানেক স্নায়ুকোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি জটিল স্নায়ু জালিকা।

গঠন : স্নায়ুকোষ আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্য দেহকোষ থেকে ভিন্নতর হলেও কোষের আভাবিক গঠনের ন্যায় এখানেও রয়েছে একটি সুস্পষ্ট বৃহৎ নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে ঘিরে চতুর্দিকে প্রায় এক মিটার দীর্ঘ সূত্রাকার সাইটোপ্লাজম। ফলে প্রতিটি স্নায়ুকোষ একটি কোষদেহ এবং দুই প্রকার প্রলম্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত তন্তুগুলোকে ডেনড্রাইট এবং শাখাবিহীন লম্বা তন্তুটিকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সন প্রান্তীয়ভাবে স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে। অ্যাক্সন একটি পুরু শ্বেতবর্ণের আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এই আবরণকে মায়োলিন বলে। আবরণটি সমদূরত্বে স্থানে স্থানে বিভক্ত থাকে, এদের র‍্যানভিয়ার নোডস বলা হয়।

কাজ : স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনুভূতি কেবলমাত্র একদিকে বাহিত হয়। কোষদেহ থেকে অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে তা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (মস্তিস্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড) পৌঁছে। এ অন্তর্মুখী স্নায়ু কোষগুলোকে সংবেদী স্নায়ুকোষ বলে। পরবর্তীতে প্রান্তীয়ভাবে সংযুক্ত অপর এক ধরনের বহির্মুখী স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনুভূতি উদ্দীপনা স্থলে ফিরে আসে। এ কোষসমূহকে চেফীয় স্নায়ুকোষ বলে। সম্পূর্ণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলা হয়।



চিত্র ১২.২১ : একটি নিউরন

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ রোগসমূহ নিম্নরূপ :

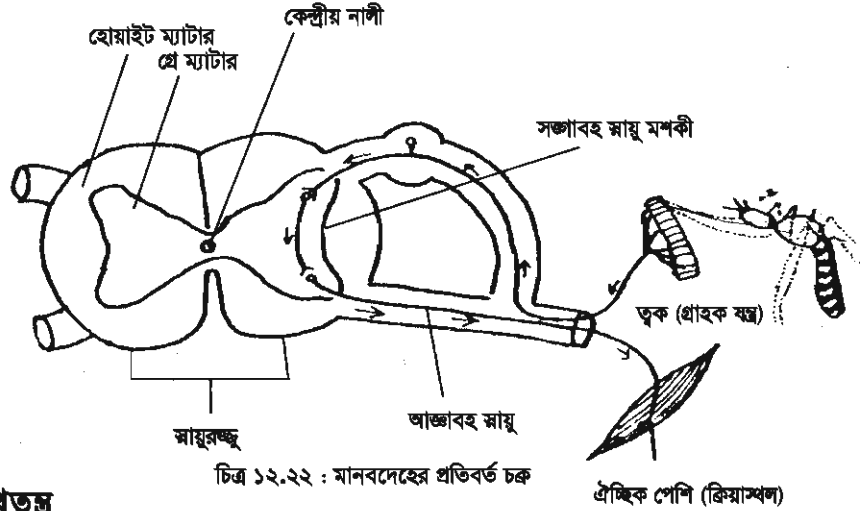
- ১। মাথা ব্যথা : কারণ অনুসন্ধান করে বেদনানাশক ওষুধ সেবন করা।
- ২। অজ্ঞান হওয়া : মাথাকে উপরে রাখা, চোখে মুখে পানি দেওয়া, পূর্ণ বিশ্রাম।
- ৩। মেনিনজাইটিস : ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ঘটে। চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।
- ৪। স্ট্রোক : উচ্চ রক্তচাপ অথবা অন্যান্য কারণে হতে পারে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চিকিৎসার প্রয়োজন।

৫। মৃগিরোগ : স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ বৈকল্য। রোগী হঠাৎ চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সারা দেহে পেশিয় সংকোচন দেখা দেয়।

৬। পক্ষাঘাত : উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।

৭। ব্রেইন টিউমার : বিশেষজ্ঞ দ্বারা অস্ত্রোপচার অথবা রেডিওথেরাপি।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখানো হল :



অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র

দেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্যে যেমন-স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা রয়েছে, অনুরূপ ভূমিকা রয়েছে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের। বস্তুত দেহের সাধারণ আন্তঃসাম্যের জন্য স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে।

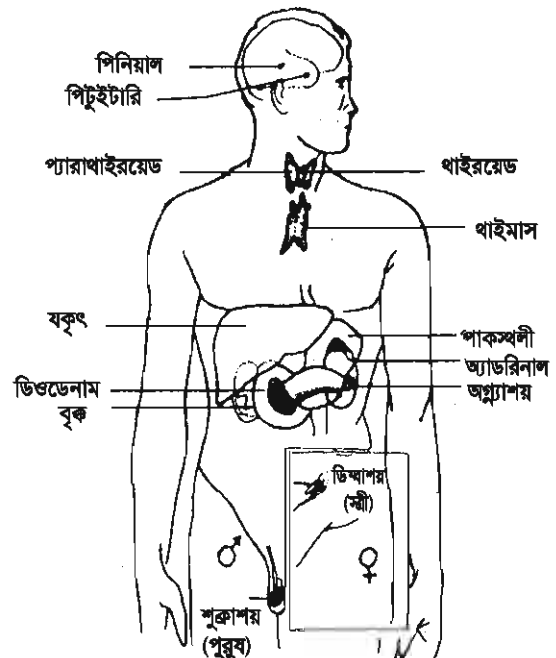
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের কোনো নালী নেই। তাই এদের অনাল গ্রন্থি (Ductless gland) বলা হয়। এসব গ্রন্থি তাদের ক্ষরিত রস বা হরমোন (Hormone) রক্ত অথবা লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ নিম্নরূপ

১। থাইরয়েড গ্রন্থি : আমাদের শ্বাসনালীর উভয় পাশে অনেকটা প্রজ্জাপতির মতো এই গ্রন্থি অবস্থান করে। থাইরয়েড গ্রন্থি আবরণী কলা দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে গঠিত। থাইরয়েড গ্রন্থি থাইরক্সিন হরমোন নিঃসৃত করে।

এ হরমোন শরীরের বৃদ্ধি এবং দেহের সাধারণ বিপাকীয় হারকে প্রভাবিত করে।

২। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি : থাইরয়েড গ্রন্থির উভয় পাশের খণ্ডে ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতির দুই জোড়া গ্রন্থি বসানো থাকে। এদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বলে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাককে নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখে।



চিত্র ১২.২৩ : মানবদেহের প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

৩। পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থিটি অগ্রমস্তিস্কে অবস্থিত। এর কার্যকারিতা এতই ব্যাপক যে প্রায় সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কাজকে এটা নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্যে এ গ্রন্থিটিকে গ্রন্থিরাজ বলা হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোনগুলো হল :

ক) বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন

খ) অ্যাডরিনাল উদ্দীপক হরমোন

গ) থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন

ঘ) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন ইত্যাদি।

৪। অ্যাডরিনাল (Adrenal) গ্রন্থি : এ গ্রন্থি জোড়া বৃক্ষের ঠিক উপরে অবস্থিত। এর বহিঃস্তরে অর্থাৎ কর্টেক্স অংশে কর্টিসোন নামক হরমোন নির্গত হয় যা আমিষ বিশ্লেষণে সহায়তা করে। অ্যাডরিনাল গ্রন্থির কেন্দ্রের অংশে অর্থাৎ মেডুলা অংশে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নির্গত হয়। এর রস স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে।

৫। অগ্ল্যাশন : অগ্ল্যাশনের মধ্যে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন হরমোন রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস রোগের সৃষ্টি হয়।

৬। জনন অঙ্গাসমূহ : পুংজনন গ্রন্থি অর্থাৎ শুক্রাশয় হতে যৌন হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোনগুলোকে অ্যানড্রোজেন (Androgen) বলে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হরমোনকে টেস্টোস্টেরন বলা হয়। এ হরমোন যৌনাজের পরিষ্ফুরণ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশকে প্রভাবিত করে। স্ত্রীজনন গ্রন্থি অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে উৎসারিত ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন যথাক্রমে আনুষঙ্গিক যৌনযন্ত্রের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ও জরায়ুর বিকাশে সাহায্য করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

১। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা বহুমূত্র : ইনসুলিনের অভাবে এ রোগ হয়। চিকিৎসা, নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এ রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় দেহের ওজন কমে যায়।

২। হাইপো-থাইরয়েডিজম : থাইরয়েড গ্রন্থির অপরিমিত হরমোন ক্ষরণের কারণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এর ফলে অবসাদ, গয়টার এবং স্নায়ু ও পেশির রোগ হয়।

পরিমিত মাত্রায় থাইরক্সিন প্রয়োগে উপকার হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ নিয়মিত গ্রহণ করলে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়

পরিবেশ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য উদ্দীপনা পেয়ে থাকি, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে আমরা সে সব উদ্দীপনাকে দেহে সঞ্চালিত করি, অনুভব করি এবং প্রয়োজন মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। ফলে পরিবেশের সঙ্গে আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

এরূপ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অসংখ্য হলেও সাধারণভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই প্রধান। দেখার জন্য দর্শন ইন্দ্রিয় বা চোখ, শোনার জন্য শ্রবণ ইন্দ্রিয় বা কান, ঘ্রাণের জন্য ঘ্রান-ইন্দ্রিয় বা নাক, স্নানগ্রহণের জন্য জিহ্বা এবং স্পর্শের জন্য ত্বক কাজ করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সচেতন শক্তি।

চোখ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ হল দর্শন-ইন্দ্রিয়। চোখের সাহায্যে আমরা আলোকিত কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি। মাথার সামনে দুটি চক্ষু কোটরে অবস্থিত থাকে এক জোড়া চোখ। ছয়টি পেশির সাহায্যে চক্ষু গোলক সঞ্চালিত হতে পারে। ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি বা অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল বা অশ্রু চোখকে সদা সিক্ত রাখে।

চোখের গঠন অনেকটা ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ ও তার কাজগুলো নিম্নরূপ :

১) চোখের পাতা : চোখের বহির্ভাগের আবরণ। চোখের পাতা বক্ষ ও খোলার মাধ্যমে চোখকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে।

২) কনজাংকটিভা : চোখের পাতার নিচে এবং চক্ষু গোলকের উপরের পাতলা স্বচ্ছ ঝিল্লি আবরণী। চোখ ঘষলে বা চোখ উঠলে এটা লাল বর্ণের হয়।

চক্ষু গোলক : এটি গোলাকার বল আকৃতির অঙ্গ, চক্ষু কোটরে অবস্থিত। চক্ষু গোলক তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত :

ক) স্কেরো : এটি চক্ষু গোলকের বাইরের সাদা, শক্ত, পাতলা, তন্তুময় পর্দা। এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে।

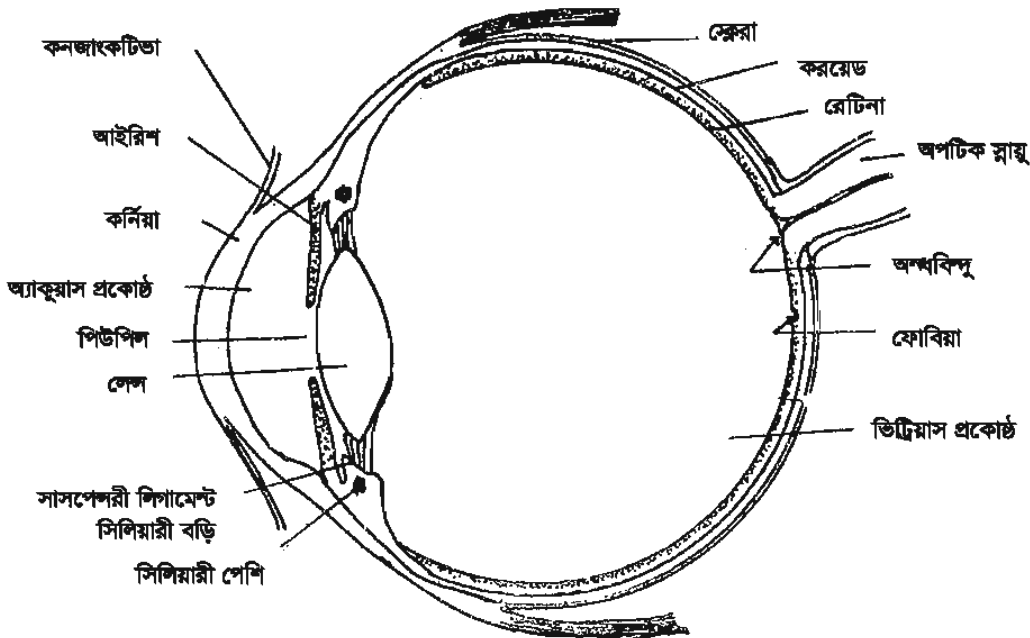
কর্নিয়া : স্কেরার সম্মুখভাগের উন্মুক্ত অংশটির নাম কর্নিয়া। এই অংশের মধ্যে দিয়ে আলোক চোখের ভিতরের প্রবেশ করে।

খ) কোরয়েড : স্কেরা স্তরের নিচেই এর অবস্থান। কোরয়েড রক্তবাহিকা নাগী সমৃদ্ধ এবং ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর। চোখের ভেতর থেকে আলোর প্রতিফলন হ্রাস করে।

আইরিশ : কর্নিয়ার পেছনে ঘন কালো গোলাকার পর্দাটিকে আইরিশ বলা হয়। আইরিশের কেন্দ্রস্থলে একটি ছিদ্র থাকে যাকে তারারাক্ষ বা পিউপিল বলে। আইরিশের পেশিসমূহের সংকোচন প্রসারণে পিউপিল ছোট বড় হতে পারে। এর মধ্যে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করে।

লেন্স : পিউপিলের পেছনে সাসপেন্ডরী লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত একটি স্বচ্ছ দ্বি-উত্তল লেন্স অবস্থিত। লেন্সের ওপর সংলগ্ন ছোট ছোট সিলিয়ারী পেশি সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে লেন্সের বক্রতা ও দূরত্ব পরিবর্তন করে প্রতিবিম্ব গঠনে সহায়তা করে।

গ) রেটিনা : অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের স্তর। এটি একটি আলোক সংবেদী স্তর। এখানে রড ও কোণ নামে দুই ধরনের আলোক সংবেদী কোষ রয়েছে। অপটিক ন্নায়ু এ স্তরে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।



চিত্র ১২.২৪ : চোখের গঠন

অপটিক স্নায়ু : এটি দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু। অক্ষিগোলকের পশ্চাতে রেটিনা ও মস্তিষ্কে যুক্ত করে। আলোক উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ এর কাজ।

অক্ষিগোলকের গহ্বর : চক্ষু গোলকের মধ্যস্থিত লেন্সের সামনে ও পেছনে দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। একটিকে অ্যাকুয়াস বা অগ্র প্রকোষ্ঠ এবং অপরটিকে ভিট্রিয়াস বা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ বলে। উভয় প্রকোষ্ঠ তরল পদার্থপূর্ণ থাকে। চক্ষু গোলকে আলোক রশ্মি প্রবেশ, পুষ্টি সরবরাহ এবং চক্ষু গোলকের আকার বজায় রাখা এদের কাজ।

আমরা কীভাবে দেখি

যে বস্তুকে আমরা দেখি, আলোকিত সেই বস্তু থেকে আলোক রশ্মি, পিউপিলের ভেতর দিয়ে লেন্সের মাধ্যমে রেটিনায় গিয়ে পড়ে। আপতিত রশ্মি প্রসারিত হয়ে রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। ফলে রেটিনার ওপর বস্তুটির ক্ষুদ্র ও উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। আলোক উদ্দীপনা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরিত হলে আমরা বস্তুকে স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাই। মাৎসপেশির সাহায্যে লেন্সের বক্রতা পরিবর্তন করে ফোকাস দূরত্ব কমবেশি করা যায়— ফলে দূরের বা কাছের সব বস্তুই আমরা দেখতে পাই। একে চক্ষুর উপয়োজন বলা হয়।

চোখের রোগ ও প্রতিকার

১। প্রেসবায়োপিয়া : বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৫০ বছরের কোঠায় এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগের ফলে চোখের লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। ফলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বস্তু দৃশ্যমান হয়। চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব।

২। হাইপারমেট্রোপিয়া : চোখের এরূপ ত্রুটি ঘটে যখন লেন্স ও রেটিনার মধ্যকার দূরত্ব স্বাভাবিক থেকে কম হয়। চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব।

৩। মায়োপিয়া : চক্ষুগোলক অস্বাভাবিক দীর্ঘ হলে এটা ঘটে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব রেটিনার সম্মুখে পড়ে। চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব।

৪। ট্যাকোমা : ময়লা ও রোগজীবাণু দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে এ রোগ পরিহার করা যায়।

৫। থ্রুকোমা : এটি চোখের একটি জটিল রোগ। এ রোগে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

৬। চক্ষু প্রদাহ, রাতকানা প্রভৃতি রোগ সুষম ও ভিটামিন “এ” সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ ও সামান্য চিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

৭। ক্যাটারাক্ট বা চোখের ছানি : প্রতিকার ছানি অপারেশন।

কান

কান মূলত একটি শ্রবণ ইন্দ্রিয়, তবে দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। মাথার দুই পাশে দুইটি কান অবস্থিত। কানের তিনটি অংশ। যথা—১) বহিঃকর্ণ, ২) মধ্যকর্ণ ও ৩) অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণ : বহিঃকর্ণের অংশগুলো নিম্নরূপ :

ক) কর্ণছত্র বা পিনা : এটি কানের বাইরের অংশ, মাৎসল ও কোমলাস্থি নির্মিত। শব্দ তরঙ্গ কর্ণকুহরে প্রেরণ এর কাজ।

খ) কর্ণকুহর : কর্ণছত্র একটি নালীর সঙ্গে সংযুক্ত। এ নালীকে কর্ণকুহর বলে। এ নালীপথে শব্দ তরঙ্গ প্রবেশ করে কর্ণপটহে আঘাত করে।

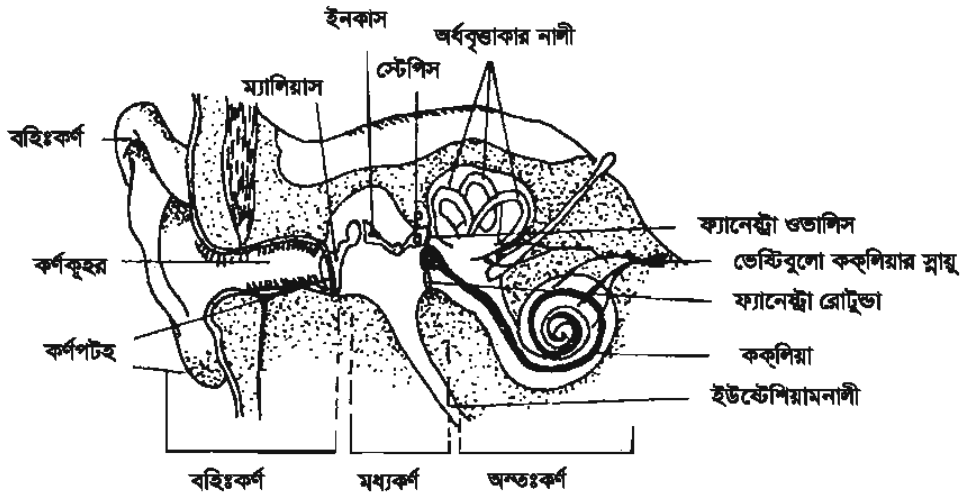
গ) কর্ণপটহ : কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে একটি পর্দায় সমাপ্ত হয়। এ পর্দাকে কর্ণপটহ বলে। শব্দ তরঙ্গ কর্ণপটহকে স্পন্দিত করে।

মধ্যকর্ণ : এটি করোটির মধ্যস্থিত একটি বায়ুপূর্ণ থলি। এ অংশে তিনটি ক্ষুদ্রকার অস্থি রয়েছে। অস্থিগুলোকে ম্যালািয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস বলা হয়। অস্থিগুলো পরস্পর সংযুক্ত। অস্থিসমূহের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ পরিবাহিত হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়। মধ্যকর্ণ ইউস্টেশিয়ান নালীর মাধ্যমে গলবিলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অতিরিক্ত শব্দের চাপ এ নালীপথে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অন্তঃকর্ণ : এ অংশকে মেসেন্সাস ল্যাবিরিন্থও বলা হয়। এটা অভিটরী ক্যাপসিউল অস্থির মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—

ক) **ইউট্রিকুলাস :** অন্তঃকর্ণের উপরের এ অংশে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী, দুটি উলম্বভাবে ও একটি আনুভূমিকভাবে, অবস্থান করে। অর্ধবৃত্তাকার নালীসমূহ রসে পূর্ণ। নালীর একটি প্রান্ত স্ফীতাকার হয়ে অ্যাম্পুলায় পরিণত হয়েছে। এ প্রান্তে সংবেদী রোম অবস্থিত। ইউট্রিকুলাস অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

খ) **স্যাঙ্কুলাস :** অন্তঃকর্ণের এ প্রকোষ্ঠটি প্রলম্বিত হয়ে শামকের খোলকের মতো প্যাঁচানো নালিকা বা ককলিয়া গঠন করে। প্যাঁচানো নালিকা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে। এই তরল পদার্থকে এন্ডোলিম্ফ বলে। ককলিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে অর্গান অব কর্টি নামক শ্রবণ ইন্দ্রিয় থাকে। অন্তঃকর্ণ অভিটরী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে শ্রবণ উদ্দীপনা পাঠায়।



চিত্র ১২.২৫ : মানুষের কানের গঠন প্রণালী

শ্রবণ প্রক্রিয়া

শব্দ তরঙ্গ কর্ণছত্র দ্বারা গৃহীত হয়ে কর্ণকুহর দিয়ে কর্ণপটহে আঘাত করার ফলে শব্দ তরঙ্গ স্পন্দিত হয়। স্পন্দিত শব্দ তরঙ্গ মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় তীব্রতর হয়। এ অবস্থা অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফ ও এন্ডোলিম্ফ তরলে পৌঁছে এবং সেখানে তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং ককলিয়ায় অবস্থিত “অর্গান অব কর্টি” এর সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত করে। এ উদ্দীপনা অভিটরী স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে প্রেরিত হলে আমরা শুনতে পাই।

কানের রোগ ও প্রতিকার

কানে ময়লা জমলে, আঘাত লাগলে, কানে কাঠি বা অন্য কোনো শক্ত বস্তু দিয়ে কান খোঁচালে কানের পর্দা ফেটে কানের অসুখ দেখা দিতে পারে। কানে পানি জমে সংক্রমণ হলে কানে গুঁজ জমে কানের দারুণ ক্ষতি করতে পারে। এ ছাড়া জন্মগতভাবে কেউ কেউ বধির হতে পারে। এ সব রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কানের যত্ন নিতে হবে। এছাড়া কানে কোনো বাইরের বস্তু অথবা পোকামাকড় ঢুকলে চিকিৎসকের পরামর্শে তা কান থেকে বের করতে হবে।

নাক

মাথার সামনে নাক অবস্থিত। এটি একটি স্নাণেন্দ্রিয়। নাকের ভিতরে এক প্রকার ঝিল্লির অন্তঃআবরণ থাকে। ঝিল্লিকে স্নাণঝিল্লি বলে। এটা অসংখ্য স্নাণকোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। স্নাণকোষ অলঙ্ঘ্যটির স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

কোনো গন্ধপূর্ণ বস্তু থেকে নির্গত গন্ধযুক্ত উদ্দীপক স্নাণ কোষসমূহের সংস্পর্শে এসে সেগুলো উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং মস্তিষ্কে অনুভূতি প্রেরণ করে। ফলে আমরা স্নাণ অনুভব করি।

রোগ ও প্রতিকার : সর্দি ও মস্তিষ্কের কোনো অসুখ হলে আমাদের স্নাণশক্তি লোপ পেতে পারে। নসি বা অন্য কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহারে স্নাণশক্তি ব্যাহত হয়। তাই নাকের কোনো সমস্যায় চিকিৎসকের শরণাগত হওয়া উচিত।

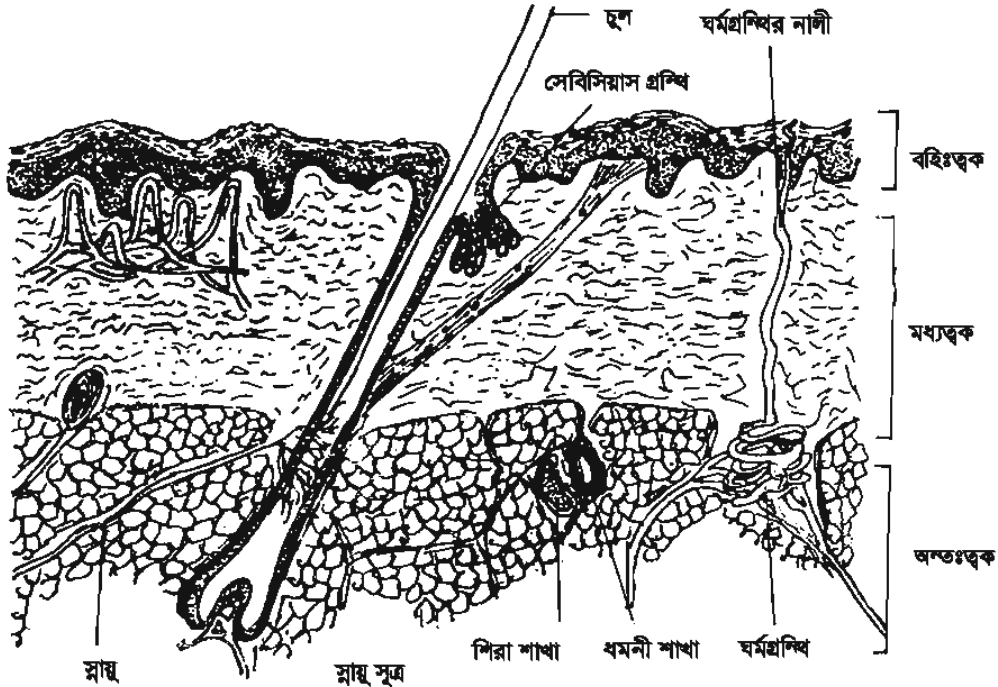
জিহ্বা : মুখ গহ্বরে অবস্থিত লম্বা পেশিবহুল অঙ্গটি হল জিহ্বা। এটি স্বাদ ইন্দ্রিয়। জিহ্বার অগ্রভাগ ও পাশে অসংখ্য স্বাদ কোরক থাকে। অগ্রভাগের স্বাদ কোরকগুলো মিষ্টি, পার্শ্ববর্তীগুলো লবণ ও অম্ল স্বাদ অনুভব করে। মধ্যের কোরকবিহীন অংশে স্পর্শবোধ হয় না। এছাড়া জিহ্বার পশ্চাতে বড় আকারের কোরকগুলো তিক্ত স্বাদ অনুভব করে।

ত্বক

ত্বক দেহের বহিঃআবরণ ও স্পর্শানুভূতি ইন্দ্রিয়। ত্বক তিনটি স্তরে দিয়ে গঠিত :

১। বহিঃস্তর বা বহিঃত্বক : এ স্তর চ্যাপ্টা আবরণী কোষদ্বারা নির্মিত। এখানে কোনো রক্তজালিকা অথবা স্নায়ু থাকে না। অবশ্য এখানে লোম থাকে। এর কোষগুলো ক্ষয় পায় এবং নতুনভাবে আবার সৃষ্টি হয়। এ স্তরে ঘামাচি, ফোঁস্কা, কড়া ইত্যাদি হয়ে থাকে।

২। মধ্যত্বক বা ডার্মিস : এ স্তরের কোষগুলো জীবন্ত ও অসংখ্য রক্তজালিকা ও স্নায়ুজালক সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর পরিমাণে রঞ্জক পদার্থ বর্তমান।



চিত্র ১২.২৬ : মানুষের ত্বকের অনুচ্ছেদ

৩। **অন্তঃত্বক বা হাইপোডার্মিস :** ত্বকের সর্বনিম্নস্তর। এখানে পেশি, ধমনী, শিরা, স্নায়ুসহ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি, ইত্যাদি ছড়ানো থাকে। গ্রন্থিসমূহের মধ্যে তেল ও ঘর্মগ্রন্থি প্রধান। এখানেই লোমকূপসমূহ অবস্থিত। ত্বক দেহকে বাইরের আঘাত ও রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে। ত্বক দ্বারা স্পর্শ, বেদনা, ঠান্ডা প্রভৃতি অনুভূত হয়। দেহ সূর্য থেকে অতি বেগুনি রশ্মি গ্রহণ করে দেহে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি করে।

রোগ ও প্রতিকার : বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ। যেমন—খোস, পাঁচড়া, দাদ, একজিমা, প্রভৃতি পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রায়ই দেখা যায়। এ ছাড়া যৌন রোগের কারণে ত্বক সংক্রমিত হতে পারে। স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নির্মল জীবন যাপন ত্বকের রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া দরকার। অপরাপর কয়েকটি চর্মরোগ হচ্ছে রিং ওয়ার্ম, ডার্মাটাইটিস, কুষ্ঠ ইত্যাদি চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য হয়।

প্রজননতন্ত্র

বংশ বিস্তার তথা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীব প্রজননে লিপ্ত হয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মানব প্রজননের উল্লেখযোগ্য দিক হল, সঙ্গমের ফলে নিষেক দেহের অভ্যন্তরে ঘটে। ভ্রূণ বিকাশ মাতৃদেহে সংঘটিত হয় এবং পরবর্তীতে সন্তান প্রসব করে।

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা

পুরুষ প্রজননতন্ত্র নিম্নবর্ণিত অঙ্গ দিয়ে গঠিত—

১। **শুক্রাশয় :** উদরের নিম্ন প্রান্তে বাহিরে এক জোড়া অভ্যন্তরীণ বা স্ক্রোটাম থলিতে এক জোড়া শুক্রাশয় অবস্থিত। শুক্রাশয়ের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র নালিকা থাকে। এদের সেমিনিফেরাস নালিকা বলে। শুক্রাশয়ের এ নালিকাসমূহে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এখানে টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। ফলে পুরুষ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ লাভ করে।

২। **এপিডিডাইমিস :** সেমিনিফেরাস নালিকাসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পাকানো নালিকায় উন্মুক্ত হয়। একে এপিডিডাইমিস বলে। এ নালিকায় শুক্রাণু থাকে।

৩। **ভাস ডিফারেন্স :** এপিডিডাইমিসের পরবর্তী অংশকে ভাসডিফারেন্স বলে। বস্তুত এটাই প্রধান শুক্রনালী। শুক্রনালী পরবর্তীতে ইউরেথ্রা নামক অংশে উন্মুক্ত হয়।

৪। **ইউরেথ্রা :** ইউরেথ্রা প্রসারিত হয়ে শিশ্নে প্রবেশ করে। শিশ্ন অসংখ্য রক্ত নালী ও যোজক কলা সমন্বয়ে গঠিত।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা

স্ত্রী জননতন্ত্র নিম্নবর্ণিত অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত

১। **ডিম্বাশয় :** স্ত্রীদেহে দেহগহ্বরের তলদেশে বৃকের পিছনে একজোড়া ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বাশয় জরায়ুর সঙ্গে পর্দা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ডিম্বাশয়ের প্রাচীরে বিভিন্ন অবস্থার ফলিকুল দেখা যায়, যার মধ্যে পরিপক্ব ফলিকুলের ভিতর ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয়ের মধ্যে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নামক স্ত্রী হরমোন নিঃসৃত হয়।

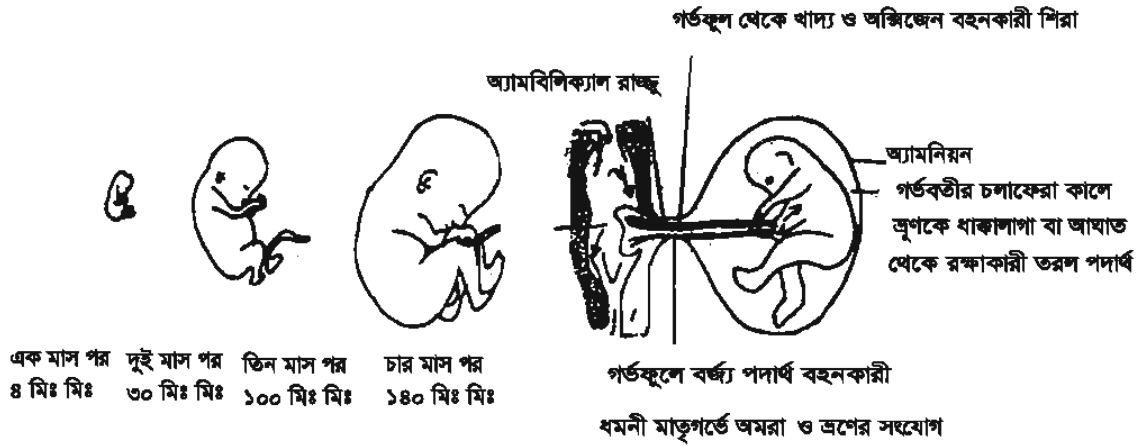
২। **ডিম্বনালী :** জরায়ু থেকে দুটি ডিম্বনালী উৎপন্ন হয়ে ডিম্বাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অবশেষে পেরিটোনিয়াম গহ্বরে উন্মুক্ত হয়েছে। ডিম্বনালী, ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু জরায়ুতে বহন করে।

৩। **জরায়ু :** এটি একটি বিস্তৃত ফাঁপা থলি। জরায়ুর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। মূত্রাশয় ও মলাশয়ের মাঝামাঝি জরায়ুর অবস্থান। এখানেই নিষিক্ত ডিম্ব ও ভ্রূণ বিকাশের মাধ্যমে বৃন্দ পৈতে থাকে।

৪। যোনি : জরায়ু থেকে ভালভা পর্যন্ত বিস্তৃত নালীকে যোনি বলে। যোনিপথের প্রাচীর ভাঁজযুক্ত।

৫। ভালভা : যোনিপথের মুখে কতকগুলো অঙ্গকে একত্রে ভালভা বলা হয়। এর মধ্যে (ক) লেবিয়ামেজোরা, (খ) লেবিয়ামাইনোরা, (গ) ক্লাইটোরিস, (ঘ) ভেস্টিবিউল, (ঙ) ভেস্টিবিউলার গ্রন্থি প্রধান। ভালভা যোনি মুখকে ঢেকে রাখে।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের পর্যায়ক্রম এবং অমরা ও ভ্রূণের সংযোগের জটিল অবস্থান চিত্র ১২.২৭-১২.২৮ এ দেখানো হল।



চিত্র ১২.২৭: মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশের পর্যায়ক্রম

চিত্র ১২.২৮: মাতৃগর্ভে অমরা ও ভ্রূণের সমন্বয়ে গঠিত

নিষেক

সজামকালে পুরুষ জনন কোষ বা শুক্রাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশের পর একটি মাত্র শুক্রাণু পরিপক্ব ডিমের সাথে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে। ফলে জাইগোট গঠন হয়। মাতৃদেহে জরায়ুর ভেতর ভ্রূণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীকালে সন্তান প্রসব ঘটে।

রোগ ও প্রতিকার

১। সিকিলিস : ট্রেমপোনিমা প্যাণ্ডিডাম নামক জীবাণুর উপস্থিতিতে এ রোগের সৃষ্টি হয়। যৌন সংসর্গে এ রোগ হয়। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে এ রোগ আরোগ্য হয়।

২। গনোরিয়া : নেইসেরিয়া গনোরিয়া নামক জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের চিকিৎসা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার।

৩। AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) : HIV নামক রোটোভাইরাসের সংক্রমণে এ রোগের উৎপত্তি। চিকিৎসা অজ্ঞাত। ইনজেকশন, রক্তদান বা গ্রহণ এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্কের কারণে এ রোগ হয়। এ সমস্ত বিষয়ে সংযত হওয়া এ রোগের প্রতিকার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। অ্যালভিনাস থেকে কোন প্রকারের অক্সিজেন কৈশিক আদিকার প্রবেশ করে?

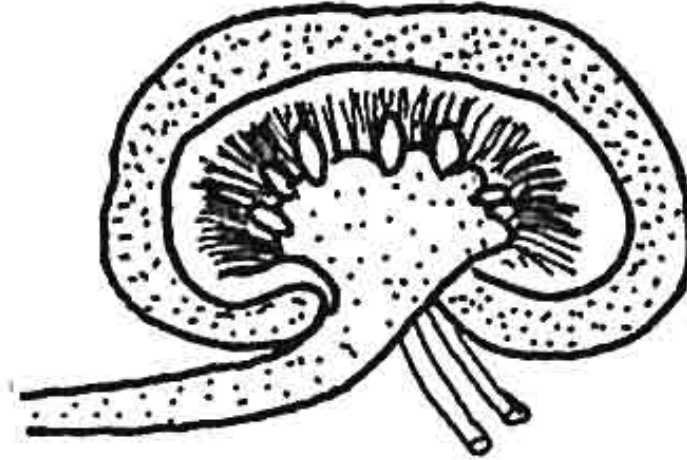
- | | |
|-----------|------------|
| ক. শোষণ | খ. ব্যাপন |
| গ. স্রোতন | ঘ. পরিবহণ। |

২। নিচের তিনটি বিবৃতি দেওয়া হল—

- হৃৎপিণ্ড সেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালন করে বিভিন্ন অৈবিক কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।
- ফুসফুস গ্যাসীয় বিনিময়ের মাধ্যমে খাল্য পরিপাকের সহায়তা করে।
- নেত্রন রক্ত থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন করে রক্ত দূষণ মুক্ত করে।

নিচের কোমটি সঠিক?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. ii |



উপরের চিত্র অবলম্বনে নিচের ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩। চিত্রটি মানব দেহের কোন ভাগের অংশ?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. পরিপাক ভাগের | খ. স্রোতন ভাগের |
| গ. শ্বসন ভাগের | ঘ. স্নায়ুভাগের। |

৪। চিত্রে প্রদর্শিত অঙ্গটিতে রয়েছে—

- মেডুলা, কর্টেক্স, পেলভিস, ইউরেটার।
- ক্লকাস, ইউরেটার, অ্যালভিনাস, প্রোমেডুলাস।
- বোম্বাল ক্যালসুলা, প্রোমেডুলাস, বৃকীয় সালিকা, মেডুলা।

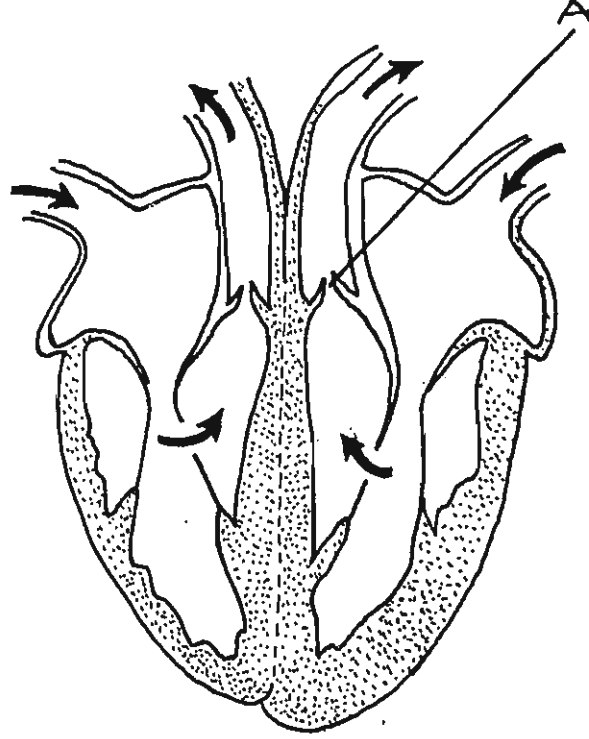
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. iii



সৃজনশীল প্রশ্ন

- উপরের চিত্রে প্রদর্শিত অঙ্গটি দ্বারা মানুষের কোন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়?
- A চিহ্নিত অংশটি থাকার সুবিধা কী?
- রক্তের গতিপথ ঐকে দেখাও? কীভাবে অঙ্গটির মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে?
- দেহের প্রতিটি কোষে রক্ত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেহকে সচল ও সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে অঙ্গটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শব্দের কথা

আমরা এক শব্দময় জগতে বাস করছি। জন্মের পর থেকেই আমরা নানা রকম শব্দের সঙ্গে পরিচিত হই। পাখ-পাখালীর ডাক, যানবাহনের আওয়াজ, গাড়ির হুইসেল, কলকারখানার সাইরেন, উড়োজাহাজের শব্দ, মেঘের গর্জন, ফেরিওয়ালার ডাক প্রভৃতি কত রকমের শব্দই না প্রতিনিয়ত আমাদের কানে আসে। কিন্তু শব্দ কী? শব্দ এক প্রকার শক্তি। বস্তুর কম্পনের ফলে সৃষ্ট এই শক্তি অবিচ্ছিন্ন ও স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের স্তরের দ্বারা তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের কানে পৌঁছে এবং শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

চতুর্দিককার এত যে শব্দ, তা কীরূপে উৎপন্ন হয়, তার উৎসই বা কী এটা জানতে ইচ্ছা হয়, তাই না?

শব্দের উৎস : কোনো ধাতব বস্তুকে আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ শোনা যায়। স্কুলের ঘণ্টায় হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘণ্টা ধ্বনি শুনে থাকি। ঘণ্টাটি বাজার সময় কখনও ধরে দেখেছি কি? দেখবে, আঘাতের ফলে এর মধ্যে প্রচণ্ড কম্পন হচ্ছে। কাঁপুনি আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আর শব্দের তীব্রতাও কমে যায়। হাত দিয়ে চেপে ধরলে ঘণ্টাটির কম্পন থামার সাথে সাথে শব্দও থেমে যায়।

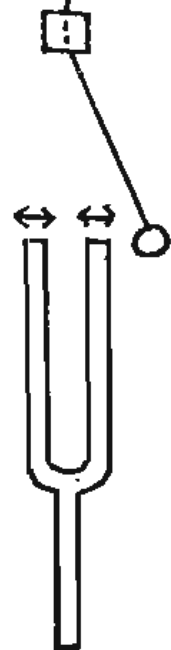
একটি কাঁসার বাটিতে আঘাত করে দেখতে পার।

বাটিটি কাঁপছে, আর শব্দ নির্গত হচ্ছে। তা হলে আমরা বলতে পারি যে কোনো বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। যে বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয় তাকে শব্দের উৎস বা স্রস্টক বলে। এ শব্দ কীরূপে আমাদের কানে পৌঁছায়? কোনো বস্তু যখন কাঁপে তখন বস্তুর কম্পন বাতাসকে আন্দোলিত করে। বাতাসের এ আন্দোলন তরঙ্গাকারে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সময় এ তরঙ্গ আমাদের কানে এসে পৌঁছে। বায়ুর এ স্পন্দন আমাদের কানের পর্দাকেও একইভাবে আন্দোলিত করে। ফলে আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, আমরা শব্দ শুনি।

শুকুরে টিল ছুড়লে দেখতে পাবে যে একটি বৃত্তাকার তরঙ্গ চারদিকে বিস্তার লাভ করছে। ঠিক তেমনি কোনো জড় মাধ্যমে কোনো বস্তুকে স্পন্দিত করলে স্পন্দন জড় মাধ্যমকে আন্দোলিত করে— ফলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গ এক সময় আমাদের কানে এসে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়।

পরীক্ষা-১ : কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা চিত্র-১৩.১ এ প্রদর্শিত পরীক্ষাটির সাহায্যে ভালোভাবে বুঝা যায়।

একটি সুরেলী কাঁটা নাও। এখন একটি শোলার বলকে কোনো অবলম্বন থেকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দাও যেন বলটি সুরেলী কাঁটার এক বাহুর প্রান্তকে স্পর্শ করে থাকে। একটি রবার প্যাড দ্বারা সুরেলী কাঁটার একটি বাহুতে আঘাত করলে কাঁটাটি কাঁপতে থাকবে এবং শব্দ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে লক্ষ করবে যে, কাঁটাটি শোলার বলটিকে বার বার আঘাত করছে এবং বলটি দূরে সরে যাচ্ছে। এখন কাঁটাটি হাত দিয়ে ধরার সাথে সাথে এর কম্পন বন্ধ হয়ে যাবে এবং শব্দও থেমে যাবে। একই সাথে বলটিও থেমে যাবে। অতএব বলা যায়, কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং ঐ কম্পনশীল বস্তুই শব্দের উৎস।



চিত্র ১৩.১ : কম্পনশীল সুরেলী কাঁটা শোলার বলকে বার বার আঘাত করছে।

মানুষ কীরূপে শব্দ করে : মানুষের বাকযন্ত্রের ভেতর উল্টো V আকৃতির দুটো পাতলা পর্দা থাকে। এদেরকে স্বরতন্ত্রী বলে। স্বরতন্ত্রীর মধ্যে একটি সরু ছিদ্র থাকে। একে স্বরছিদ্র বলে। কথা বলার সময় ফুসফুস থেকে আগত বায়ু স্বরছিদ্র দিয়ে মুখ এবং নাকের ছিদ্রপথে প্রবাহিত হয়। এর ফলে স্বরতন্ত্রী দুটোতে কম্পন সৃষ্টি হয়। এদের কম্পনের ফলেই শব্দ উৎপন্ন হয়। স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সাথে যুক্ত মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা এদের ওপর প্রযুক্ত টান নিয়ন্ত্রণ করে কম্পন সংখ্যা পরিবর্তন করা যায়। এভাবেই বিভিন্ন সুরের শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। শিশু ও মহিলাদের স্বরতন্ত্রী পুরুষের স্বরতন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর সরু ও খাটো। ফলে প্রতি সেকেন্ডে এদের স্বরতন্ত্রীর কম্পন সংখ্যা পুরুষের স্বরতন্ত্রীর কম্পন সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। তাই এদের কণ্ঠনিঃসৃত স্বর বেশ তীক্ষ্ণ বা চড়া হয়।

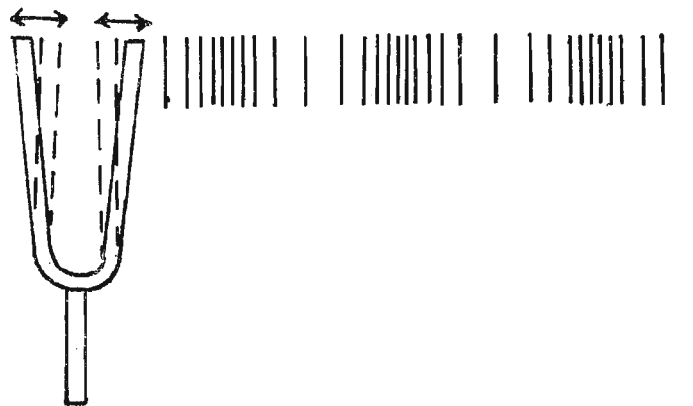
শব্দের প্রকার ভেদ : উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন মানুষের স্বরতন্ত্রীর কম্পনের হার বিভিন্ন রকম। কথা বলার সময় তোমার স্বরতন্ত্রীর কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে যদি ২০ থেকে ২০,০০০ বারের মধ্যে থাকে তবে তোমার দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তথা তোমার কথা তোমার বন্ধু শুনতে পাবে। এ ধরনের শব্দকে শ্রাব্য শব্দ বলে। আর এর কম্পনের হার যদি সেকেন্ডে ২০ বারের কম হয় তবে যে শব্দ হবে তা শোনা যাবে না। এ ধরনের শব্দকে অবশ্রুতি শব্দ বলে। কম্পমান বস্তুর কাঁপার হার সেকেন্ডে ২০,০০০ বারের বেশি হলে যে শব্দ নির্গত হয়, তাও শোনা যায় না। এ শব্দকে শ্রবণাতীত শব্দ বা অতিশব্দ বলা হয়।

শব্দ চলাচলের জন্য চাই একটা অবিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপক মাধ্যম। বায়ু মাধ্যমে কেমন করে শব্দ চলে তা বোঝার জন্য নিচের বিষয়টি লক্ষ কর।

বায়ু মাধ্যমে শব্দ সঞ্চালনের কৌশল : ধরা যাক, একটি সুরশলাকা কাঁপছে (চিত্র ১৩.২) এবং এ কারণে সৃষ্ট শব্দ বায়ু মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চালিত হচ্ছে। শলাকার ডান পাশের বাহুটির কম্পন বিবেচনা করা যাক। ডানদিকে যাওয়ার সময় এটি ডান পার্শ্বস্থ বায়ু স্তরগুলোকে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকে। ফলে, ডান পার্শ্বস্থ বায়ুস্তর সংকুচিত হয়। আবার বাহুটি যখন বামদিকে ফিরে আসে তখন ঐ বায়ুস্তরে প্রসারণ ঘটে। এভাবে সুরশলাকার একটি পূর্ণ কম্পনের ফলে বায়ুস্তর একবার সংকুচিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রসারিত হয়। বায়ু একটি অবিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপক মাধ্যম। তাই যতক্ষণ সুরশলাকা কাঁপতে থাকে ততক্ষণ এ সংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়া বায়ুর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এভাবে সুরশলাকার কম্পনের ফলে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটে আঘাত হানে এবং মস্তিষ্কে শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

উপরের ঘটনা থেকে বুঝতে পারছ, শব্দ বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে। শুধু তাই নয়, কঠিন অথবা তরল অথবা যে কোনো গ্যাসীয় মাধ্যমেও শব্দ চলাচল করে। কিন্তু মাধ্যম ছাড়া শব্দ যাতায়াত করতে পারে না। তাই চাঁদের পৃষ্ঠে পাশের নভোচারীর সঙ্গে কথা বলতে বেতার যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।

কয়েকটি সহজ পরীক্ষা করে তোমরা কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ চলার বিষয় বুঝতে পার।



চিত্র ১৩.২ : সুরেলী কাঁটার কম্পনে উৎপন্ন শব্দ সঞ্চালন পদ্ধতি

পরীক্ষা-২ : (ক) পানি ভরা পুকুরের একদিকে তুমি আর অন্য দিকে তোমার বন্ধু আছে। তোমার বন্ধুর হাতে একটি ঘণ্টা ও একটি হাতুড়ি আছে। দুজন একসাথে ডুব দাও। তোমার বন্ধু ঘণ্টাটি বাজালে তুমি ঘণ্টা ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাবে। অতএব বুঝতে পারছ, শব্দ পানিতে চলাচল করে।

(খ) একটা যান্ত্রিক ঘড়ি নাও। এর টিকটিক শব্দ কিন্তু বেশি দূর যায় না। ঘড়িটি টেবিলের ওপর রেখে টেবিলটির অন্য পাশে দাঁড়িয়ে এর টিক টিক শব্দ শুনতে চেষ্টা কর। শুনবে না। এখন টেবিলের কাঠের সঙ্গে কান পেতে শুনতে চেষ্টা কর। এ টিকটিক শব্দ ঠিকই তোমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ। অতএব প্রমাণিত হল যে কাঠের মধ্য দিয়ে শব্দ বিস্তার লাভ করে।

শব্দের বেগ : বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্রপাত হয়। আমরা প্রথম বিদ্যুতের চমক দেখি। তার কিছুক্ষণ পরই ভয়ানক বজ্রধ্বনি শুনে থাকি। কেন এমনটা হয়? আলো অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলে। ঘটনাস্থল থেকে আমাদের কাছে পৌঁছাতে আলোর যে সময় লাগে তা অতি নগণ্য। কিন্তু শব্দের জন্য এ সময়টা গণনা করা যায়। অর্থাৎ ঘটনাস্থল হতে শব্দ আমাদের নিকট পৌঁছতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে যায়। তা হলে বুঝতে পারছ, শব্দ একটা নির্দিষ্ট হারে দ্রুত অতিক্রম করে। শব্দ প্রতি সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে।

শব্দের বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব ও উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় বায়ু মাধ্যমে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ৩৩১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ০.৬ মিটার বৃদ্ধি পায়। ৩০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩৪৯ মিটার। আবার বায়ু ভিজা হলেও শব্দের বেগ বাড়ে।

এ জন্য মেঘলা দিনে অনেক দূরের শব্দও শোনা যায়। তরল পদার্থে শব্দের বেগ বায়ু অপেক্ষা বেশি, আবার কঠিন পদার্থে আরও বেশি। পানিতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৪৪০ মিটার। কাঠের মধ্যে শব্দের বেগ বায়ু অপেক্ষা প্রায় ১২ গুণ বেশি। আবার ইস্পাতের ভেতর শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায় ১৫ গুণ বেশি। কোনো মাধ্যমে শব্দের বেগ ঐ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা ও ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। যে মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা বেশি সে মাধ্যমেও শব্দের বেগও বেশি। অপর দিকে মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে শব্দের বেগ হ্রাস পায়।

শব্দের বেগ নির্ণয় : তোমরা দু জন কয়েক কিলোমিটার দূরবর্তী দুটো পাহাড়ের ওপর দাঁড়াও। এক জনের নিকট থাকবে একটি ‘স্টপওয়াচ’ বা থামা ঘড়ি ও অন্য জনের হাতে থাকবে একটি বন্দুক। বন্দুক ছোড়ার ধোঁয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম জন ঘড়ি চালিয়ে শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা কর। শব্দ শোনার সাথে সাথে ঘড়ি বন্ধ কর। সময় দেখে নাও। অতএব শব্দের বেগ=দূরত্ব ÷ সময়। বায়ু প্রবাহ জনিত কারণে এ পরীক্ষায় সঠিক ফল নাও পেতে পার। কারণ যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে শব্দের বেগ বেড়ে যায়। আর বায়ুর বিপরীত দিকে শব্দের বেগ কমে যায়। তবে দু জনে ঘড়ি ও বন্দুক বদল করে শব্দের বেগের গড়মান নির্ণয় করলে অনেক ভালো ফল পেতে পার। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফল পরীক্ষাকারীর ব্যক্তিগত দক্ষতা দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সময় রেকর্ড করতে পারলে এ ত্রুটি দূর করা যায়।

সমস্যা : মেঘ গর্জন শোনার ৫.৫ সেকেন্ড পর শব্দ শোনা গেল। উষ্ণতা ৩০° সেলসিয়াস হলে মেঘ কত উপরে ছিল?

সমাধান : মেঘের দূরত্ব = শব্দের বেগ × সময়, এখন আমরা জানি, ৩০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় শব্দের বেগ = ৩৪৯ মিটার। অতএব মেঘের দূরত্ব = শব্দের বেগ × সময় = ৩৪৯ × ৫.৫ = ১৯১৯.৫ মিটার।

শব্দের প্রতিধ্বনি : কোনো কঠিন তল বা দেয়াল বা পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে শব্দ প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ বাধা পেয়ে শব্দ আবার ফিরে আসে। এ ঘটনাকে শব্দের প্রতিফলন বলে। শব্দের এ প্রতিফলনের দরুন প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

মনে কর, তুমি একটি উঁচু দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিলে। তালির শব্দটি দেয়ালে বাধা পেয়ে কখন ফিরে আসবে তা নির্ভর করবে তোমার ও দেয়ালের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর। হাত তালি দেয়ার ০.১ সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি ফিরে এলেই কেবল তাকে আলাদাভাবে শোনা যাবে। কারণ মূল শব্দের অনুভূতি তোমার মস্তিষ্কে ০.১ সেকেন্ড কাল স্থায়ী হবে। এ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত শব্দ ফিরে এলে তুমি তাকে আলাদাভাবে বুঝতে পারবে না।

মেঘের গুড় গুড় শব্দের উৎপত্তি ঘটে শব্দের প্রতিধ্বনি থেকে। বিভিন্ন স্তরের মেঘ থেকে প্রতিফলিত একাধিক প্রতিধ্বনি পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ০.১ সেকেন্ড পর পর আমাদের কানে পৌঁছে বলেই আমরা একটানা গুড় গুড় শব্দ শুনতে পাই।

শূন্য বায়ুতে শব্দ সেকেন্ডে ৩৩১ মিটার যায়। অতএব ০.১ সেকেন্ড সময়ে শব্দ ৩৩.১ মিটার পথ অতিক্রম করে। অর্থাৎ, প্রতিফলক ১৬.৫ মিটার দূরে থাকলেই কেবল প্রতিধ্বনি শোনা যাবে।

বড় বড় হল ঘরে দেখা যায়, অনেক লোক কথা বললে গমগম শব্দ হতে থাকে। বক্তার কথা খেমে গেলেও কিছুক্ষণ তার রেশ থেকে যায়। শব্দ ঘরের দেয়ালে বারবার প্রতিফলিত হয়ে ঘোরে বলে এমনটা হয়। এটা খুবই অসুবিধাজনক। এ জন্য হল ঘরগুলোর দেয়ালে নরম ও অসমতল জিনিস ব্যবহার করা হয়। এতে শব্দ ভালো প্রতিফলিত হতে পারে না। গোলমাল হ্রাস পায়। আজকাল শব্দ শোষণের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

শব্দের প্রতিধ্বনির ব্যবহার : শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরতা, কুয়ার গভীরতা এবং খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় : নিচের চিত্রটি লক্ষ কর। সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য প্রেরক যন্ত্র T থেকে শব্দ প্রেরণ করা হয়। প্রেরক যন্ত্র T এর নিকট স্থাপিত একটি গ্রাহকযন্ত্রে হাইড্রোফোনের সাহায্যে সমুদ্রের তলা থেকে প্রতিফলিত শব্দ গ্রহণ করা হয় এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় নির্ণয় করা হয়।

ধরা যাক, সমুদ্রের গভীরতা = h

সুতরাং শব্দ কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব = $2h$

এ দূরত্ব অতিক্রম করতে মোট সময় = t

পানিতে শব্দের বেগ = v

অতএব, দূরত্ব = শব্দের বেগ \times সময়

অর্থাৎ, $2h = v \times t$

$$\text{বা, } h = \frac{v \times t}{2} \dots\dots(A)$$

এখন সমীকরণ (A) তে v এবং t এর মান বসিয়ে সমুদ্রের গভীরতা h নির্ণয় করা যায়।

কূপের গভীরতা নির্ণয়

কূপের গভীরতা নির্ণয় করতে হলে কূপের মুখে শব্দ উৎপন্ন করতে হবে। এ শব্দ পানির পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হবে।

ফলে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হবে। মূল শব্দ ও প্রতিধ্বনির মধ্যবর্তী সময় স্টপ ওয়াচের সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে।

ধরা যাক, কূপের গভীরতা = h

অতএব, শব্দ কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব = $2h$

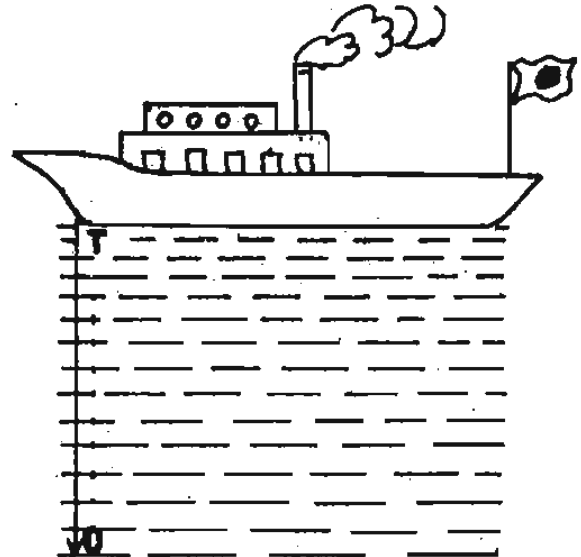
এ দূরত্ব অতিক্রম করতে মোট সময় = t

বায়ুতে শব্দের বেগ = v

এখানে শব্দ কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব, $2h = v \times t$

সুতরাং কূপের মুখ থেকে পানি পৃষ্ঠের দূরত্ব তথা কূপের গভীরতা,

$$h = \frac{v \times t}{2} \dots\dots(B)$$



চিত্র ১৩.৩ : সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়

সমীকরণ (B) থেকে কূপের গভীরতা h এর মান নির্ণয় করা যায়। কূপের গভীরতা জানা থাকলে একই পদ্ধতিতে শব্দের বেগও নির্ণয় করা যায়।

খনিজের সন্ধান : খনিজ পদার্থের সন্ধানের জন্য ভূ-তাত্ত্বিকগণ মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূ-গর্ভে শব্দ প্রেরণ করে থাকেন। এ শব্দ মাটির নিচের বিভিন্ন শিলা স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। হাইড্রোফোন নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিফলিত ধ্বনি ধারণ করা হয়। এ যন্ত্রের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিধ্বনির লেখচিত্র অংকিত হয়। এ লেখচিত্র পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন শিলার গঠন প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর নিচের অনুচ্ছেদ হতে দাও।

কুয়া হতে পানি উত্তোলনের সময় অসাবধানতাবশত জরিদা বেগমের কানের দুল কুয়ার মধ্যে পড়ে যায়।

সে কুয়ার গভীরতা পরিমাপের উদ্যোগ নেয়। হিসাব করে দেখা গেল যে কুয়ায় শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে 0.1 সেকেন্ড সময় লাগে। বায়ুতে শব্দের বেগ 331ms^{-1} ধরা হয়েছে।

১। কুয়ায় যে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে, তা হচ্ছে—

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ক. প্রতিফলিত শব্দ | খ. প্রতিসরিত শব্দ |
| গ. সরাসরি শব্দ | ঘ. প্রতিফলিত শব্দের শব্দ। |

২। কুয়ার গভীরতা কত পরিমাপ করা হয়েছিল?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. 16.55 m. | খ. 33.1 m. |
| গ. 1655 m. | ঘ. 3310m. |

৩। বড় বড় হল ঘরের দেয়ালে নরম ও অসমতল জিনিস ব্যবহার করা হয়। কারণ—

- এতে শব্দ ভালো প্রতিফলিত হতে পারে না।
- গোলমাল হ্রাস পায়।
- শব্দ শোষিত হয় না।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরতা, কুয়ার গভীরতা নির্ণয় করা যায় কিন্তু সাধারণ পুকুরের গভীরতা নির্ণয় করা যায় না, কারণ—

- পুকুর খুব ছোট

ii. পুকুরে শব্দ প্রতিফলিত হয় না

iii. পুকুরের গভীরতা কম।

নিচের কোনটি সঠিক?

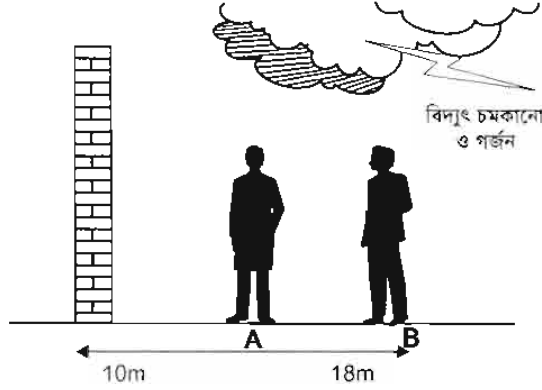
ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



উপরের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর।

ক. বিদ্যুতের আলো এবং মেঘের গর্জনের আওয়াজ কোনটি আগে অনুভূত হবে?

খ. উপরের কোন অবস্থানের (A অথবা B) লোকটি প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে ব্যাখ্যা কর।

গ. 0.1সেকেন্ড পরে মেঘের গর্জনের প্রতিধ্বনি শোনা গেলে শব্দের বেগ নির্ণয় কর।

ঘ. আমাদের জীবনে শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহারের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

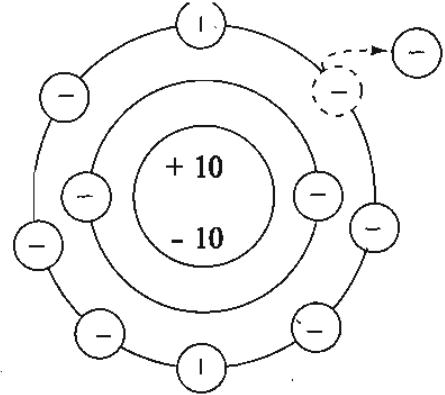
বিদ্যুৎ শক্তি ও গৃহে বিদ্যুতের ব্যবহার

তোমরা সকলেই রাতের অন্ধকারে পথ চলতে টর্চ জ্বালাও, গান শোনা ও অনুষ্ঠান দেখার জন্য রেডিও, টিভি চালাও, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খবর আদান-প্রদানে টেলিফোন ব্যবহার কর। এ সকল যন্ত্রপাতি বিদ্যুতে চলে। আর কী কী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাক, বলতে পার কি? বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, কল-কারখানা ইত্যাদি প্রায় সব কিছুতেই এ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলতে পার বিদ্যুতের বহুমুখী ব্যবহার আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের অবদান সবচেয়ে বেশি। বিদ্যুৎ কী? বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। বিদ্যুতের উৎপাদন, ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

বিদ্যুৎ : শীতকালে শুকনো চুল ঝাঁচড়াতে গিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা চিবুনির গট গট শব্দ শুনে থাকবে। ঐ চিবুনি কাগজের ছোট ছোট টুকরাকে আকর্ষণ করতেও তোমরা লক্ষ করে থাকবে। এমনটা কেন হয়, তোমরা বলতে পার? চুলের সঙ্গে চিবুনির ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এ বিদ্যুৎ শক্তির কারণেই চিবুনি কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। একইভাবে এক টুকরো সিল্কের কাপড় দিয়ে এক খণ্ড কাচকে ঘর্ষণ করেও তোমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পার।

দুটো বস্তুর ঘর্ষণের ফলে কেন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? এর কারণ নিহিত রয়েছে পদার্থের গঠন কৌশলে। প্রত্যেক পদার্থই পরমাণু দ্বারা গঠিত। আর পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটন। ইলেকট্রন ঋণ চার্জ এবং প্রোটন ধন চার্জ বহন করে। যেহেতু প্রত্যেক পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান সেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি পরমাণুই চার্জ নিরপেক্ষ থাকে।

এক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে থাকে এবং নিউট্রন ও প্রোটনগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত থাকে। ঘর্ষণের সময় দুটি বস্তুর পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এদের মধ্যে থেকে কোনো কোনো ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একটি বস্তুর পরমাণু ইলেকট্রন হারায় এবং অপর বস্তুর পরমাণু ঐ ইলেকট্রন গ্রহণ করে। যে বস্তুর পরমাণু থেকে ইলেকট্রন অপসারিত হয় সে বস্তুতে ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনের সংখ্যা বেশি হয়। এক্ষেত্রে বস্তুটি ধনাত্মক চার্জে আহিত হয়। যে বস্তুর পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে বস্তুতে প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি হয়। ফলে বস্তুটি ঋণাত্মক চার্জে আহিত হয়।



চিত্র ১৪.১ : একটি নিউন পরমাণু

ঘর্ষণের ফলে যে চার্জ উৎপন্ন হয় তা কাচ, সিল্ক বা চিবুনিতে আবদ্ধ থাকে। এ ধরনের বিদ্যুতকে স্থির বিদ্যুৎ বলে। অবশ্য একটু সুযোগ পেলেই এ সকল চার্জ অন্যত্র চলে যায়।

পরীক্ষা-১ : চার্জিত একটি চিবুনিকে ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধর। দেখবে, এটি কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করছে। খালিপায়ে ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে এবার চিবুনিটির উপর তোমার হাত বুলিয়ে নাও। আবার কাগজের টুকরার

নিকট ধর। এখন চিবুনিটি আর কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করেছে না। কেন এ রকম হল, বলতে পার? চার্জগুলো গেল কোথায়?

আসলে চিবুনিটি হাত দিয়ে স্পর্শ করার সময় চার্জগুলো সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত দিয়ে শরীর বেয়ে মাটিতে চলে গেছে। ফলে চিবুনি আর কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে না।

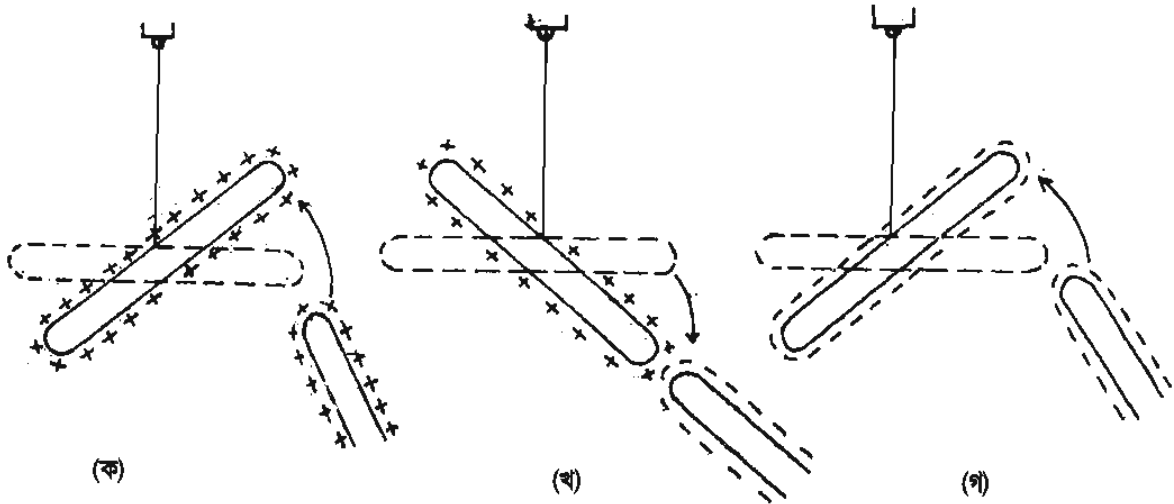
স্থির বিদ্যুৎ আমাদের কোনো কাজ করতে পারে না, তাই আমরা এর প্রতি বেশি আগ্রহী নই। তবে এ বিদ্যুৎ বা চার্জ সুযোগ পেলেই গতিশীল হয়। তখন এরা অনেক কাজ করতে পারে। এ ধরনের চলমান চার্জকে আমরা চল বিদ্যুৎ বলি। অতএব দেখা গেল, বিদ্যুৎ দুই প্রকার। যথা— স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ।

স্থির বিদ্যুৎ : ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইবোনাইট, প্রাফটিক, রবার, গাটাপর্চা, কাচ ইত্যাদিকে ফ্লানেল, সিল্ক, পশমযুক্ত বিড়ালের চামড়া ইত্যাদি দিয়ে ঘর্ষণ করে সহজে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

পরীক্ষা 'ক': একটি কাচদণ্ড লও। এক টুকরা শুকনা রেশমের কাপড় দ্বারা দণ্ডটিকে উত্তমরূপে ঘর্ষণ কর। একে একটি সিল্কের সূতরা দ্বারা ঝুলিয়ে দাও (ক)। ঘর্ষণের ফলে এটি চার্জপ্রাপ্ত হয়েছে। এবার অনুরূপ আর একটি কাচ দণ্ডকে শুকনা রেশমের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করে আগের কাচদণ্ডের নিকট নিয়ে ধর। দেখবে, ঝুলন্ত দণ্ডটি দূরে সরে যাচ্ছে। এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।

(খ) এবার একটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেলের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করে ঝুলন্ত কাচদণ্ডের নিকট ধর। দেখবে, কাচদণ্ডটি ইবোনাইট দণ্ডের দিকে সরে আসছে। অর্থাৎ এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

(গ) এবার আর একটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেলের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করে আগের ইবোনাইট দণ্ডের নিকট ধর। দেখবে, এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।



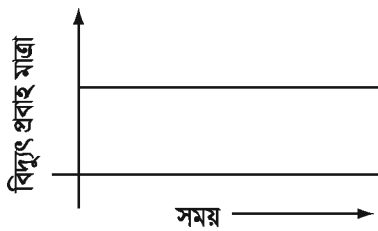
চিত্র ১৪.২ : চার্জের আকর্ষণ বিকর্ষণ ধর্ম

উপরের ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রেশমের কাপড়ের ঘর্ষণের ফলে কাচ দণ্ডে যে প্রকৃতির চার্জ উৎপন্ন হয়েছে, ফ্লানেলের কাপড়ের ঘর্ষণের ফলে ইবোনাইট দণ্ডে তার বিপরীত প্রকৃতির চার্জ উৎপন্ন হয়েছে। এ দুটো চার্জের নাম ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ।

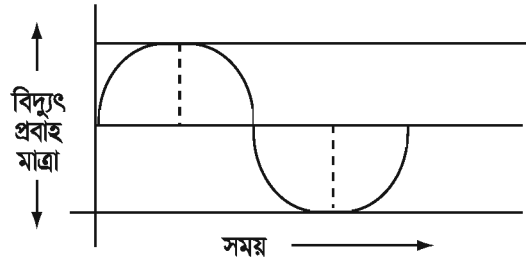
বিদ্যুতের ধর্ম : চার্জ বা বিদ্যুতের দুটো ধর্ম আছে, যথা—

(ক) **আকর্ষণ ধর্ম :** বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ১৪.২ এর খ চিত্রে এ আকর্ষণের ঘটনা দেখানো হয়েছে।

(খ) **বিকর্ষণ ধর্ম :** সমজাতীয় চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ১৪.২ এর ক ও গ চিত্রে বিকর্ষণের এ ঘটনা দেখানো হয়েছে।



ক) একমুখী প্রবাহ



খ) পরিবর্তী প্রবাহ

চিত্র ১৪.৩

চলবিদ্যুৎ : দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে চল বিদ্যুৎ। এ চল বিদ্যুৎই আমাদের পাখা ঘুরায়, বাতি জ্বালায়, কল-কারখানা চালায় এবং আরও কত যে কাজ করে তা বলে শেষ করা যায় না।

বিদ্যুৎ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় তবে সে প্রবাহকে একমুখী (ডি.সি) প্রবাহ বলে (চিত্র-ক)। আর প্রবাহকালে বিদ্যুৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যদি দিক পরিবর্তন করে তবে সে প্রবাহকে দিক পরিবর্তী (এ.সি) প্রবাহ বলে (চিত্র খ)। বিদ্যুৎ কোষ, ডায়নামো প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে চল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

চল বিদ্যুৎ কী

আমরা জানি পরস্পরের সাথে একটি নল দ্বারা যুক্ত দুটি পাত্রে মধ্য রক্ষিত তরল তলের উচ্চতার পার্থক্য থাকলে তরল পদার্থ উচ্চ তল থেকে নিম্নতলের দিকে প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য ঘটলে ঐ পরিবাহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রাপ্ত প্রবাহমান বিদ্যুৎকে চল বিদ্যুৎ বলে।

সাধারণ বিদ্যুৎকোষ

সাধারণ বিদ্যুৎকোষের প্রথম উদ্ভাবক হচ্ছেন ইটালীয় বিজ্ঞানী আলেকসান্দ্রো ভোল্টা। তাই তাঁর নামানুসারে একে ভোল্টার-বিদ্যুৎ কোষ বলা হয়।

একটি কাচপাত্রে কিছু পাতলা সালফিউরিক এসিড নাও। এতে একটি তামার ও একটি দস্তার পাতের কিয়দংশ এমনভাবে ডুবাও যাতে এরা পরস্পরকে স্পর্শ না করে। এক্ষেত্রে দস্তা ও সালফিউরিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে দস্তার পাত ও তামার পাতের মধ্যে একটি বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ কারণে তামা ও দস্তার পাত দুটোর বাইরের প্রান্তদ্বয় একটি তামার তার দ্বারা যুক্ত করলে তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকে।

সাধারণ বিদ্যুৎকোষের বিদ্যুৎ প্রবাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তামার পাতের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ জমে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণ বিদ্যুৎ কোষের এ দোষটিকে পোলারন বলে। একটি ব্রাশের সাহায্যে মাঝে মাঝে তামার পাতখানা ঘষে এবং বুদবুদ সরিয়ে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ আবার চলতে থাকে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় দস্তা ও সালফিউরিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ফলে দস্তা দ্রবীভূত হয়; কিন্তু তামার পাতের কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য দস্তার পাতটিকে সক্রিয় পাত এবং তামার পাতটিকে নিষ্ক্রিয় পাত বলে। বিদ্যুৎকোষের নিষ্ক্রিয় পাতের বাইরের প্রান্তকে ধন প্রান্ত এবং সক্রিয় পাতের বাইরের প্রান্তকে ঋণপ্রান্ত বলে।

বিদ্যুৎকোষ প্রস্তুত করতে তামা ও দস্তার ফলকের পরিবর্তে দস্তা ও কার্বন কিংবা দস্তা ও প্লাটিনাম ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়। তবে তামা ও দস্তা কিংবা দস্তা ও কার্বন ফলক ব্যবহার করলেই অপেক্ষাকৃত ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার সালফিউরিক এসিডের পরিবর্তে অন্য এসিডও ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি, তুঁতের দ্রবণ, সাধারণ লবণের দ্রবণ ইত্যাদি ব্যবহার করেও বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায়।

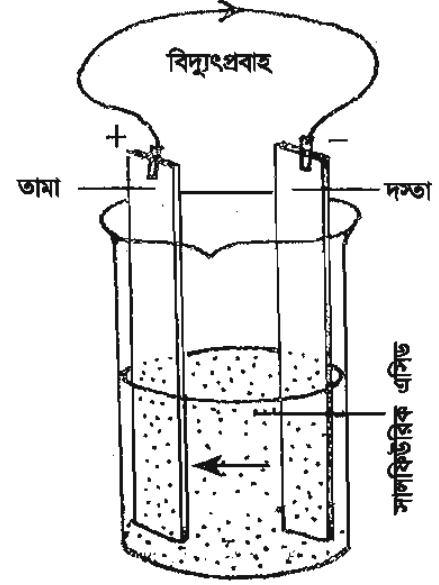
এ প্রকারের মৌল বিদ্যুৎকোষে রাসায়নিক শক্তির বিনিময়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু রাসায়নিক উপাদানগুলোর কোনো একটির কার্যকরী শক্তি শেষ হয়ে গেলে আর বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না।

ড্যানিয়েল সেল, লেকল্যান্স সেল প্রভৃতি মৌল বিদ্যুৎকোষে পোলারন দূর করার জন্য তুঁতের দ্রবণ, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

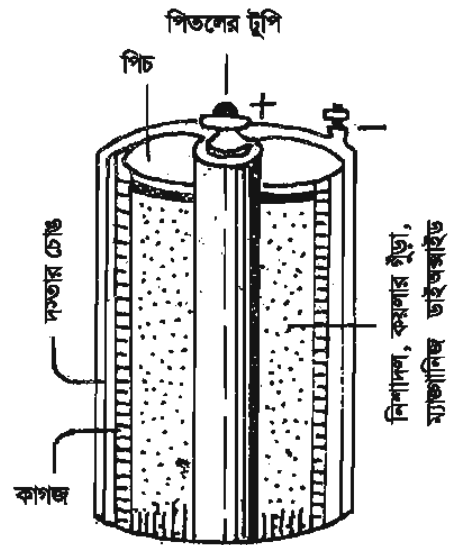
ড্রাইসেল (শুষ্ক বিদ্যুৎকোষ)

টর্চ লাইট ও ট্রানজিস্টার রেডিওতে আজকাল প্রচুর ড্রাইসেল ব্যবহৃত হয়। এতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ তরল অবস্থায় থাকে না। তাই একে ‘ড্রাই’ বা শুষ্ক বিদ্যুৎকোষ বলা হয়।

একটি দস্তার চোঙে নিশাদল, কয়লার গুঁড়া এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণের সাথে সামান্য পানি মিশিয়ে ‘লেই’ তৈরি করে দস্তার চোঙের মধ্যে ভর্তি করা হয়। চোঙের মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে বসানো হয় যাতে তা চোঙটিতে স্পর্শ না করে। কার্বন দণ্ডটির মাধ্যমে পিতলের টুপি লাগানো থাকে। বিদ্যুৎকোষটির উপরিভাগে কার্বন দণ্ডের চারপাশে গালা বা পীচের স্তর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দস্তার চোঙটির বাইরে একটি শক্ত কাগজের চোঙ থাকে। এ বিদ্যুৎকোষে দস্তার চোঙটি ঋণ-মেরু এবং কার্বন দণ্ডের উপরিভাগ ধন মেরু হিসাবে কাজ করে।



চিত্র ১৪.৪ : সাধারণ বিদ্যুৎকোষ



চিত্র ১৪.৫ : ড্রাইসেল

ড্রাইসেল আসলে এক ধরনের লেকল্যান্স সেল। এতে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড পোলারন নিবারকের কাজ করে। এতে সাধারণত ১.৫ ভোল্ট চাপের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

বিদ্যুতের ব্যবহার

কম্পিউটার, টেলিভিশন, টেলিফোন, রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। বিজ্ঞলী বাতি জ্বালাতে, বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরাতে এবং রিক্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন, কলকারখানা, ট্রাম ইত্যাদি চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে যে সকল কাজ সাধিত হয়, সেগুলোকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(ক) বিদ্যুৎপ্রবাহের তাপন ক্রিয়া;

(খ) বিদ্যুৎপ্রবাহের আলোকন ক্রিয়া;

(গ) বিদ্যুৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া;

(ঘ) বিদ্যুৎপ্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়া;

একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহের তাপন ক্রিয়া, আলোকন ক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়া প্রমাণ করা যায়।

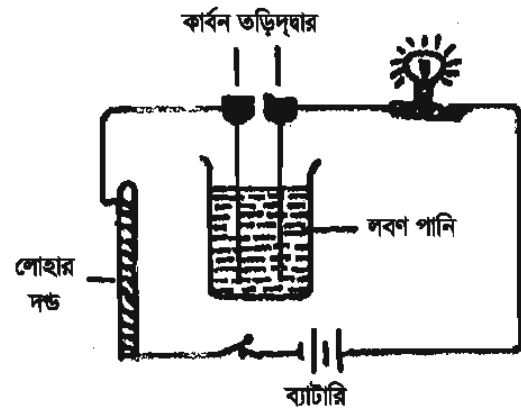
পরীক্ষণ ৩.৩৫ : একটি বীকারে কিছু লবণ পানি নাও। লবণ পানির দ্রবণের ভিতর দুটো কার্বন দণ্ডকে আংশিকভাবে ডুবাও। লক্ষ রাখতে হবে যেন এরা পরস্পরকে স্পর্শ না করে। এবার একটি নরম লোহার দণ্ড নাও এবং এটির উপর

একটি অন্তরিত তামার তার পঁচাও। তামার তারের এক প্রান্তকে কার্বন দণ্ডদ্বয়ের যে কোনো একটির মুক্ত প্রান্তের সাথে বৈদ্যুতিকভাবে যুক্ত কর। তারটির অপর প্রান্তকে একটি সুইচের মাধ্যমে একটি ব্যাটারির এক প্রান্তের সাথে যুক্ত কর। ব্যাটারির অন্য প্রান্তকে একটি বৈদ্যুতিক বাত্বের এক প্রান্তের সাথে যুক্ত করে বাত্বের অপর প্রান্তকে দ্বিতীয় কার্বন দণ্ডের মুক্ত প্রান্তের সাথে যুক্ত কর। এবার সুইচের সাহায্যে বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন কর। দেখবে বাত্বটি জ্বলে উঠেছে এবং অল্প সময়ের ভিতর এটি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। অপর দিকে আরো দেখতে পাবে যে নরম লোহার দণ্ডটি ক্ষণস্থায়ীভাবে চুম্বকে পরিণত হওয়ার কারণে এর নিকট আনীত আগপিনকে আকর্ষণ করছে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কার্বন তড়িৎদ্বারে বুদবুদ জমা হয়েছে।

এ পরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহের আলোকন ক্রিয়া, তাপন ক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল।

(ক) বিদ্যুৎপ্রবাহের তাপন ক্রিয়া : বিদ্যুৎপ্রবাহের তাপন ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বৈদ্যুতিক স্টোভ, বৈদ্যুতিক কেতলি, বৈদ্যুতিক চুল্লি, বিভিন্ন প্রকারের বাত্ব প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি হয়েছে।

(খ) বিদ্যুৎপ্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়া : বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করা যায়। বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎপ্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়া সংক্রান্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ইলেকট্রোপ্লেটিং। লোহা, তামা, ইত্যাদি ধাতুর উপর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদির প্রলেপ দেওয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলা হয়।



চিত্র ১৪.৬ : বিদ্যুতের তাপন ও আলোকন ক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়া।

একটি কাচপাত্রে কিছু তুঁতের দ্রবণ নিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করার পর দুটি তামার পাত আংশিকভাবে এতে ডুবানো হয়। পাত দুটির একটিতে বিদ্যুৎকোষের ধনাত্মক মেরু এবং অপরটিতে ঋণাত্মক মেরু সংযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম মেরুকে অ্যানোড এবং দ্বিতীয় মেরুকে ক্যাথোড বলা হয়। সুইচ অন করে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হলে ক্যাথোডে তামার প্রলেপ সঞ্চিত হয়। এ ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তাম্র ভোল্টামিটার বলা হয়।

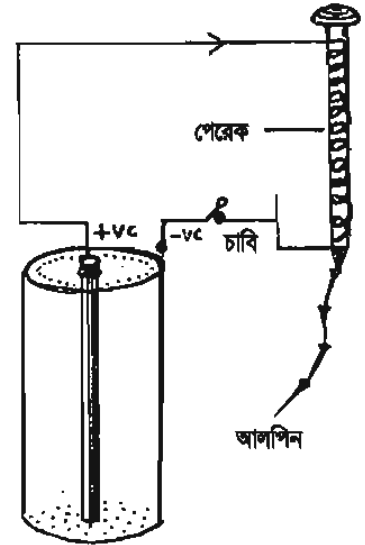
তাম্র ভোল্টামিটারের তামার ক্যাথোডের পরিবর্তে যদি একটি লোহার ক্যাথোড ব্যবহার করা হয় তবে লোহার ক্যাথোডের উপর তামার প্রলেপ জমবে। আবার লোহার ক্যাথোডের উপর রূপার প্রলেপ জমাতে হলে অ্যানোডটি তামার পরিবর্তে রূপার নির্মিত হতে হবে এবং তুঁতের দ্রবণের পরিবর্তে রূপার দ্রবণ সরবরাহ করতে হবে। অর্থাৎ ক্যাথোডের উপর যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে অ্যানোডটি সে ধাতুর হতে হবে এবং দ্রবণটিও সে ধাতুর দ্রবণ দ্বারা তৈরি হতে হবে।

ইলেকট্রোপ্লেটিং এর সাহায্যে অনেক কম মূল্যের ধাতুর উপর পাতলা প্রলেপ দিয়ে এসব ধাতুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা যায়। ফলে এসব ধাতুর দামও বেড়ে যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লোহার উপর টিনের বা এলুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে গ্যালভানাইজিং বলে। গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া লোহাকে মরিচা থেকে রক্ষা করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

(গ) বিদ্যুৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া : বিদ্যুৎশক্তিকে চুম্বক শক্তিতে রূপান্তর করে অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক পাখা, মোটর, জেনারেটর ইত্যাদিতে বিদ্যুৎশক্তিকে চুম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট চুম্বককে বৈদ্যুতিক চুম্বক বলা হয়।

একটি লোহার পেরেকের উপর তামার তারের কুণ্ডলী পাকিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করলে দেখা যাবে, পেরেকটি আকর্ষণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। কয়েকটি আলপিনকে ক্ষণস্থায়ী চুম্বকে পরিণত বড় পেরেকের কাছে আনলে আলপিনগুলোকে বড় পেরেকটি আকর্ষণ করে ধরে রাখবে (চিত্রে দেখানো হল)। আবার বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলে আলপিনগুলোকে ছেড়ে দেবে। এখানে বিদ্যুৎপ্রবাহের সময় সাময়িকভাবে লৌহ পেরেক চুম্বকে পরিণত হয়েছিল এবং প্রবাহ বন্ধের পর পরই এটি তার চুম্বকত্ব হারিয়েছে। পেরেকটি ইস্পাতের তৈরি হলে দেখা যায় প্রবাহ বন্ধ হলেও তার চুম্বকত্ব থেকে যায়। এভাবে উৎপাদিত চুম্বককে স্থায়ী চুম্বক বলা হয়। দণ্ড চুম্বক ও অশৃঙ্খলাকৃতি চুম্বক এভাবে বানানো হয়।

প্রতিটি চুম্বকের দুপাশে দুটি মেরু থাকে। একটিকে উত্তর মেরু এবং অপরটিকে দক্ষিণ মেরু বলা হয়। মেরু এমন একটি বিন্দু যেখানে



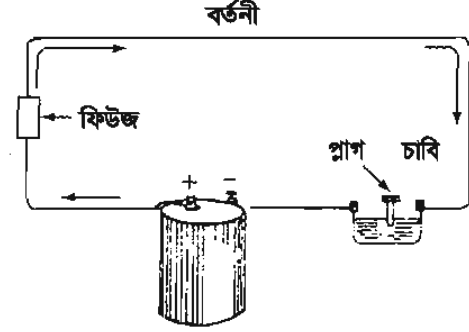
চিত্র ১৪.৭

সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ক্ষমতা থাকে। বানানো কোনো চুম্বকের কোনটি উত্তর মেরু এবং কোনটি দক্ষিণ মেরু তা নির্ণয় করতে হলে চুম্বকটিকে সূতা দিয়ে ঝুলানো অবস্থায় রাখা হয়। এ অবস্থায় অন্য একটি চুম্বকের উত্তর মেরুকে বানানো চুম্বকটির এক প্রান্তের নিকট আনলে যদি বিকর্ষণ দেখা যায় তখন বলা যাবে যে নতুন বানানো চুম্বকের উক্ত প্রান্তে উত্তর মেরু অবস্থিত কারণ চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

বিদ্যুৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ব্যবহার করে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ভারী বোঝা উত্তোলনের জন্য ক্রেন, ইত্যাদি যন্ত্র চালানো হয়। জেনারেটর বা ডায়নামো একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র যা চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। বৈদ্যুতিক মোটর বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে গতিশক্তি সঞ্চার করে। এ গতিশক্তি অন্য যন্ত্রে চালনা করে বিবিধ কাজ সম্পন্ন করা যায়। যেমন— বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে নলকূপ থেকে পানি উঠানো, চাল, আটা ইত্যাদি ভাঙানো ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করা হয়। এক কথায় বিদ্যুৎশক্তিকে চুম্বক শক্তিতে রূপান্তর করে অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়।

বিদ্যুৎ বর্তনী

কোষের বাইরে এবং ভেতরে যে পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে তাকে বিদ্যুৎ বর্তনী বলে। বর্তনীতে ব্যবহৃত সংযোগ তারে দু'প্রান্ত কোষের উদ্ভেজক পদার্থে আংশিক নিমজ্জিত দু'টো ধাতব পাতের দু'টো মুক্ত প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে। ধাতব পাতদ্বয়ের এ দু'টো প্রান্তকে কোষের টার্মিনাল বলে। বর্তনীর কোথাও ছেদ বা ফাঁক থাকলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না। বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার জন্য যে সকল তার ব্যবহার করা হয়, এগুলোর চারদিকে সাধারণত রবার, গালা, সুতা ইত্যাদি বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থের আবরণ থাকে। বর্তনীর তারে অপরিবাহী কোনো আবরণ না থাকলে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ তার স্পর্শ করলে শরীরে অত্যন্ত জ্বরে ঝাঁকুনি লাগে। বিদ্যুৎবাহী তারকে এজন্য জীবন্ত তার বলা হয়। এরূপ তার স্পর্শ করা বড়ই বিপজ্জনক, এতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ সকল দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিস্ত্রিরা বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় কাঠের টুল বা বেঞ্চের উপর দাঁড়ায় এবং হাতে রবারের দস্তানা পরে।



চিত্র ১৪.৮ : বর্তনীর বিভিন্ন অংশ

বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ ইচ্ছামত চালু ও বন্ধ করার উপায় হিসেবে প্লাগ-চাবি, সুইচ বা ছেদক ব্যবহার করা হয়। বর্তনীর প্লাগ চাবি বা সুইচ উঠিয়ে রাখলেই বর্তনী ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ থাকে। আবার চাবিটি লাগিয়ে দিলেই বর্তনীটি সম্পূর্ণ হওয়ায় পুনরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে।

ওহমের সূত্র

কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী পদার্থ বিদ্যুৎপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের পথে সৃষ্ট এ বাধাকে বৈদ্যুতিক রোধ বলে। জার্মান বিজ্ঞানী সাইমন ওহম (১৭৮৭-১৮৫৪) এর নামানুসারে রোধ পরিমাপের একককে ওহম বলা হয়। বিজ্ঞানী ওহম বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য অর্থাৎ বিভব পার্থক্য, বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং বৈদ্যুতিক রোধের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। এটি ওহমের সূত্র নামে পরিচিত। ওহমের সূত্রটি নিম্নে দেওয়া হল :

স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা = I , বিভব পার্থক্য = V এবং রোধ = R হয় তবে,

$$I = \frac{V}{R}$$

এই সূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে,

কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে সংগলিত বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং রোধের ওপর নির্ভর করে। পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বেশি হলে প্রবাহমাত্রা বেশি হবে। অপর দিকে পরিবাহীর রোধের পরিমাণ বেশি হলে প্রবাহমাত্রার পরিমাণ হ্রাস পাবে। বিভব পার্থক্য বা বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের একক ভোল্ট এবং রোধের একক ওহম।

ওহমের সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো পরিবাহীর রোধের পরিমাণ যদি এক একক হয় এবং এর ভেতর দিয়ে সংগলিত প্রবাহ মাত্রার মানও যদি হয় এক একক তবে ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানও হবে এক একক।

বিদ্যুৎপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি রাশির একক নিম্নে দেওয়া হল :

অ্যাম্পিয়ার

ফরাসি বিজ্ঞানী আঁদ্রে অ্যাম্পিয়ার (১৭৭৫-১৮৩৬)-এর নামানুসারে বিদ্যুৎপ্রবাহের এককের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাম্পিয়ার। এক ওহম রোধ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মান যদি এক ভোল্ট হয় তবে ঐ পরিবাহীর ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত প্রবাহ মাত্রার মান হবে এক অ্যাম্পিয়ার।

অ্যাম্পিয়ারকে অন্যভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। আমরা জানি, চার্জের ব্যবহারিক একক কুলম্ব। কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে এক সেকেন্ড যদি এক কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হয় তবে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রার মান হবে এক অ্যাম্পিয়ার। বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা সরাসরি পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যামিটার বলে।

ভোল্ট

এক ওহম রোধ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রার মান যদি এক অ্যাম্পিয়ার হয় তবে ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মান হবে এক ভোল্ট।

বর্তনীতে এর দুটো বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য সরাসরি পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ভোল্টমিটার বলে।

ওহম

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হওয়ার ফলে এর ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত প্রবাহ মাত্রার মান যদি এক অ্যাম্পিয়ার হয় তবে ঐ পরিবাহীর রোধের পরিমাণ হবে এক ওহম।

কোনো ব্যক্তি বা যন্ত্র একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে পারে তা ঐ ব্যক্তি বা যন্ত্রের ক্ষমতার পরিমাণ নির্দেশ করে। ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র যদি এক সেকেন্ডে ১ জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে তবে তার ক্ষমতার পরিমাণ হবে ১ ওয়াট। বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের নামানুসারে এই এককটির নামকরণ করা হয়েছে।

ওয়াট ঘণ্টা

১ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো যন্ত্র যদি ১ ঘণ্টা কাজ করে তবে সম্পাদিত কাজ তথা ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হবে ১ ওয়াট-ঘণ্টা, কারণ

$$\text{ক্ষমতা, } P = \frac{W}{t}$$

এখানে, t সময়, w সম্পাদিত কাজ বা ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তি।

$$\text{ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তি, } W = P \times t$$

এছাড়া, বিদ্যুৎপ্রবাহ, বৈদ্যুতিক চাপ এবং ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে :

$$\text{ওয়াট} = \text{অ্যাম্পিয়ার} \times \text{ভোল্ট}$$

কিলোওয়াট-ঘণ্টা

ওয়াট একটি ছোট একক। বড় বড় যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্ষমতার একক হচ্ছে কিলোওয়াট।

১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো যন্ত্র যদি ১ ঘণ্টা চলতে থাকে তবে ঐ সময়ে ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হবে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

সুতরাং কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র কর্তৃক ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তির একক হচ্ছে কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তিকে আমরা ১ ইউনিট বা বিদ্যুতের ১ ব্যবহারিক একক বলি।

একটি বৈদ্যুতিক বাস্তবের গায়ে ২২০ V-২৫W লেখা আছে। কথাটির অর্থ কী? এ কথার অর্থ হচ্ছে ২২০ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে বাস্তবটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে এবং এ অবস্থায় প্রতি সেকেন্ডে ২৫ জুল বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হবে।

সমস্যা : ২৪০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ৬০ ওয়াটের একটি বাতি জ্বালাতে কত অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ চলবে?

সমাধান : সূত্র : ভোল্ট \times অ্যাম্পিয়ার = ওয়াট

$$\text{অথবা, অ্যাম্পিয়ার} = \frac{\text{ওয়াট}}{\text{ভোল্ট}} = \frac{৬০ \text{ ওয়াট}}{২৪০ \text{ ভোল্ট}} = ০.২৫ \text{ অ্যাম্পিয়ার।}$$

সমস্যা : প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ১.৬৫ টাকা মূল্য দিতে হলে ৬০ ওয়াটের ১০টা বাতি ১৫ ঘণ্টা জ্বালাতে কত ব্যয় হবে?

সমাধান : ৬০ ওয়াট \times ১০ = ৬০০ ওয়াট

ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তি = ৬০০ ওয়াট \times ১৫ ঘণ্টা = ৯০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = ৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ৯ ইউনিট

মোট ব্যয় = ১.৬৫ টাকা \times ৯ = ১৪.৮৫ টাকা

সমস্যা : ১২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনো পরিবাহীর মধ্যে ৩ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে ঐ তারের রোধ কত?

সমাধান : বৈদ্যুতিক রোধ = $\frac{\text{বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য}}{\text{বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা}}$

এখানে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য, $V = ১২০$ ভোল্ট, প্রবাহ মাত্রা $I = ৩$ অ্যাম্পিয়ার

রোধ, $R = ?$

$$\begin{aligned} R &= \frac{V}{I} \\ &= \frac{১২০}{৩} \\ &= ৪০ \text{ ওহম} \end{aligned}$$

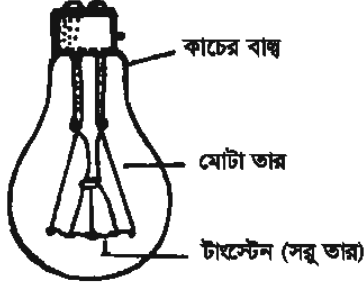
গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি

ঘর বাড়িতে যে সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় ঐগুলোকে গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বলা হয়। এ জাতীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (ক) বৈদ্যুতিক বাস্তব বা টিউব লাইট (খ) বৈদ্যুতিক পাখা। (গ) বৈদ্যুতিক হিটার (চুল্লি) (ঘ) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি (ঙ) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (চ) রেডিও (ছ) টেলিভিশন (জ) রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি। কয়েকটি যন্ত্রের সর্ধক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

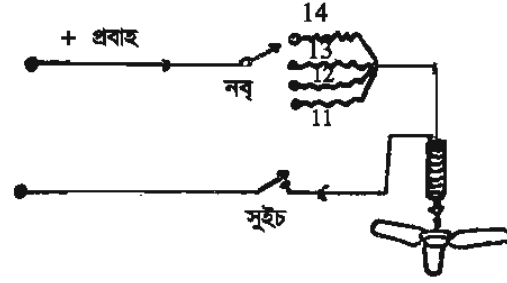
(ক) বৈদ্যুতিক বাস্তব : ঘরবাড়ি আলোকিত করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। একটি কাচের বাস্তবে নিষ্কিয় গ্যাস থাকে অথবা এটি বায়ুশূন্যও হতে পারে। দুটি মোটা তার বাস্তবটির বায়ু নিরুন্ম মুখের মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানো থাকে। এ দুই তারের দুপ্রান্তের সঙ্গে সরু টাংস্টেনের তার কুন্ডলীর দুপ্রান্ত যুক্ত থাকে। টাংস্টেনের এ তার কুন্ডলীকে ফিলামেন্ট বলে।

ফিলামেন্টের তার খুব সরু এবং বেশ লম্বা হওয়াতে এটির রোধ বেশি হয়। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয় এবং এক পর্যায়ে বাস্তবের ফিলামেন্ট প্রজ্বলিত হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে।

(খ) বৈদ্যুতিক পাখা : বৈদ্যুতিক পাখা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি বস্তু যার সাহায্যে আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় আরাম বোধ করি। এ যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। এখানে বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে পাখাকে ঘুরানো হয়। বৈদ্যুতিক মোটরের নীতিতে এটি কাজ করে। অবশ্য ঘূর্ণন গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানে একটি রেগুলেটর ব্যবহার করা হয়। রেগুলেটর কয়েকটি রোধ দ্বারা নির্মিত। এ রোধ বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং গতির হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন করে। চিত্রে একটি বৈদ্যুতিক পাখা দেখানো হল। রোধ R_1 , R_2 , R_3 , ও R_4 রেগুলেটর হিসেবে কাজ করছে।



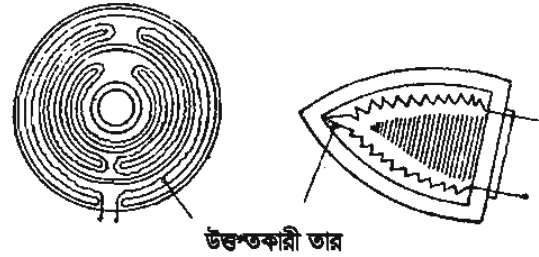
বৈদ্যুতিক বাস



বৈদ্যুতিক পাখা

চিত্র ১৪.৯

(গ) বৈদ্যুতিক হিটার : আমরা জানি যে রোধ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহী তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হলে তারটি গরম হয় এবং উত্তপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করে। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে হিটার তৈরি করা হয়। হিটারের মধ্যে অপরিবাহী পদার্থের (অব্র, ফায়ার ক্রে) তৈরি একটি গোল চাকতি থাকে। চাকতিটিতে ঝাঁজ কাটা থাকে। এ ঝাঁজের মধ্যে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী স্থাপন করা হয়। নাইক্রোম তারের রোধ তামার তারের রোধের প্রায় ৪০ গুণ। যেহেতু উৎপন্ন তাপের পরিমাণ রোধের সমানুপাতিক সেহেতু নাইক্রোম তারে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এ তাপ দ্বারা রান্না-বান্নার কাজসহ অনেক কাজ সম্পাদন করা যায়। চিত্রে একটি হিটার দেখানো হল।



চিত্র ১৪.১১ : বৈদ্যুতিক হিটার ও বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

(ঘ) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি : বৈদ্যুতিক হিটার এবং বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির গঠনপ্রণালি পায় একই রকম। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎবাহী নাইক্রোম তারটি ইস্ত্রির নিচে মসৃণ লৌহ নির্মিত তলটিকে উত্তপ্ত করে। ইস্ত্রিতে উৎপন্ন তাপ বিদ্যুৎপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। প্রবাহ বেশি হলে তাপ বেশি হবে (কারণ $H \propto I^2$ যেখানে, H = তাপের পরিমাণ, I = বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা)।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

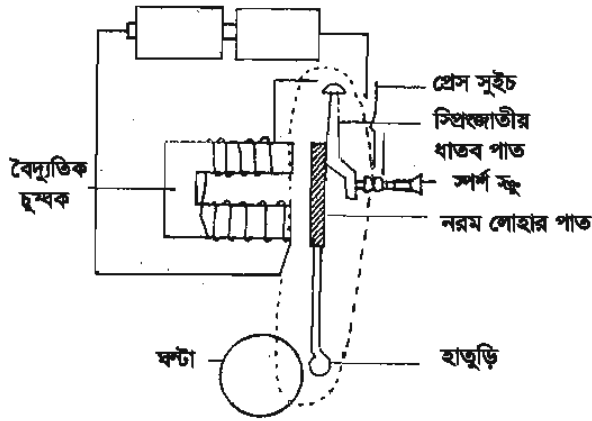
খুব ভালো করে ১৪.১১ চিত্রটির দিকে লক্ষ কর। এটি একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার চিত্র। সুইচ অন করলে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফলে তড়িৎ চুম্বকটি নরম লোহার পাতটিকে (যাকে আর্মেচার বলা হয়) আকর্ষণ করে। এ কারণেই হাতুড়িটি ঘণ্টায় এসে আঘাত করে এবং শব্দ উৎপন্ন হয়।

তড়িৎ চুম্বকের আকর্ষণের দরুন স্প্রিংসহ হাতুড়িটি স্পর্শ ক্ষু থেকে সরে আসে। এতে বর্তনী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এবং তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে তড়িৎ চুম্বক আর চুম্বক থাকে না এবং এর আকর্ষণ শক্তিও থাকে না। ফলে স্প্রিং

এর টানে হাতুড়ি তার নিজের অবস্থানে ফিরে যায় এবং স্পর্শ স্ক্রুকে স্পর্শ করে। এতে পুনরায় বর্তনী সম্পূর্ণ হয়, তড়িৎ সঞ্চালিত হয়, তড়িৎ চুম্বক আবার হাতুড়িকে নিজের দিকে টানে, ফলে হাতুড়ি ঘণ্টাকে আঘাত করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে হাতুড়ি ঘণ্টাটিকে বারবার আঘাত করতে থাকে। ফলে যতক্ষণ সুইচ অন থাকে ততক্ষণ আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই।

রেফ্রিজারেটর

বিদ্যুৎ চালিত গৃহস্থালি যন্ত্রসমূহের মধ্যে রেফ্রিজারেটর অন্যতম। এতে রক্ষিত বস্তুকে শীতল করা হয়। এ কাজে এমন একটি তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় প্রযুক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাকে অতি সহজে বাষ্পীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় এবং তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় (যেমন ফ্রেন)। তরল অবস্থায় ফ্রেনকে রেফ্রিজারেটরের শীতলীকরণ কক্ষের ভেতর দিয়ে পরিচালনা করার সময় এমন এক বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয় যার ফলে ভেতরে রক্ষিত দ্রব্যগুলো থেকে তাপ গ্রহণ করে এটি বাষ্পে পরিণত হয়। তাপ হারানোর ফলে দ্রব্যগুলোর তাপমাত্রা এত নিচে নেমে যায় যে পচা আশঙ্কা থাকে না। পরে বাষ্পকে বৈদ্যুতিক পাম্পের বা কম্প্রেসরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে সংনমিত (Compressed) করা হয়, ফলে বাষ্প আবার তরলে পরিণত হয় এবং বাষ্পাবস্থায় গৃহীত তাপ পরিত্যাগ করে। এ তাপ বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয় ও তরল পদার্থকে পুনরায় শীতলীকরণ কক্ষে পরিচালিত করা হয়।



চিত্র ১৪.১১ : বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

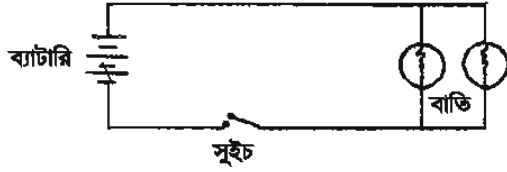


চিত্র ১৪.১২ : রেফ্রিজারেটর

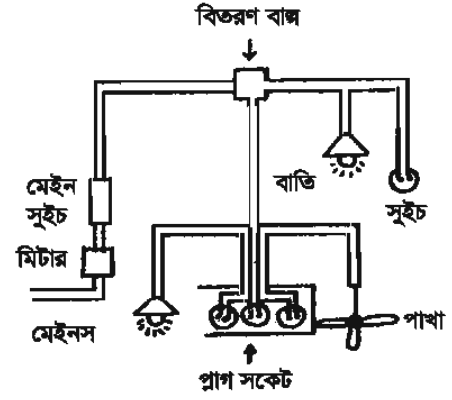
হাউজ ওয়্যারিং (House Wiring) বা গৃহ বিদ্যুতায়ন

আজকাল আমাদের অনেকের বাড়িতেই বিদ্যুৎ আছে। এ বিদ্যুতকে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো, পাখা চালানো প্রভৃতি কাজে কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা নিম্নে দেখান হল :

চিত্রে বৈদ্যুতিক বর্তনীতে দুটি বাতি সমান্তরালে সংযোগ করা হয়েছে। এতে দুটো বাতিই ব্যাটারির পুরোপুরি ভোল্টেজ পাবে। গৃহে বিদ্যুতায়নের মূল কথা প্রতিটি বাতি বা পাখার সংযোগস্থলে উপযুক্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা। বিদ্যুৎ সরবরাহ উৎস থেকে আগত প্রধান দুটি তারের সঙ্গে প্রতিটি বাতি বা পাখা এমনভাবে সংযোগ করা হয় যেন বাতি এবং পাখাগুলো পরস্পরের সমান্তরালে অবস্থান করে।



চিত্র ১৪.১৩



চিত্র ১৪.১৪

চিত্রে সরবরাহ উৎস থেকে আগত দুটো প্রধান তার ফিউজ, মিটার ইত্যাদিসহ দুটি বাতি, একটি পাখা ও একটি প্লাগের সংযোগ ব্যবস্থা দেখানো হল।

মেইনস্ এর দুটি তারের একটিকে লাইভ বা জীবন্ত তার এবং অন্যটিকে Neutral wire বা নিরপেক্ষ তার বলে। জীবন্ত তারেই বিদ্যুৎচাপ থাকে। সেজন্যই মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ রেখে এই তারটিকে স্পর্শ করলে দেহের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে এবং এটিই বৈদ্যুতিক শকের কারণ। এতে মৃত্যুও ঘটতে পারে। নিরপেক্ষ তারে কোনো চাপ থাকে না। একে মাটির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

বাড়িতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি খরচ হচ্ছে তা মিটার যন্ত্রটিতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। মিটার হতে তার দুটো মেইন সুইচে যায়। এই সুইচের সাহায্যে বাড়ির ভেতরে প্রবাহ বন্ধ করা বা চালানো যায়। মেইন সুইচের সঙ্গে একটি নিরাপত্তা ফিউজ থাকে।

সুইচ হতে দুটো তারই Distribution box বা বণ্টন বাক্সে যায় এবং সেখান থেকে তার দুটো বিভিন্ন শাখা লাইনে বিভক্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেক শাখা লাইনের জন্য পৃথক পৃথক ফিউজ থাকে। চিত্রে নিচের লাইনে একটি বাতি, একটি পাখা ও একটি প্লাগের সংযোগ দেখানো হয়েছে। আলো ও পাখার জন্য পৃথক পৃথক সুইচ রয়েছে যার প্রত্যেকটিই জীবন্ত তারের সঙ্গে সংযুক্ত। উপরের লাইনে কেবল একটি বাতি ও সেটির সুইচ দেখানো হয়েছে।

নিরাপত্তা ফিউজ (Safety Fuse)

বিদ্যুৎশক্তি যেমন মানুষের অনেক উপকারে লাগে তেমনি মাঝে মাঝে তা বড় রকমের দুর্ঘটনার কারণও হয়ে থাকে। মানবদেহ বিদ্যুৎ পরিবাহী। তাই কোনো কারণে বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে আসলে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঘরবাড়ি, দোকান, কলকারখানায় কোনো কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ বৃদ্ধি পেলে তাপ উৎপাদিত হয়ে আগুন লেগে যেতে পারে। ফলে অপূরণীয় ক্ষতিও হতে পারে। এ সকল কারণে বিদ্যুৎ লাইনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কম গলনাঙ্কের কোনো ধাতব তার ব্যবহার করে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। এ তারকে নিরাপত্তা ফিউজ বলে।

বৈদ্যুতিক মেইন লাইনে স্থাপিত একটি চিনামাটির হোল্ডারে এ তার যুক্ত থাকে। সাধারণত টিন ও সীসার সংকর ধাতু (টিন ২৫ শতাংশ এবং সীসা ৭৫ শতাংশ) দিয়ে এ তার তৈরি হয়। প্রবাহ মাত্রা নির্দিষ্ট সীমার উপর হলেই ফিউজ তারে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপে এটি গলে গিয়ে লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে বর্তনীতে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাই লাইনে আগুন ধরা বা কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। আজকাল সার্কিট ব্রেকারও এ কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে দাম বেশি হওয়ার কারণে নিরাপত্তা ফিউজের ব্যবহার এখনও জনপ্রিয়।

কোনো বর্তনীর ফিউজ পুনঃপুন নষ্ট হলে বর্তনীতে ত্রুটি আছে বুঝতে হবে। বর্তনীর ত্রুটি না সারিয়ে পুনরায় ফিউজ লাগানো ঠিক নয়।

বিদ্যুৎ সংযোগ ও ব্যবহারে সতর্কতা : বাড়িতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং করার সময় নিরাপত্তা ফিউজ যেন সরবরাহ লাইনের জীবন্ত তারের সঙ্গে শ্রেণী সমবায়ে সংযুক্ত হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ওয়্যারিং ক্যাবল পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) বা যে কোনো অন্তরক দ্বারা মোড়ানো হতে হবে। অনেক সময় অন্তরক হিসেবে রবারও ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ওয়্যারিং ক্যাবল/তারকে ওয়ালের প্লাস্টারের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়। তবে যে কোনো অবস্থায় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

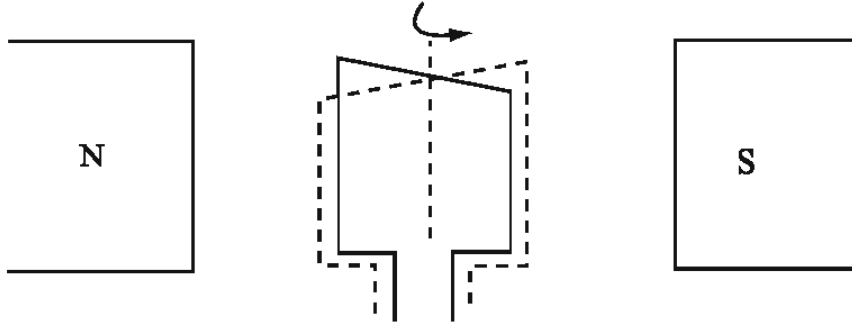
ব্যবহার : বাসগৃহে আমাদের আরামের জন্য অনেক মূল্যবান বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি বসানো হয়। এ সব যন্ত্রপাতি চালনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন না করলে এ বিদ্যুৎ অনেক সময় অপূরণীয় ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। তাই নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

- (ক) বৈদ্যুতিক সুইচ কখনও ভিজা হাতে ধরা যাবে না।
- (খ) ফিউজ জ্বলে গেলে মেইন সুইচ অফ করে দিতে হবে। যদি ফিউজ পরিবর্তনের দরকার হয় তবে শুধু নির্ধারিত তার দ্বারা ফিউজ পুনঃস্থাপন করতে হবে।
- (গ) কখনও শর্ট সার্কিট সমস্যা দেখা দিলে সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দেয়ার পর ইলেকট্রিসিয়ান ডেকে সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (ঘ) সাধারণ স্কুড্রাইভার সকেটে ঢুকানো যাবে না।
- (ঙ) সকল বাসগৃহে ইলেকট্রিক টেস্টার রাখা উচিত।
- (চ) কোনো নতুন যন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার পূর্বে যন্ত্রটির নির্দেশিকা অনুসারে সংযোজন দিতে হবে।
- (ছ) কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গায়ে পানি থাকতে পারবে না।
- (জ) বিনা প্রয়োজনে রেডিও, টিভি, ইস্ত্রি, বা অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ রাখা উচিত নয়।
- (ঝ) কোনো বর্তনীর ফিউজ পুনঃপুন নষ্ট হতে থাকলে বুঝতে হবে বর্তনীর কোথাও ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিয়ান দ্বারা মেরামত করানো অপরিহার্য।
- (ঞ) প্রয়োজনে অপরিবাহী পদার্থ যেমন রবারের জুতা বা গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

তাছাড়া কোনো লোক বা জীবজন্তু বিদ্যুতাক্রান্ত হলে খালি হাতে স্পর্শ না করে কোনো অপরিবাহী পদার্থ যেমন শুকনো বাঁশ বা কাঠের সাহায্যে বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বৈদ্যুতিক লাইনের কোনো তার রাস্তাঘাটে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করা উচিত নয়। এমনকি মেইন লাইনের কোনো তার পানিতে নিমজ্জিত থাকলে ঐ পানির সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়।

বিদ্যুতের অপচয় রোধ : বিদ্যুৎ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও কলকারখানা চালানোর কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এর উৎপাদন সীমিত ও ব্যয়বহুল। তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে এবং ব্যাপক অর্থে যাবতীয় কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে :

- (ক) লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করে কক্ষ ত্যাগ করার সময় অবশ্যই এগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।
- (খ) হিটার, কুকার ইত্যাদি বিনা প্রয়োজনে জ্বালিয়ে রাখা মোটেই উচিত নয়।
- (গ) বিদ্যুৎ সংযোগের কোথাও কোনো লিকেজ দেখা দিয়েছে কিনা সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- (ঘ) ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতিতে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়। এ কারণে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সঠিকভাবে সতর্ক ও মেরামত করানো উচিত।
- (ঙ) বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া বন্ধ করতে হবে।
- (চ) যথোপযুক্ত পরিবাহী তার ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র ১৪.১৫ : চুম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী

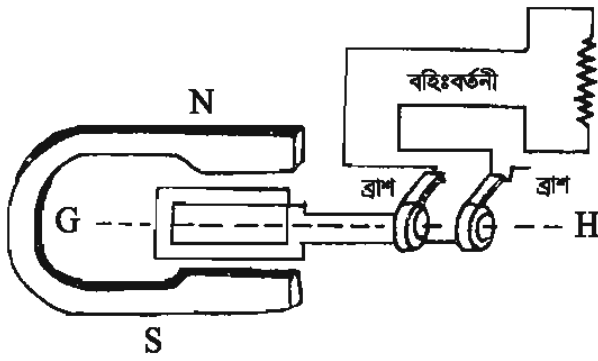
বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ

কোনো চুম্বকের চারদিকে যতটুকু এলাকা পর্যন্ত ঐ চুম্বকের প্রভাব বিস্তৃত থাকে সে এলাকাকে ঐ চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।

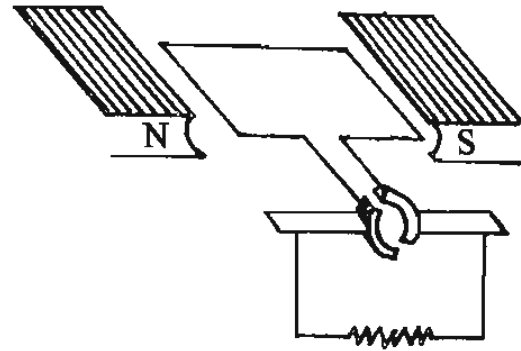
কোনো বস্তু কুণ্ডলীতে কোনো কারণে চৌম্বক ক্ষেত্রের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে ঐ কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। এ ঘটনাকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে। চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের এ ঘটনা আবিষ্কার করেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে (১৮৩১)। তাঁর আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের ওপর ভিত্তি করে মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক জেনারেটর

যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে জেনারেটর বা ডায়নামো বলে। ডায়নামোর ক্ষেত্রে একটি নরম লোহার চোঙের ওপর একটি পরিবাহী তার আয়তাকার কুণ্ডলীর আকারে পৈচানো থাকে। কাঁচা লোহার চোঙটিকে আর্মেচার বলে। চোঙটির অক্ষবরাবর একটি অনুভূমিক ধাতব দণ্ড থাকে। দণ্ডটিকে চোঙ থেকে অন্তরিত করে রাখা হয়। একটি শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে আয়তাকার কুণ্ডলীটিকে রাখা হলে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলো কুণ্ডলীটিকে ছেদ করে। যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে ধাতব দণ্ডটিকে ঘুরানো হলে



পরিবর্তী প্রবাহ ডায়নামো



একমুখী প্রবাহ ডায়নামো

চিত্র ১৪.১৬ : ডায়নামো

আর্মেচারের সাথে সাথে আয়তাকার কুন্ডলীটিও ঘুরতে শুরু করে এবং কুন্ডলীকে অতিক্রমকারী চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে কুন্ডলীর তারের দু'প্রান্তে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হয়। বহু সংখ্যক পাক বিশিষ্ট কুন্ডলীকে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে ঘুরানো হলে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের মান বৃদ্ধি পায়। এ কারণে কুন্ডলীর সাথে সংযুক্ত বহিঃবর্তনীতে অধিক পরিমাণ আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এভাবেই ডায়নামোর সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

ডায়নামো দু'প্রকার যথা :

(১) পরিবর্তী প্রবাহ ডায়নামো (A.C. dynamo)

(২) একমুখী প্রবাহ ডায়নামো (D.C. dynamo)

চিত্রে পরিবর্তী প্রবাহ ডায়নামো এবং একমুখী প্রবাহ ডায়নামোর গঠনকৌশল দেখানো হয়েছে।

বৈদ্যুতিক মোটর

বৈদ্যুতিক মোটর হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

একটি তার কুন্ডলীর দু'প্রান্ত বিদ্যুৎ উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে কুন্ডলীটিকে একটি শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দু'মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে মুক্তভাবে স্থাপন করলে এটি ঘুরতে শুরু করে। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই বৈদ্যুতিক মোটর কাজ করে।

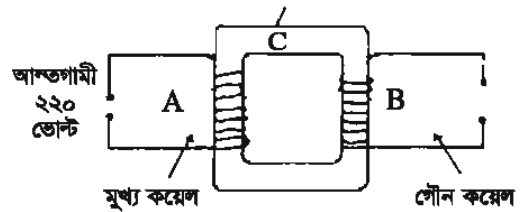
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে সকল মোটর তৈরি করা হয় ঐ সকল মোটরে কাঁচা লোহার দণ্ড বা আর্মেচারের উপর তারের কুন্ডলী পঁচানো থাকে। চুম্বকের মেরুদ্বয় কাছাকাছি থাকার ফলে মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে চৌম্বক প্রাবল্য বৃদ্ধি পায় এবং কুন্ডলীর ঘূর্ণনগতিও বেড়ে যায়। এভাবেই বিদ্যুৎশক্তি যান্ত্রিক ঘূর্ণন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বৈদ্যুতিক মোটর একটি বহুল ব্যবহৃত যন্ত্র। যেখানেই কোনো কিছু ঘুরাতে হয় সেখানেই মোটরের প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক পাম্প, বৈদ্যুতিক পাখা, ক্যাসেট প্রেয়ার, রোলিং মিল, বৈদ্যুতিক ট্রাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ট্রান্সফর্মার

ট্রান্সফর্মার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে এক বর্তনী থেকে অন্য বর্তনীতে স্থানান্তর করা যায়। এর দ্বারা সমুদয় শক্তি স্থানান্তর করা যায় এবং শক্তি ঠিক রেখে প্রবাহ বাড়ানো বা কমানো যায়।

চিত্রে একটি তরল ট্রান্সফর্মার দেখানো হল। এখানে A একটি মুখ্য বর্তনী এবং B গৌণ বর্তনী এবং C একটি নরম লোহার মজ্জা। যখন মুখ্য কয়েলের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে থাকে তখন বৈদ্যুতিক আবেশের ফলে গৌণ কয়েলের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এর পরিমাণ গৌণ কয়েলের পৈচ সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। পৈচ সংখ্যা কম হলে ভোল্টেজ কম হবে এবং পৈচ সংখ্যা বেশি হলে এর পরিমাণ বেশি হবে। প্রথম রকমের ট্রান্সফর্মারকে নিম্নধাপী (Step down) এবং দ্বিতীয় রকমের



চিত্র ১৪.১৭ : সরল ট্রান্সফর্মার

ট্রান্সফর্মারকে উর্ধ্বধাপী (Step up) ট্রান্সফর্মার বলে। নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কয়েলের তুলনায় গৌণ কয়েলে ভোল্টেজ কম উৎপাদিত হয়। অবশ্য গৌণ বর্তনীতে প্রবাহ মুখ্য বর্তনী থেকে বেশি থাকে। উর্ধ্বধাপী ট্রান্সফর্মারে ঠিক উল্টোটি ঘটে। এখানে মুখ্য বর্তনীর তুলনায় গৌণ বর্তনীতে ভোল্টেজ বেশি উৎপন্ন হয়।

ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে অনেক কাজ করা হয়। যেমন—উর্ধ্বধাপী ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে দূর-দূরান্তে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়। নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে আমরা রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি চালনা করি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সাধারণ বিদ্যুৎকোষে সাধারণত: কোন এসিড বেশি ব্যবহার করা হয়?

- ক. সালফিউরিক এসিড
- খ. নাইট্রিক এসিড
- গ. হাইড্রোক্লোরিক এসিড
- ঘ. ফসফরিক এসিড।

২ হতে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর নিচের অনুচ্ছেদ হতে দাও :

রহিম ইরি মৌসুমে সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করে। বিদ্যুৎ অফিস রহিমকে জানায় তার জমির নিকটস্থ বিদ্যুৎ লাইন উচ্চ ভোল্টেজের হওয়ায় সেখানে একটি ট্রান্সফর্মার স্থাপন করে তাকে 440v এর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা ছিল 3amp। প্রতিদিন সে 6 ঘণ্টা সেচ কাজ পরিচালনা করে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য 2.50 টাকা।

২। বিদ্যুৎ অফিস ট্রান্সফর্মার স্থাপনের কথা বলেছিল কেন?

- ক. নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তর করার জন্য।
- খ. উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে রূপান্তর করার জন্য।
- গ. সমুদয় বৈদ্যুতিক শক্তিকে স্থানান্তর করার জন্য।
- ঘ. শক্তি ঠিক রেখে প্রবাহ বাড়ানোর জন্য।

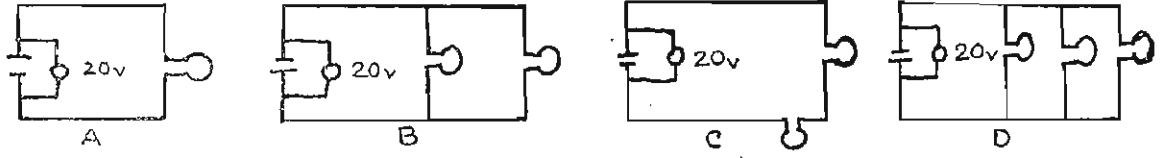
৩। সেচ কাজের জন্য রহিম নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিল?

- ক. জেনারেটর
- খ. মোটর
- গ. স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার
- ঘ. স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।

৪। রহিমকে ২০০৭ সালের জুন মাসে কত টাকার বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়েছিল?

- ক. ৬১৩.৩০ টাকা
- খ. ৫৫৪.৪০ টাকা
- গ. ৫৭৪.২০ টাকা
- ঘ. ৫৯৪.০০ টাকা

৫। প্রত্যেক বাতি একই রকম আলোকিত হলে নিচের কোন বর্তনীটিতে সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে?



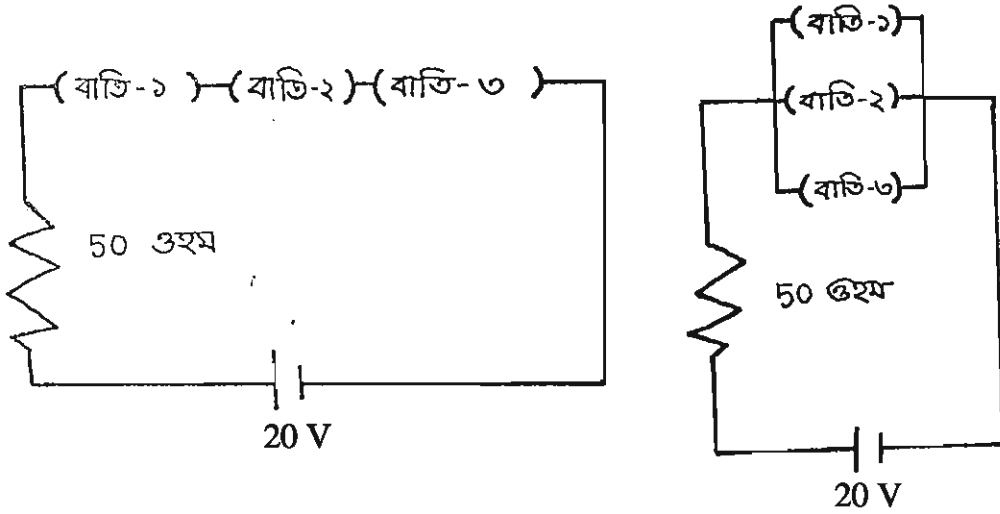
(ক) A

(খ) B

(গ) C

(ঘ) D

সৃজনশীল প্রশ্ন



উপরের বর্তনীটি দুটি পর্যবেক্ষণ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- V চিহ্নটির অর্থ কী?
- উপরের বর্তনী দুটির উৎস হতে কী ধরনের বিদ্যুৎ নির্গত হয় লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
- যে কোনো একটি বর্তনীর বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- গৃহ বিদ্যুতায়নের জন্য উপরের দুটি বর্তনীর মধ্যে কোনটিকে তুমি অগ্রাধিকার দিবে—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সংবাদ আদান-প্রদান

মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করা মানব মনের চিরন্তন আকুতি। ভাব আদান-প্রদানের নিমিত্তে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। অতীতে লোক মারফতে, অশ্ব দ্বারা এবং এমনকি কবুতরের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা হত। এ ব্যবস্থায় অনেক বেশি সময় লাগত এবং বেশি দূরে সংবাদ পাঠানো যেত না। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর এ ব্যবস্থা অনেক সহজ ও দ্রুতগামী হয়েছে।

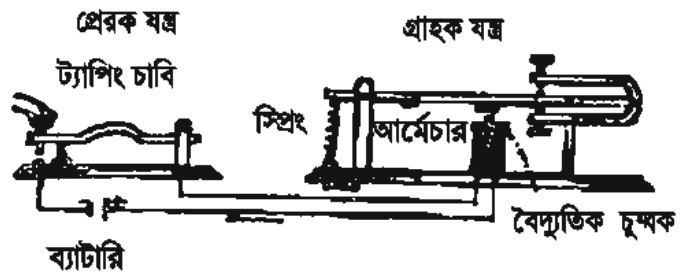
সময়ের বিবর্তনে মানব জ্ঞানের উত্তরণ ঘটেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে সংবাদ আদান-প্রদানে ঘটেছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি। এখনকার মানুষ ঘরে বসে অন্যকে দেখে, কথা বলে এ গ্রহের যে কোনো অধিবাসীর সঙ্গে এবং তথ্য ও খবরাখবর মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন ক্যাম্ব্র, ইলেকট্রনিক মেইল, কম্পিউটার ও যোগাযোগ উপগ্রহের আবিষ্কার ও ব্যবহার, সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। নিচে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল :

টেলিগ্রাফ

যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করা হয় তাকে টেলিগ্রাফ বলে। স্যামুয়েল মোর্স (১৭৯১-১৮৭২) নামক একজন মার্কিন বিজ্ঞানী ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করতে সমর্থ হন। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নির্দেশ করার জন্য মোর্স বিন্দু ও রেখার সহযোগে কতকগুলো সংকেত আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে একে মোর্স সংকেত বলা হয়। সাধারণত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে : (১) প্রেরক যন্ত্র (২) গ্রাহক যন্ত্র (৩) রীলে।

(১) প্রেরক যন্ত্র : প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপলে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং এর ফলে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সংঘটিত হয়। চাবি ছেড়ে দিলে বর্তনী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই পর্যায়ক্রমে গ্রাহক যন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ একবার চলে এবং পরক্ষণে বন্ধ হয়। এ চাবি চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ার সময়ে কম-বেশির ওপর গ্রাহক যন্ত্রে দু'প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় হ্রস্ব শব্দ টরে ও দীর্ঘ শব্দ টক্কা। মোর্স এ শব্দ দুটো বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তাঁর বর্ণমালার সংকেত উদ্ভাবন করেন।

(২) গ্রাহক যন্ত্র (সাইন্ডার) : এ যন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ও একটি আর্মেচার থাকে। প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপলে বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রের বৈদ্যুতিক চুম্বকের মধ্য দিয়ে চলে যায়। ফলে, তা আর্মেচারকে আকর্ষণ করে এবং আর্মেচারটি একটি ধাতুনির্মিত পাতে টুক করে আঘাত করে। ট্যাপিং চাপি ছেড়ে দিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আর্মেচারটি স্থির এর টানে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে এবং অন্য একটি ধাতুনির্মিত পাতে টুক করে আঘাত করে। এভাবে গ্রাহক



চিত্র ১৫.১ : একটি সরল টেলিগ্রাফ বর্তনী

স্টেশনে বিন্দু ও রেখা সংকেত দ্বারা বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করা হয়। এ স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটর তা লিখে নেন। এভাবে দ্বিতীয় স্টেশন থেকেও মোর্সের সংকেত প্রথম স্টেশনে পাঠানো হয়।

(৩) রীলে : কোনো কোনো সময় টেলিগ্রাফ লাইন বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে গ্রাহক যন্ত্রে অতি মৃদু সাড়া পৌঁছায় এবং স্পষ্টভাবে সংবাদ গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে রীলে ব্যবহার করা হয়। রীলে দ্বারা প্রেরক যন্ত্রের মৃদু সংকেতসমূহকে বিবর্ধিত করা হয়।

টেলিফোন

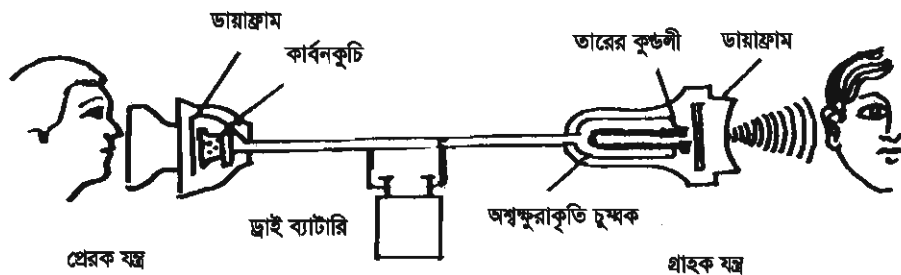
বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সাথে কথা বলার যন্ত্রই টেলিফোন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (১৮৪৭-১৯২২) টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক টেলিফোনে সাধারণত দুটো প্রধান অংশ থাকে :

(১) প্রেরক যন্ত্র ও (২) গ্রাহক যন্ত্র। তাছাড়া থাকে সংযোগকারী তার ও একমুখী (ডিসি) বিদ্যুতের উৎস।

(১) প্রেরক যন্ত্র : প্রেরক যন্ত্রে সাধারণত ধাতু নির্মিত একটি পাত থাকে। একে ডায়াফ্রাম বলে। এ পাতের সামনে কথা বললে এটা কাঁপতে থাকে এবং ডায়াফ্রামের এ কম্পন কার্বন কুচি ভর্তি একটি বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডায়াফ্রামের সামনে কথা বললে তা ভেতরের দিকে চাপ দেয়, ফলে কার্বন কুচিগুলো সংকুচিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কথা না বললে বা আস্তে আস্তে কথা বললে ডায়াফ্রামটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং কার্বন কুচিগুলো প্রসারিত হয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। ফলে, কম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। ডায়াফ্রাম ও কার্বন কুচি মিলে কার্বন মাইক্রোফোন তৈরি হয়।

(২) গ্রাহক যন্ত্র : গ্রাহক যন্ত্রেও লোহার পাতলা ডায়াফ্রাম বা পাত থাকে এবং এর সঙ্গে গায়ে তারের কুন্ডলী জড়ানো একটি অশূন্যাকৃতি স্থায়ী চুম্বক থাকে। লোহার পাতটি তারকুন্ডলীযুক্ত চুম্বকের মেরুদ্বয়ের সামনে আলতোভাবে স্পর্শগত থাকে। প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে এর পাতটি কাঁপতে থাকে। এ কম্পন মাইক্রোফোনে অবস্থিত কার্বন কণাগুলোতে পর্যায়ক্রমে একবার চাপ দেয় এবং পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়। ফলে, বিদ্যুৎপ্রবাহে তারতম্য ঘটে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ বেশি হলে গ্রাহক যন্ত্রে চুম্বকের শক্তি বেশি হবে এবং তা বেশি জোরে গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামকে আকর্ষণ করবে। বিদ্যুৎপ্রবাহ কম হলে চুম্বকের শক্তি কম হবে এবং তা লোহার পাতকে কম জোরে আকর্ষণ করবে। সুতরাং, প্রেরক যন্ত্রের পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রে (রিসিভারে) প্রবেশ করে প্রেরক যন্ত্রের পাতটি যেভাবে কাঁপছিল ঠিক সেভাবেই গ্রাহক যন্ত্রের পাতটিকে কম্পিত করে। কাজেই মাউথ পিসে যে রূপ কথা বলা হয়, ইয়ার পিসেও ঠিক সে রূপ কথারই সৃষ্টি হয়ে থাকে। টেলিফোন প্রেরক যন্ত্রে “হ্যালো” বললেই অন্য প্রান্তে গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামে কম্পন সৃষ্টি হবে এবং সেখান হতে শোনা যাবে “হ্যালো”।



চিত্র ১৫.২ : একটি টেলিফোন বর্তনী

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ, টেলিফোন সেটে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা থাকে। এ নম্বরগুলো ঘুরিয়ে বা ডায়াল করে এক টেলিফোন সেট থেকে অন্য সেটে দুই জনে কথাবার্তা বলতে পারে। টেলিফোনে সংবাদ বা কথোপকথন দুই ভাবে আদান-প্রদান করা হয়। (১) এনালাগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শব্দকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ ও (২) ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিকে ডিজিটাল সংবাদে রূপান্তরিত করে প্রেরণ। বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির সুবিধা হল প্রেরণ সহজ হয় এবং কম্পিউটার ব্যবস্থার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। সুবিধার জন্য এখন তারবিহীন বা কর্ডলেস টেলিফোনের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় তারের সংযোগ ছাড়াই মূল টেলিফোন সেট থেকে দূরে বসে অনায়াসে টেলিফোন করা যায়।



চিত্র ১৫.৩

টেলিফোনের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আবার দুই রকম ব্যবস্থা আছে। একটি হল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এবং অন্যটি হল সরাসরি ডায়ালিং করে। প্রথমটিতে অপারেটরকে নম্বর বললে নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ করে মফস্বল শহরে এমনকি ছোট থানা শহরে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ট্রান্সককল বলে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গ্রাহক নিজে দেশে এবং বিদেশে সরাসরি ডায়ালিং করে কথা বলতে পারেন। বর্তমানে ঢাকা থেকে বাংলাদেশের যে কোনো শহরে এমনকি কোনো কোনো থানা শহরে সরাসরি নম্বর ঘুরিয়ে টেলিফোন করা যায়। একে NWD বা নেশানওয়াইড ডায়ালিং বলে। তাছাড়া বাংলাদেশের বড় শহর থেকে পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের সাথে সরাসরি ডায়ালিংয়ের মাধ্যমে কথা বলা যায়। একে ISD বা ইন্টারন্যাশনাল সাবস্ক্রাইবার ডায়ালিং বলে। টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এত বেশি উন্নতি সাধিত হয়েছে যে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

রেডিও যোগাযোগ

ইটালীর মার্কনী (১৮৭৪-১৯৩৭) সর্বপ্রথম বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তবে বাঙালি বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) ও রাশিয়ার আলেকজান্ডার পপভ-ও (১৮৫৯-১৯০৬) প্রায় একই সময় বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন বলে জানা যায়। শব্দ প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা গেছে যে, শব্দ তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়। আরও অনেক রকমের তরঙ্গ আছে যেমন-তাপ তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি তরঙ্গ একটি থেকে আরেকটি আলাদা। শব্দ তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। আলো, তাপ, বেতার ইত্যাদি তরঙ্গ চলার জন্য কোনো মাধ্যম লাগে না। এদের কম্পাঙ্ক বেশি, বেগও বেশি। বেতার তরঙ্গ আলোর বেগে চলে।

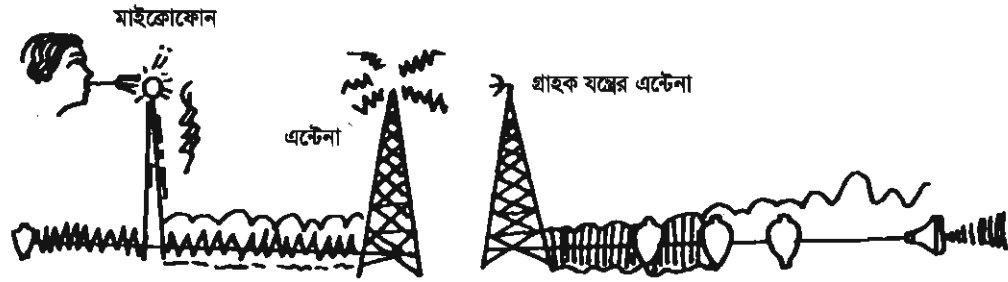
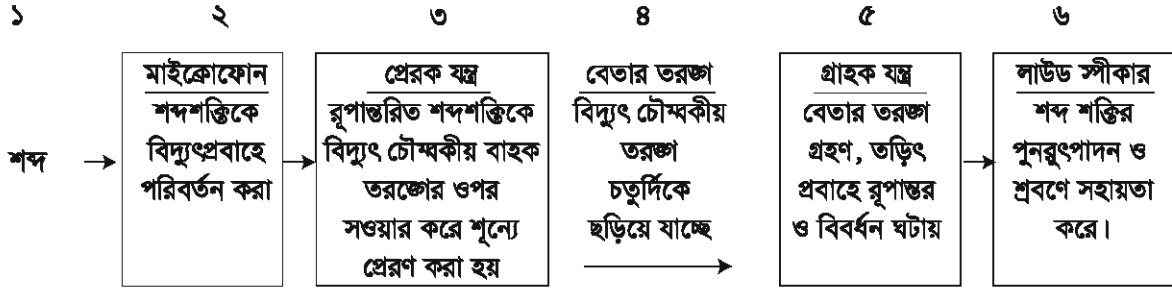
রেডিও ব্যবস্থার দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। একটি হল তরঙ্গ সঞ্চালন ব্যবস্থা, আর একটি হল গ্রহণ ব্যবস্থা। তরঙ্গ সঞ্চালন ব্যবস্থার শব্দ তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করে সঞ্চালন করা হয়। আর গ্রাহক যন্ত্রে উক্ত বেতার তরঙ্গ ধরে আবার শব্দ তরঙ্গে পরিণত করে শোনার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত রেডিও বলতে আমরা গ্রাহক যন্ত্রকে বুঝে থাকি।

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে বাহক হিসাবে ব্যবহার করে কথা, গান বা কোনো সংকেতকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের রেডিও টিউব বা ভালভের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে ইলেক্ট্রন টিউব বা রেডিও টিউবের ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে, কেননা ট্রানজিস্টারে বিদ্যুতের অপচয় কম হয় এবং খুব কম বিদ্যুতে এটা কাজ করে।

বেতারের মূলনীতি হল তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (এক ধরনের শক্তিশালী তরঙ্গ) উৎপাদন ও অনেক দূরে একে গ্রহণ। বেতার প্রচার ও গ্রহণের জন্য বিবর্ধিত ও অবিস্ত্রিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করার পর প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাহক তরঙ্গ থেকে দুর্বল শব্দ তরঙ্গকে পৃথক করে বিবর্ধিত করা হয়।

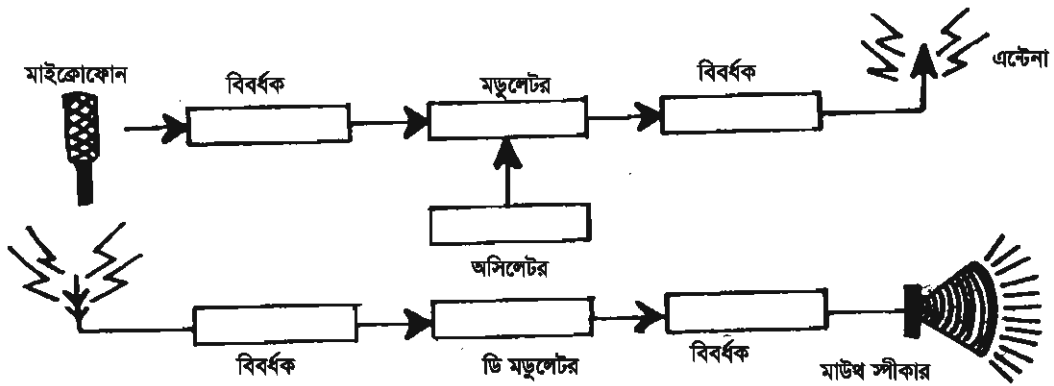
বেতার প্রেরক যন্ত্র : বেতার প্রেরক কেন্দ্রে শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপাদক যন্ত্র বসানো হয়। এ যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তরঙ্গ উৎপাদন করে এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে এই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গের বাহক তরঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কারণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় এ তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গকে বহন করে নিয়ে যায়।

বেতার ব্যবস্থায় শব্দ সংকেত প্রেরণ/গ্রহণের প্রবাহচিত্র :



ক. বেতার কেন্দ্রের মাইক্রোফোন থেকে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ

খ. বেতার তরঙ্গ গ্রহণ



চিত্র ১৫.৪ : বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রব্যবস্থার ব্লক চিত্র

চিত্রে বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রব্যবস্থায় একটি ব্লক ডায়াগ্রাম রয়েছে। প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে উৎপাদিত শব্দ তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত হয়। অতঃপর এই তরঙ্গকে বিবর্ধিত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎের সঙ্গে একে মেশানো হয়। একে আবার বিবর্ধিত করে এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি নির্গত হয়ে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. বেগে চারদিকে সঞ্চালিত হয়।

গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়াল এ তরঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে বিবর্ধকে পাঠায়। গৃহীত তরঙ্গের মধ্যে শব্দ ও বাহক তরঙ্গ থাকে। এ দুটোকে আলাদা করার জন্য বিশেষ একটি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। শব্দ তরঙ্গটি বিবর্ধকের মধ্য দিয়ে লাউড স্পীকারে যায়। আমরা কথা, গান ইত্যাদি শুনে থাকি।

প্রতিদিন বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ একই সময়ে ছাড়া হয়। বেতার যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ইচ্ছামত একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরা যায়। একে টিউনিং করা বলে। ফলে, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি শোনা সম্ভব হয়।

রেডিওতে সাধারণত দু'ধরনের তরঙ্গের নাম লেখা থাকে। একটিকে বলা হয় হ্রস্ব তরঙ্গ (শর্ট ওয়েভ) এবং অন্যটির নাম মধ্যম তরঙ্গ (মিডিয়াম ওয়েভ)। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সাথে কম্পন সংখ্যার একটি সম্পর্ক রয়েছে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা বেশি হবে এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে প্রতি সেকেন্ডে এর কম্পন সংখ্যা কম হবে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং এর কম্পাঙ্কের গুণফল আলোর বেগের (প্রতি সেকেন্ডে 3×10^{10} সেন্টিমিটার বা 3×10^8 মিটার) সমান। সুতরাং নির্দিষ্ট বেগে চলমান কোনো তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা থাকলে তার কম্পাঙ্ক বের করা যায় এবং কম্পাঙ্ক জানা থাকলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে কম্পনশীল কোনো বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতসংখ্যা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে ঐ বস্তুর কম্পাঙ্ক বলে।

সমস্যা ৪.২: কোনো বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ২৫০ মিটার হলে প্রতি সেকেন্ডে তার কম্পন সংখ্যা কত?

সমাধান : আলোর বেগ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য \times কম্পন সংখ্যা।

3×10^8 মিটার প্রতি সেকেন্ডে = ২৫০ মিটার কম্পন সংখ্যা।

অতএব, কম্পন সংখ্যা = $3 \times 10^8 \div 250$ প্রতি সেকেন্ডে = ১২,০০,০০০ সাইকেল (Cycle) প্রতি সেকেন্ডে = ১,২০০ কিলোসাইকেল প্রতি সেকেন্ডে।

বেতার কেন্দ্র কাছে থাকলে মধ্য তরঙ্গ খবরাখবর বহন করে আনতে পারে। কিন্তু খুব দূরের কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি শুনতে হলে হ্রস্ব তরঙ্গের সাহায্য নিতে হয়। হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ সহজে কোনো বাধা থেকে প্রতিফলিত হতে পারে। উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে আয়নমণ্ডল নামে বৈদ্যুতিক কণাবিশিষ্ট একটি স্তর রয়েছে। হ্রস্ব তরঙ্গগুলো যখন আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসে, তখনই তা রেডিওতে ধরা পড়ে। যে সকল দেশে বেতার, সরকার নিয়ন্ত্রিত সে সকল দেশে বেতার প্রেরক স্টেশনে যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য সরকারি বিশেষজ্ঞ, কারিগর ও অন্যান্য কর্মী থাকে। গ্রাহক যন্ত্র শ্রোতা বা ব্যবহারকারীর নিকট থাকে। এটি ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যন্ত্রের ভেতর ময়লা গেলে সংযোগ বিন্দুগুলোতে কার্বন জমে যন্ত্র বিকল হয়। তাই যন্ত্র যাতে পরিষ্কার থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। বেতারের আলাদা এরিয়াল সংযোগ থাকলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ গ্রহণে সুবিধা হয় এবং স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়।

টেলিভিশন

ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন। এ যন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকে প্রেরিত ছবি দেখার সাথে সাথে আমরা শব্দও শুনতে পাই। স্কটিশ বিজ্ঞানী লর্জ বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম দূরবর্তী স্থানে ছবি প্রেরণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে

টেলিভিশন প্রেরক স্টেশন থেকে ছবি ও শব্দ প্রেরণের জন্য দুটো আলাদা প্রেরক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয়। যে

দৃশ্য পাঠাতে হবে তার ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা হয়। ক্যামেরা ছবিটিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ তড়িৎ সংকেতকে তড়িৎ চুম্বকীয় বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এন্টেনার সাহায্যে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অপর প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে শব্দ প্রেরণকারী যন্ত্র মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তার শব্দ সংগ্রহ করে। মাইক্রোফোনে একটি পাতলা ধাতব পাত আছে। এটিকে ডায়াফ্রাম বলে। মাইক্রোফোনে আগত শব্দ ডায়াফ্রামটিকে কম্পিত করে। এ যান্ত্রিক কম্পন তড়িৎ সংকেত রূপান্তরিত হয়। এরপর এ সংকেতকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এন্টেনার সাহায্যে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ ও ছবি গ্রহণ

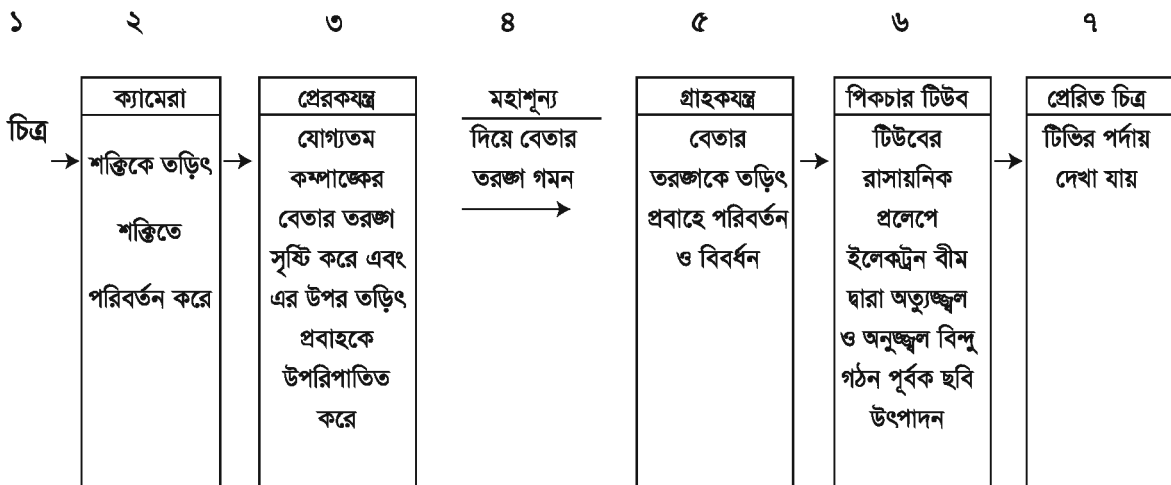
টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রে একই সময়ে ছবি ও শব্দ গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক গ্রাহক যন্ত্রই আউটডোর অথবা ইনডোর এন্টেনার সাথে যুক্ত থাকে। প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া শব্দ সংকেত বহনকারী তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের বাড়িতে ব্যবহৃত টিভি সেটের এন্টেনায় আসে। যে চ্যানেলে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে গ্রাহক সেটটি যদি সে চ্যানেলে টিউনিং করা থাকে তবে এন্টেনায় গৃহীত তড়িৎ সংকেতকে শব্দ গ্রহণকারী গ্রাহক যন্ত্র গ্রহণ করে। এরপর পর্যায়ক্রমে বিবর্ধন ও একমুখীকরণের পর লাউড স্পীকারের অন্তর্গামী প্রান্তে এ সংকেতকে প্রেরণ করা হয়। লাউড স্পীকার এই তড়িৎ সংকেতকে মূল শব্দে রূপান্তরিত করে। ফলে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

গ্রাহক যন্ত্রের একই এন্টেনা ছবির সংকেত বহনকারী তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অতিসামান্য অংশ গ্রহণ করে। রেকটিফায়ার বাহক তরঙ্গ থেকে ছবির তড়িৎ সংকেতকে পৃথক করে বিবর্ধকের নিকট প্রেরণ করে। বিবর্ধিত তড়িৎ সংকেতকে পরবর্তী পর্যায়ে ইলেকট্রন গানে পাঠানো হয়। পিকচার টিউবের পেছনের প্রান্তে স্থাপিত ইলেকট্রন গান ছবির তড়িৎ সংকেত গ্রহণ করার সাথে সাথে সরু ইলেকট্রন বীম ছুড়তে থাকে। সংকেতের তীব্রতার ওপর নিষ্কৃতি ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ভর করে।

পিকচার টিউবে কীভাবে ছবি উৎপন্ন হয়

পিকচার টিউবের সামনের অংশ হচ্ছে টিভির পর্দা যে পর্দায় আমরা ছবি দেখি। পর্দাটির ভেতরের পৃষ্ঠে ফসফর নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ থাকে। পদার্থটির বৈশিষ্ট্য এরূপ যে এর উপর যে স্থানে ইলেকট্রন পতিত হয় সে স্থান আলো বিকিরণ করে। এ কারণেই ইলেকট্রন গান থেকে প্রতিপ্রভ ফসফরের উপর যখন ইলেকট্রন বীম পতিত হয় তখন উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সমন্বয়ে দূর থেকে প্রেরিত দৃশ্যের জীবন্ত চিত্র টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

টিভির প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের প্রবাহ চিত্র মোটামুটি নিম্নরূপ :



রঙিন টেলিভিশন

এক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সাদাকালো টেলিভিশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাথে আরও কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। রঙিন টেলিভিশনের ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রং (লাল, আসমানী ও সবুজ) এর জন্য তিনটি পৃথক পৃথক ইলেকট্রন টিউব থাকে। গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি ইলেকট্রন গান থাকে। এর পর্দা তৈরি হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। একটি বিশেষ রং শুধু তার বিশেষ রঙের দানাগুলোকে আলোকিত করে। ফলে পর্দায় একই সাথে ফুটে ওঠে লাল, আসমানী ও সবুজ রঙের বিন্দু। এদের বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টিভির পর্দায় নানা ধরনের রঙিন ছবি আমরা দেখতে পাই।

টেলিভিশনের ব্যবহার

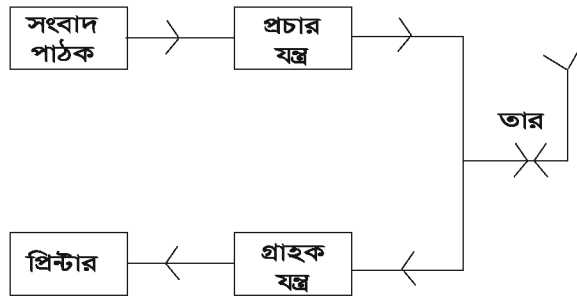
মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য টেলিভিশনকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যেমন—

- ১। চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার
- ২। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার
- ৩। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার
- ৪। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার এবং
- ৫। সংবাদ ও তথ্য প্রচার।

ফ্যাক্স

আধুনিককালে সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ফ্যাক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি একটি যন্ত্র যা দ্বারা লিখিত বক্তব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পৌঁছানো যায়। মনে করি এক পৃষ্ঠায় একটি লিখিত বক্তব্য ঢাকা থেকে টোকিওতে পাঠানো দরকার। ফ্যাক্স যন্ত্রে কাগজটি প্রবেশ করালে কাগজে লিখিত অক্ষর বা শব্দগুলোর প্রতিচ্ছবি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে ঢাকা থেকে টোকিওতেও পৌঁছে যায়। টোকিওর গ্রাহক যন্ত্র বক্তব্যের প্রতিচ্ছবিকে প্রিন্টারের মাধ্যমে অবিকলভাবে প্রকাশ করে।

ফ্যাক্স (FAX) একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি শব্দ যার পূর্ণ শব্দ হল ফ্যাক্সিমিলি (FAXCIMILE)। ১৫.৫ চিত্রে ফ্যাক্স যন্ত্রের একটি ব্লক চিত্র দেখানো হল। এ যন্ত্রের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়। এ যন্ত্রটি অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন-টেলিফোন, কপিয়ার, রেকর্ডার ইত্যাদি। এ মেশিনের সংবাদ আদান-প্রদানের দ্রুততা কম-বেশি করা সম্ভব। প্রযুক্তি যতই উন্নত হচ্ছে ততই এর দক্ষতা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্র ১৫.৫ : ফ্যাক্স যন্ত্রের ব্লক ছবি

ইলেকট্রনিক মেইল

ইলেকট্রনিক মেইল বা ই-মেইল (E-mail) যন্ত্রটি ফ্যাক্স যন্ত্রের মতোই কাজ করে। তবে এ যন্ত্রের সঙ্গে কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। বড় আকারের সংবাদ এবং প্রচুর উপাত্ত এ যন্ত্র দ্বারা আদান-প্রদান করা হয়। কম্পিউটারের অন্তঃগামী উপাত্তগুলোকে পর্যায়ক্রমে সুবিধাজনক ফাইলে জমা করে মডেম যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। মডেম একটি ইংরেজি শব্দ যাকে বলা হয় মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন। অন্তঃগামী কোনো সংবাদকে মাইক্রোওয়েভের সঙ্গে মিশিয়ে অনেক

দূরে পাঠানোকে মডুলেশন বলে। অন্যদিকে মডুলেশনকৃত তথ্যকে মাইক্রোওয়েভ থেকে পৃথক করে প্রকৃত তথ্য উৎস্রাটনকে ডিমডুলেশন বলে। ইলেকট্রনিক মেইলের ক্ষেত্রে প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য উভয় প্রান্তে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। মেইল পদ্ধতিতে তথ্যাবলি কম্পিউটারে জমা করে রাখা যায় এবং প্রয়োজনের সময় এ তথ্যের পাঠ উদ্ধার করা যায়।

ই-মেইল ব্যবহারের সুবিধা : টেলিফোন ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের চেয়ে ই-মেইল ব্যবহারে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় :

ক) ই-মেইল ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে অধিক সংবাদ প্রেরণ করা যায়।

খ) কম্পিউটার স্মৃতি থেকে প্রয়োজনে তথ্যসমূহ বার বার পুনরুৎপাদন করা যায়।

গ) মেইল বক্সে সংবাদ জমা করে রাখা যায়।

ঘ) সংবাদকে শব্দ প্রক্রিয়াজাতকরণের (Word processing) মাধ্যমে সম্পাদনা করা যায়।

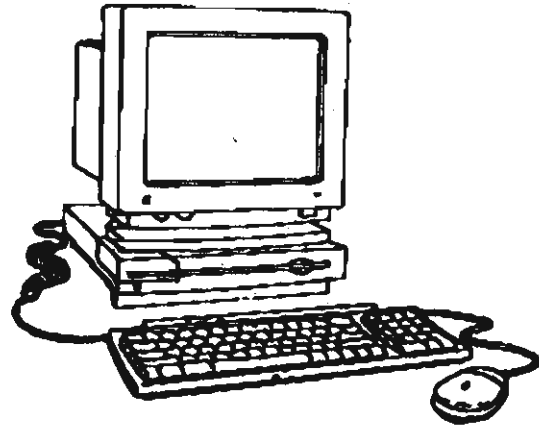
ঙ) সংবাদকে টেলেক্স বা ফ্যাক্সের মাধ্যমেও প্রেরণ করা যায়।

চ) এ যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

তাছাড়া ফ্যাক্স ধরনের ই-মেইলের জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে এর উচ্চমান সম্পন্ন পুনরুৎপাদন ক্ষমতা। এ যন্ত্রের সাহায্যে স্মারকলিপি, দলিল পত্রাদি, নক্সা, ছক ইত্যাদি অতিসহজে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

কম্পিউটার

বিজ্ঞানের যে আবিষ্কারটি মানব সমাজের সামনে এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং মানব সমাজের সর্বক্ষেত্রে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার। Compute (কমপিউট) মানে হিসাব বা গণনা করা। অতএব কম্পিউটার অর্থ হিসাবকারী বা গণনাকারী। সাধারণ অর্থে কম্পিউটার হচ্ছে হিসাব বা গণনা করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। এ যন্ত্র অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে থাকে। শুধু তাই নয়, এ যন্ত্র আজকাল মানুষের যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার শুধুমাত্র একটি যন্ত্র নয়। এটা অনেকগুলো যন্ত্রের সমন্বয়। তাই একে কম্পিউটার সিস্টেম বলা হয়। কম্পিউটারকে অধিকতর, দক্ষ, শক্তিশালী ও বহুমুখী কাজের উপযোগী করার জন্য অবিরত গবেষণা চলছে দুনিয়ার নানা দেশে। ভবিষ্যতের কম্পিউটারে বুদ্ধিমত্তা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর স্মৃতিতে জৈব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে।



চিত্র ১৫.৬ : কম্পিউটার

কম্পিউটারের শ্রেণী : যাবতীয় কম্পিউটারকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

১। বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও

২। সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

মহাকাশযান চালনা, ক্ষেপণাস্রের গতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। যে কোনো সাধারণ কাজের জন্য প্রয়োজনমত অংশবিশেষ সংযোজন করে যে ধরনের কম্পিউটার তৈরি করা হয় তাকে বলে সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

কম্পিউটারের গঠন ও ব্যবহারের প্রকৃতি বিবেচনা করে কম্পিউটারকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

১। ডিজিটাল কম্পিউটার

২। এনালগ কম্পিউটার

৩। হাইব্রিড কম্পিউটার

আকার, ওজন, কাজের দক্ষতা, কাজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনা করে আরও বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে।

কম্পিউটারের গঠন : কম্পিউটারের গঠন সংক্রান্ত কলাকৌশল কেবলমাত্র প্রকৌশলীগণই বুঝে থাকেন। তবে এর বাহ্যিক গঠনটা আমাদের জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হার্ডওয়্যার

কম্পিউটার তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত বাহ্যিক আকৃতি বিশিষ্ট যাবতীয় যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। এগুলোকে চোখ দিয়ে দেখা যায় এবং হাত দিয়ে স্পর্শও করা যায়। এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপন করে কম্পিউটারের বাহ্যিক কাঠামো গঠন করা হয়। হার্ডওয়্যার নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না।

সফটওয়্যার

হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশমালা তথা প্রোগ্রামসমূহকে সফটওয়্যার বলে। সফটওয়্যারের কাজ হচ্ছে কম্পিউটারকে চালনা করা।

হার্ডওয়্যার এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি অংশ। যথা :

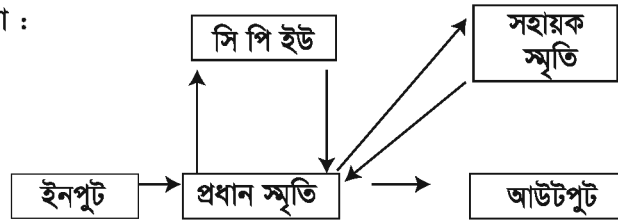
১। ইনপুট যন্ত্র

২। আউটপুট যন্ত্র

৩। সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ)

৪। প্রধান স্মৃতি

৫। সহায়ক স্মৃতি



চিত্র ১৫.৭ : কম্পিউটার পদ্ধতির বিভিন্ন অংশ

একটা ব্লক চিত্রের সাহায্যে এর অংশগুলোকে পাশে দেখান হল :

সাধারণত সিপিইউ ও প্রধান স্মৃতি অংশকে একত্রে একটি বাক্সে রাখা হয়।

সিপিইউকে আমাদের মস্তিষ্কের সংগে তুলনা করা যায়। এ সিপিইউ অন্যান্য অংশকে কার্যক্ষম রাখার নির্দেশ দেয়। এর প্রধান কাজ হচ্ছে তিনটি। যথা—

১। যুক্তি ও গাণিতিক বিষয়ক উপাস্তসমূহকে তার বিভিন্ন অংশে প্রেরণ ও গ্রহণ।

২। প্রোগ্রামের নির্দেশনাকে সাজিয়ে বোধগম্য করে সংকেত সৃষ্টি করা।

৩। বিভিন্ন উপাস্তকে মানের ক্রমানুসারে সাজানো।

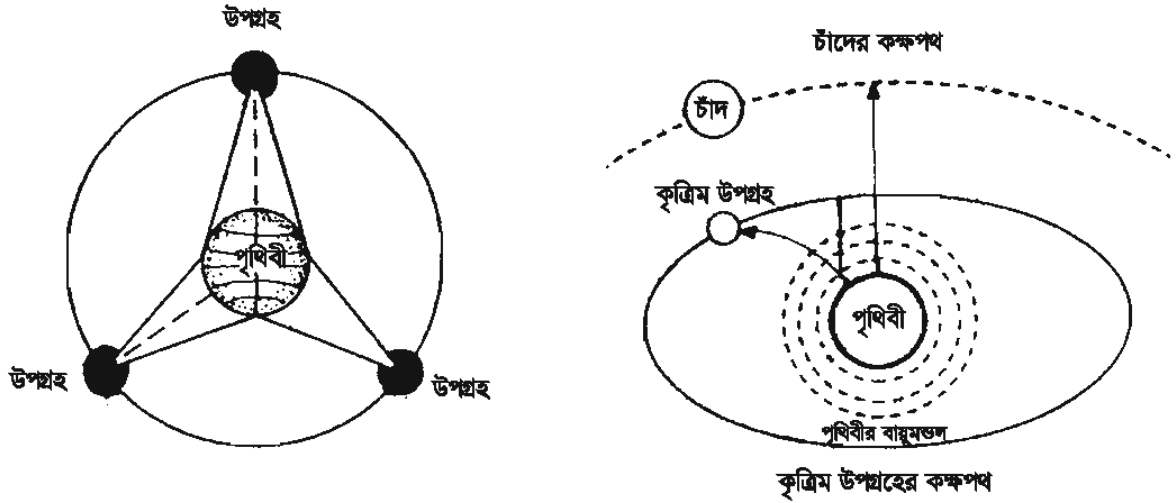
সিপিইউ এর কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আলাদা আরও অনেকগুলো অংশ রয়েছে।

কম্পিউটার ব্যবহারের গুরুত্ব : বর্তমান যুগে মানুষ যাবতীয় কাজের জন্য কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল। তার কারণ—

- ১। জাতীয় পর্যায়ে কাজ। যেমন— পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, আদমশুমারি, কৃষি শুমারি ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ উপাস্ত জড়িত থাকে। এ সকল কাজ মানুষের সাহায্যে করতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অথচ এ কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে অতিদ্রুত সম্পন্ন করা যায়।
- ২। কম্পিউটারকে শুল্ক উপাস্ত সরবরাহ করে সঠিক প্রোগ্রাম করে দিলে এটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ফল প্রদান করে। মানুষের প্রায়ই ভুল হয়। তাই বিশুদ্ধ ও দ্রুত কাজের জন্য মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে।
- ৩। বিপুল পরিমাণ উপাস্ত কম্পিউটার অতি অল্প জায়গায় জমা করে রাখতে পারে। বড় বড় কম্পিউটার বিলিয়ন বিলিয়ন উপাস্ত জমা করে রাখতে পারে।
- ৪। মানুষ অনবরত কিছুক্ষণ কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কম্পিউটার অবিরত দিনের পর দিন কাজ করেও ক্লান্ত হয় না।
- ৫। কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক জটিল কাজ করা যায়। আবার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলেও কম্পিউটার কাজ করতে পারে। যেমন—আণবিক চুল্লির তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবেশে, যেখানে মানুষের জীবন নিরাপদ নয়, সেখানেও কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ করা যায়।

যোগাযোগ উপগ্রহ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্রুত বেতার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আজকাল উপগ্রহ ব্যবহার করা হচ্ছে। উপগ্রহ বলতে আমরা সাধারণত কোনো গ্রহের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে বুঝে থাকি। যেমন—



চিত্র ১৫.৮ : কৃত্রিম উপগ্রহ

পৃথিবী একটি গ্রহ। এর চারদিকে ঘূর্ণায়মান চাঁদ একটি উপগ্রহ। মঙ্গলের এ ধরনের দুটো উপগ্রহ আছে। এদের নাম ফবো ও ডিমোস। কিন্তু বেতার যোগাযোগের জন্য যে উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় সেগুলো কৃত্রিম। চাঁদ বা অন্যান্য উপগ্রহের মতো এত দূরের বস্তুকে এ কাজে ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয়। তাই মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করেছে। এ ধরনের উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে মহাশূন্যে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। বিজ্ঞানীগণ এটির সাহায্যেই যোগাযোগের কাজটি সম্পন্ন করেন।

পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে যোগাযোগ উপগ্রহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে সেখান থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে এক দেশের সংবাদ বহু দূরে অন্য দেশে পাঠানো যাচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শোনা ও দেখা সম্ভব হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৮৮০ কিলোমিটার উপরে উপগ্রহ স্থাপন করা হলে তার কক্ষ পরিক্রমণের সময় এবং পৃথিবীর আবর্তনের সময় সমান হয়, অর্থাৎ উপগ্রহটি পৃথিবীর উপরে এক জায়গায় আকাশে স্থির হয়ে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর বিষুবরেখার উপরে পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে তিনটি অবস্থানে তিনটি উপগ্রহ স্থাপন করলেই সারা পৃথিবীতে বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান পৌঁছানো যেতে পারে। বর্তমানে এ উপায়ে একদেশ থেকে অন্য দেশে টেলিফোনে কথাবার্তা বলা এবং টেলিভিশনে ছবি দেখা সম্ভব হচ্ছে। এরূপ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চাঁদে নভোচারীদের হাঁটা বা অলিম্পিক খেলার দৃশ্য ও শব্দ পৃথিবীর নানা দেশের লোক এক সঙ্গে দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোন যন্ত্রটির আবিষ্কারক একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী?

- ক. টেলিগ্রাফ
- খ. রেডিও
- গ. টেলিভিশন
- ঘ. কম্পিউটার।

২। নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. স্পীকার— শব্দশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- খ. ই মেইল— ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বার্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো স্থানে প্রেরণ করে।
- গ. মডুলেটর— অডিও ও ভিডিও তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ হতে পৃথক করে।
- ঘ. রেফ্রিজারেটর— নিম্ন উষ্ণতার বস্তু হতে তাপকে উচ্চ উষ্ণতার বস্তুতে প্রেরণ করে।

৩। কোন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ২৫০ মিটার হলে প্রতি সেকেন্ড তার কম্পন সংখ্যা কত?

- ক. ১,২০০ সাইকেল
- খ. ১,২০০ কিলোসাইকেল
- গ. ১২০ সাইকেল
- ঘ. ১২০ কিলোসাইকেল।

৪। টেলিভিশনের পিকচার টিউবে ছবি উৎপন্ন হওয়ার জন্য নিচের কোন ক্রমটি সঠিক—

- ক. ক্যামেরা → চিত্র → গ্রাহকযন্ত্র → প্রেরকযন্ত্র →
পিকচার টিউব → প্রেরিত চিত্র।
- খ. প্রেরিত চিত্র → ক্যামেরা → প্রেরকযন্ত্র → গ্রাহক যন্ত্র →
পিকচার টিউব → চিত্র।
- গ. চিত্র → ক্যামেরা → প্রেরকযন্ত্র → গ্রাহকযন্ত্র →
পিকচার টিউব → প্রেরিত চিত্র।
- ঘ. চিত্র → প্রেরক যন্ত্র → গ্রাহকযন্ত্র → পিকচার টিউব → প্রেরিত চিত্র।

সৃজনশীল প্রশ্ন

রফিক সাহেবের ছেলেটি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সে ঘরে বসে টেলিভিশনে পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিল। হঠাৎ তার মাথায় প্রশ্ন আসে কীভাবে এই খেলাটি টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনা কীভাবে আমরা ঘরে বসে টেলিভিশনে দেখছি।

- ক. কৃত্রিম উপগ্রহ কী?
- খ. সংবাদ আদান-প্রদানের সর্বোত্তম মাধ্যম কোনটি এবং কেন?
- গ. পাকিস্তানের করাচি থেকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচটি কীভাবে টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. যদি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষ পরিক্রমণের সময় এবং পৃথিবীর আবর্তনের সময় ভিন্ন হয় সে ক্ষেত্রে টেলিভিশনে দূর দেশের কোনো অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা কি সম্ভব— তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ষোড়শ অধ্যায়

পরিষ্কারক সামগ্রী

আমাদের শরীরের বাইরের অংশ ত্বক, নখ, চুল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত ময়লা হয়। বাতাসের সাথে উড়ে আসা ধূলাবালি দেহের ওপর জমা হয়। আবার শরীরের ভেতর থেকে ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে আসে তেল, চর্বি, লবণ ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ। সব কিছু মিলে শরীরকে ময়লা করে। দেহের ওপর জমা এ ময়লা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার করা স্বাস্থ্য ভালো রাখার পূর্বশর্ত।

শুধু কি দেহ? আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র সব কিছুই নিয়ত ময়লা হচ্ছে। ধূলাবালির আস্তর পড়ে সব ব্যবহার্য দ্রব্যই বিভিন্নভাবে অপরিষ্কার হচ্ছে। এতে দ্রব্য সামগ্রীর সৌন্দর্য ও রং নষ্ট হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

দেহ, কাপড়-চোপড় এবং দ্রব্যসামগ্রীর ওপর জমা এ সব ময়লা পরিষ্কার করার জন্য যে সব জিনিস ব্যবহার করা হয় তাদের সাধারণ নাম পরিষ্কারক। এ সব পরিষ্কারকের মধ্যে বহুল প্রচলিত সামগ্রীটি হল সাবান। এছাড়া আছে ডিটারজেন্ট, ইমালশান, পলিশ, টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে আমরা সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরির উপাদান ও পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকার সাবান ও ডিটারজেন্ট নিয়ে আলোচনা করব।

সাবান

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পরিষ্কারক হিসেবে সাবান প্রস্তুত ও ব্যবহার করে আসছে। সাবান প্রস্তুতের পদ্ধতি এবং সাবানের গুণগত মানও ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। সাবান তৈরির জন্য স্থাপিত হয়েছে বড় বড় কারখানা। সাবান তৈরির মূল উপাদান হল চর্বি এবং ক্ষার। ক্ষার হিসেবে ব্যবহৃত হয় কস্টিক সোডা বা পটাশ। চর্বি হিসেবে বিভিন্ন গবাদি পশুর চর্বি, উদ্ভিজ্জ তেল, যেমন নারকেল তেল, পাম অয়েল, মহুয়া তেল, ক্যাস্টর অয়েল, অলিভ অয়েল এবং প্রাণীজ তেল। যেমন-গ্রিজ, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। যেমন-সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট, বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি ও রঞ্জক পদার্থ বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার উপযোগী সাবান তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

সাবান তৈরির পদ্ধতি

সাবান তৈরির প্রচলিত পদ্ধতি ৩টি :

- (১) শীতল পদ্ধতি (Cold process),
- (২) অর্ধ স্ফুটন পদ্ধতি
- (৩) পূর্ণ স্ফুটন পদ্ধতি

শীতল পদ্ধতি এবং অর্ধ-স্ফুটন পদ্ধতি

শীতল পদ্ধতি এবং অর্ধস্ফুটন পদ্ধতি, পূর্ণ-স্ফুটন পদ্ধতির তুলনায় কম ব্যবহৃত হয়। শীতল পদ্ধতিতে যান্ত্রিক নাড়ন-কাঠি সজ্জিত একটি পাত্রে চর্বিকে প্রথমে গলানো হয়। অতঃপর এর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে কস্টিক সোডা

যোগ করে ভালোভাবে নাড়ানো হয়। এতে একটি পুরু ইমালসান তৈরি হয় যা ফ্রেমে চালনা করা হয়। এ অবস্থায় কয়েকদিন রেখে দেওয়া হয় এবং অতঃপর কঠিন সাবানকে ফ্রেম থেকে আলাদা করা হয়।

অর্ধস্ফুটন পদ্ধতিটি অনেকটা একই রকম। তবে এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ প্রয়োগ করে অল্প সময়ে সাবানায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়।

ঘরে বসে শীতল পদ্ধতিতে সাবান তৈরির তিনটি ফরমুলা দেওয়া হল :

১। লব্ধি সাবানের জন্য	৫ কেজি
নারকেল তেল	৪ কেজি
মহুয়া তেল	৬ কেজি
ক্যাস্টর অয়েল	৬ কেজি
কস্টিক সোডা লেই	১৫ কেজি
সোপ স্টোন পাউডার	১০ কেজি
সোডিয়াম সিলিকেট	১০ কেজি
২। টয়লেট সাবান (লাঞ্জ জাতীয় সাদা সাবান)	
নারকেল তেল	২১ কেজি
কস্টিক সোডা লাই	৯ কেজি
জিঙ্ক অক্সাইড	৩৫ কেজি
লাঞ্জ পারফিউম	১০০ সিসি
৩। টয়লেট সাবান (লাইফবয় ধরনের সাবান)	
নারকেল তেল	৯ কেজি
রজন	৩ কেজি
ক্যাস্টর অয়েল	৩ কেজি
কস্টিক সোডা লেই	৭ কেজি
কার্বলিক এসিড	পরিমাণমত
সাবানের রং (লাল)	পরিমাণমত

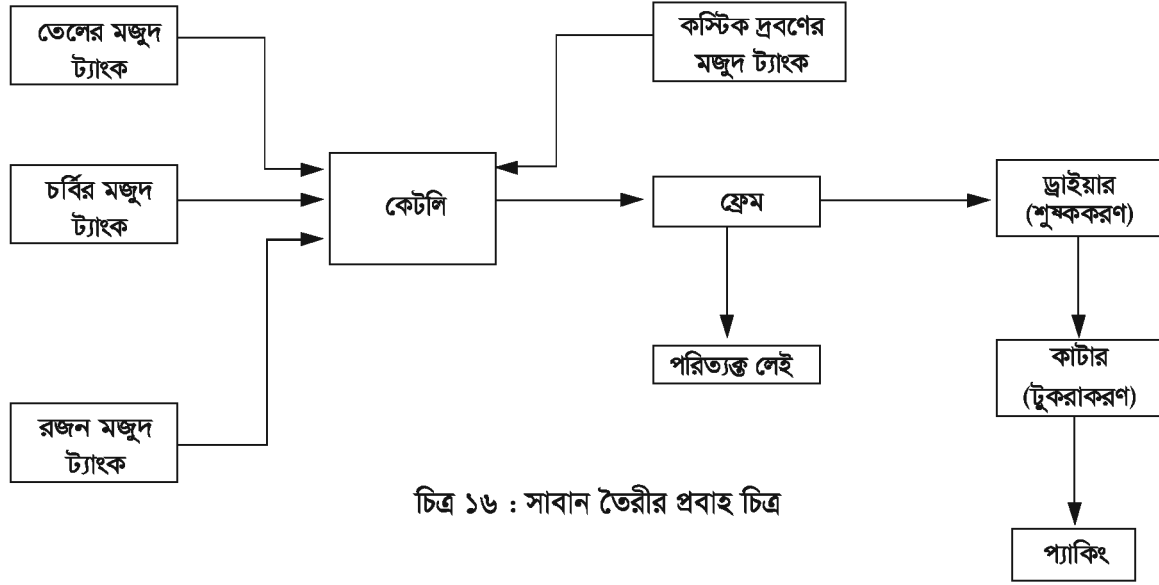
পূর্ণ স্ফুটন পদ্ধতি

বড় বড় সাবান কারখানাগুলোতে এ পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি বৃহৎ পাত্রে নির্দিষ্ট অনুপাতে চর্বি বা তেল এবং ক্ষারকে উত্তপ্ত করে ফুটিয়ে সাবান উৎপন্ন করা হয়। সাবান শিল্পে প্রধানত দুই উপায়ে পূর্ণ স্ফুটন প্রক্রিয়ায় সাবান তৈরি করা হয়। তা হল কেটলি পদ্ধতি ও অবিরাম পদ্ধতি। পদ্ধতি দুটি এখানে আলোচনা করা হল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাবান তৈরি হলেও মূলনীতি মোটামুটি একই থাকে। নিচে সাবান প্রস্তুতের একটি সাধারণ প্রবাহচিত্র দেখান হল :

কেটলি পদ্ধতি

কেটলি পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুতের জন্য বিশাল আকৃতির একটি কেটলি ব্যবহার করা হয়। একটি কেটলি প্রায় ১৫০ টন সাবান ধারণ করতে পারে। প্রথমত কেটলিতে চর্বি ঢেলে গালানো হয় এবং অল্প অল্প করে কস্টিক সোডার দ্রবণ



উত্তপ্ত চর্বিতে যোগ করা হয়। ৩/৪ ঘণ্টা পরে মাখনের মতো মসৃণ সাবানের লেই বা পেস্ট তৈরি হয় এবং ফুটতে থাকে। এ ফুটন্ত সাবানে আস্তে আস্তে লবণের দ্রবণ বা লবণ পানি ঢালতে হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলে গ্রেইনিং। এতে সাবানের লেই আলাদা হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাপ প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয় এবং কেটলিতে থিতানো হয়। এতে কেটলির তলায় গ্লিসারিন, লবণের দ্রবণ এবং লেই জমা হয়। এক পর্যায়ে এ গ্লিসারিন ও লেই বের করে আনা হয়।

কেটলিতে সাবানকে তাপ দিয়ে আবার ফুটানো হয় এবং আস্তে আস্তে পানি যোগ করা হয়। ফলে সাবানে লেগে থাকা লবণ ও গ্লিসারিন দ্রবীভূত হয়ে ধুয়ে যায়। এতে সাবান আরও নরম ও মসৃণ হয়। এভাবে কয়েক বার স্ফুটন ও ধৌত করণের পর কেটলির উপরি ভাগে পরিষ্কার সাবান, মধ্য স্তরে তীব্র ক্ষারীয় সাবান এবং নিচের স্তরে সাবান ও লেইয়ের মিশ্রণ পাওয়া যায়। উপরের সাবানকে পাম্প করে সরিয়ে নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

অবিরাম পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে কেটলির পরিবর্তে একটি স্টেইনলেস স্টিলের টিউব ব্যবহার করা হয়। টিউবটির ব্যাস প্রায় ৩ ফুট এবং উচ্চতা ৮০ ফুট হয়ে থাকে। এর নাম হাইড্রোলাইজার। উচ্চচাপে উত্তপ্ত পানিকে হাইড্রোলাইজারের মধ্যে পাম্প করে ঢুকানো হয়। একই সঙ্গে হাইড্রোলাইজারের তলা দিয়ে ঢুকানো হয় উত্তপ্ত চর্বি। উত্তাপের ফলে চর্বি ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। ফ্যাটি এসিড হাইড্রোলাইজারের উপরের অংশে ভেসে ওঠে। একে অপসারণ ও শোধন করে ক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে সাবান তৈরি করা হয়।

প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপে সাবানের ঘন দ্রবণ বা পেস্টকে একটি বিশেষ যন্ত্রে নেওয়া হয়, এর নাম ক্রাচার। ক্রাচারের মধ্যে সাবানের সঙ্গে অন্যান্য উপাদান। যেমন— সামান্য গন্ধদ্রব্য, বর্ণ বিরঞ্জক দ্রব্য, টিটানিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি যোগ করা হয়। এতে সাবানের গুণগত মান রক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যবহারের উপযোগী সাবান প্রস্তুত হয়। যেমন— সোডিয়াম সিলিকেট মিশালে সাবান বেশি শক্ত হয়।

ক্রাচারে সাবানকে উত্তমরূপে দলিত মথিত করা হয়। এতে পানির ভাগ কমে যায়। এ সাবানকে লোহার বাস্কে বা ফ্রেমে ঢালা হয়। আধুনিক অবিরাম পদ্ধতির যন্ত্রে একটি বায়ুশূন্য কক্ষে উত্তপ্ত সাবান দ্রবণ প্রেরণ করা হয়। এ কক্ষে সাবানের অতিরিক্ত জলীয় অংশ এবং অপদ্রব্য দূর হয়। অতঃপর শুকনো সাবান নিডিং ইউনিটে ঢুকানো হয়। সেখানে

সাবানে সুগন্ধি ও জীবাণুনাশক মিশিয়ে ছাঁচের মধ্যে চাপ দিয়ে লম্বা বারে বা আয়তাকার টুকরায় পরিণত করা হয়। এ লম্বা টুকরাকে প্রয়োজনমত আকারে কেটে ছাঁচের মধ্যে চাপ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট করা হয় এবং এর গায়ে ট্রেড মার্ক, ব্রান্ড ইত্যাদি খোদাই করা হয়।

সাবানের প্রকারভেদ

সাবান মূলত দুই ধরনের। শক্ত সাবান ও কোমল সাবান। কস্টিক সোডা দ্বারা প্রস্তুত সাবান শক্ত সাবান এবং কস্টিক পটাশ দ্বারা প্রস্তুত সাবান হল কোমল সাবান। দুই ধরনের সাবানের মধ্যেই ব্যবহারের সুবিধার জন্য আকার আকৃতি হিসেবে বাজারে বিভিন্ন প্রকারের সাবান পাওয়া যায়। নিচে এসব বিভিন্ন ধরনের সাবান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

বার বা কেক সাবান

সাবানের পেস্ট বা ময়দার তালের মতো ঘন সাবান দ্রবণকে নির্দিষ্ট আয়তাকার আকারে বাজারজাত করা হয়। কখনও একে ওভাল বা ডিম্বাকৃতি আবার কখনও গোল বা বল আকারেও বাজারজাত করা হয়। সাধারণত টয়লেট সাবান এবং লন্ড্রি সাবানগুলোকে এ আকৃতি দেওয়া হয়।

টয়লেট সাবান

গোসলের জন্য যে টুকরা সাবান ব্যবহার করা হয় এর সাধারণ নাম প্রসাধনী বা টয়লেট সাবান। এর উপাদান উজ্জ্বল তেল, সুগন্ধি এবং জীবাণুনাশক পদার্থ। কখনও কখনও হালকা রঞ্জক পদার্থও ব্যবহার করা হয়। এ সাবান বেশ নরম।

লন্ড্রি সাবান

কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য টুকরা বা গোল বলের আকারে এ সাবান প্রস্তুত করা হয়। এতে উজ্জ্বল তেল থাকে না বললেই চলে। এর উপাদান চর্বি, কস্টিক সোডা ও রঞ্জক। এতে সাধারণত সুগন্ধ এবং জীবাণুনাশক থাকে না। এ সাবান তুলনামূলকভাবে শক্ত।

শেভিং সাবান

এই সাবান পেস্টের মতো নরম। টিউবে বাজারজাত করা হয়। একে শেভিং ক্রিমও বলে। এতে যথেষ্ট পরিমাণ কস্টিক পটাশ ও অতিরিক্ত স্টিয়ারিক এসিড ব্যবহৃত হয়। এ সাবান নরম এবং এর ফেনা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

ফ্লেইক বা গুঁড়ো সাবান

বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গুঁড়ো সাবান পাওয়া যায়। গরম সাবান দ্রবণকে দুটি ইস্পাত রোলারের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। একটি রোলার ছোট এবং উত্তপ্ত থাকে অন্য রোলারটি অপেক্ষাকৃত মোটা এবং শীতল থাকে। ফলে দ্বিতীয় রোলারের গায়ে পাতলা চাদরের মতো সাবান লেগে যায়। যান্ত্রিক উপায়ে রোলারের গা থেকে এ পাতলা সাবান স্তরকে রিবনের মতো ফালি করে একটি স্বয়ংক্রিয় রোলারের সাহায্যে চেঁছে তোলা হয় এবং ড্রাইয়ারের মধ্যে শুকানো হয়। এভাবে গুঁড়ো বা ফ্লেইক সাবান তৈরি হয়।

দানা সাবান

সাবান দ্রবণকে ক্রাচার থেকে তুলে একটি ড্রাইং টাওয়ারের ওপর থেকে নিচের দিকে ফেলা হয় এবং বিপরীত দিক থেকে টাওয়ারের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ চালান হয়। এতে সাবান শুকিয়ে যায় এবং ঘনত্ব বেড়ে যায়। টাওয়ারের তলায় শস্য দানার মতো সাবান কণা জমা হয়। দুটি চালুনির সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মোটা দানাগুলো আলাদা করে একই সাইজের দানাগুলো প্যাকেট করা হয়।

তরল সাবান

সাবানের লেইয়ের সঙ্গে বিশেষ দ্রাবক মিশিয়ে সাবানকে তরল রাখা হয় এবং বোতলজাত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। একে তরল সাবান বলে। আমাদের দেশেও এ ধরনের সাবানের প্রচলন শুরু হয়েছে।

আমাদের দেশে কাপড় ধোয়ার কাজে কেক বা বার এবং বল সাবানের ব্যবহার বেশি, কিন্তু উন্নত দেশে দানা সাবান এবং গুঁড়ো সাবানের ব্যবহার বেশি।

ডিটারজেন্ট

ডিটারজেন্ট এক শ্রেণীর পরিষ্কারক। নানা ধরনের সিনথেটিক পদার্থ থেকে এগুলো প্রস্তুত করা হয়। ডিটারজেন্ট প্রস্তুতি মূলত কতকগুলো জটিল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। একটি কেমিকেল প্লান্টে প্রথমে সিনথেটিক পরিষ্কারক প্রস্তুত করা হয়। এ জন্য বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল। যেমন— পেট্রোলিয়াম উপজাতসমূহ, সাবান তৈরির উপাদান উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

গরুর চর্বি বা ট্যালো থেকে ডিটারজেন্ট প্রস্তুতের জন্য ট্যালোর সঙ্গে মিথাইল এলকোহলের বিক্রিয়া ঘটানো হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে হাইড্রোজেন যোজিত করা হয়। এভাবে উৎপন্ন হয় হডাইড্রোজেনেটেড ট্যালো এলকোহল। এটি একটি তরল পদার্থ। এ তরলকে প্রথমে সালফিউরিক এসিডে এবং পরে ক্ষারের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। এভাবে ডিটারজেন্ট উৎপন্ন হয়। এ অবস্থায় ডিটারজেন্টের মধ্যে অন্যান্য রং, বিরঞ্জক, তন্তু উজ্জ্বলকারক দ্রব্য, বিল্ডার ইত্যাদি মিশান হয় এবং ডিটারজেন্টকে গুঁড়ো, দানা, তরল বা বার হিসেবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

গুঁড়ো ও দানা ডিটারজেন্ট প্রস্তুতের প্রক্রিয়া যথাক্রমে গুঁড়ো সাবান ও দানা সাবান প্রস্তুতের অনুরূপ। ডিটারজেন্ট দানার সঙ্গে আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে ট্যাবলেটের ছাঁচে চাপ দিয়ে ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট প্রস্তুত করা হয়। সাধারণ তাপে ডিটারজেন্টকে তরল রাখতে পারে কিন্তু এর সঙ্গে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া করে না এ রূপ রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করে তরল ডিটারজেন্ট প্রস্তুত করা হয়।

সাবান ও ডিটারজেন্টের তুলনা

সাবান ও ডিটারজেন্ট উভয়েরই মধ্যেই একটি প্রধান পরিষ্কারক উপাদান বিদ্যমান। এ উপাদান এমন অণু দ্বারা গঠিত যে অণু কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠে ময়লা কণাগুলো দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অণুগুলো ময়লা কণার সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং কঠিন পৃষ্ঠ থেকে ময়লা কণাগুলোকে আলাগা করে ফেলে, ফলে পানি দিয়ে ধুলে বা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে ময়লা দূর হয়। অধিকাংশ ডিটারজেন্টে থাকে সিনথেটিক পরিষ্কারক এবং অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ। এ যৌগসমূহ ডিটারজেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সাবান থেকে ডিটারজেন্ট ব্যবহারের সুবিধা বেশি। ডিটারজেন্ট খর পানিতেও কাজ করে, উত্তম ফেনা দেয়। পক্ষান্তরে সাবান খর পানিতে ফেনা তৈরি করতে পারে না। প্রচুর সাবান খরচ করেও পরিষ্কারের কাজ সুষ্ঠু হয় না। এর কারণ খর পানির মধ্যে যে সকল লবণ থাকে সাবানের সঙ্গে তাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। ফলে সাবানের দই বা চুন সাবান উৎপন্ন হয় এবং সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। টিউবওয়েলের পানিতে সাবান গুললে এ রকম দেখা যায়। চুন সাবান পানিতে অদ্রবণীয় তাই পানির উপর ভেসে ওঠে। এতে কাপড় চোপড় ধোয়ায় সমস্যা হয়। ডিটারজেন্টে এরূপ হয় না।

সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্টের কঠিন তলের ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা বেশি। তাছাড়া ঠান্ডা পানিতেও ডিটারজেন্ট অধিক দ্রুত গলে যায়। বিভিন্ন উপাদান থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট তৈরি হয়। উপাদানভেদে ডিটারজেন্টের পরিষ্কার করার ক্ষমতাও বিভিন্ন রকম হয়।

অন্যান্য পরিষ্কারক

বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারের কাজে সাবান, ডিটারজেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। যেমন— টয়লেটের বেসিন, পায়খানার কমোড এবং মেঝে পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় টয়লেট ক্লিনার। ধাতব পৃষ্ঠের জন্য বিশেষ ধরনের ইমালশন। যেমন— মেটাল পলিশ, কাচ ও প্লাস্টিক পরিষ্কার করতে উইন্ডো ক্লিনার; কম্পিউটার, ভিসিপি ও টেপ রেকর্ডারের হেড পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরনের এলকোহল জাতীয় তরল।

পরিষ্কারক সামগ্রী কেবল পরিষ্কারের কাজেই ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন স্থানে এসব সামগ্রী নানা ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। শিল্প-কারখানায় পরিষ্কারক ও পিচ্ছিলক হিসেবে, নরম করার কাজে এবং পলিশের কাজে প্রচুর পরিমাণে সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়। যেমন—মোটর গাড়ির টায়ার প্রস্তুতের সময় গলিত রবার যাতে ছাঁচের মধ্যে লেগে না যায় সে জন্য উত্তপ্ত অবস্থায় ছাঁচে সাবান প্রয়োগ করা হয়। জুয়েলারি পলিশের কাজে সাবান ব্যবহৃত হয়। চামড়া নরম করতে সাবান ব্যবহৃত হয়। সাবান এবং ডিটারজেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষ্কারক। যে দেশ যত উন্নত সে দেশে সাবান ও ডিটারজেন্টের ব্যবহার তত বেশি। সাবান, ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারকসমূহ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর অধিক ব্যবহার শরীর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এতে কাপড়ের রং নষ্ট হতে পারে, শরীরে চর্মরোগ হতে পারে। যেখানে সেখানে ফেলা সাবানের লেই, কাপড় ধোয়া বা কাপড় কাচার সাবান যুক্ত পানি পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন— পুকুর বা জলাশয়ের মাছ ও উদ্ভিদ মরে যেতে পারে এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতে পারে। তাই এসব সামগ্রীর ব্যবহারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি এসিড?

- ক. NaCl
- খ. HCl
- গ. MgSO₄
- ঘ. NaOH

২। পরিষ্কারক সামগ্রীর একটি সাধারণ উপাদান যা—

- i. ময়লার সাথে বিক্রিয়া করে ময়লাসমূহকে পৃথক করে।
- ii. পানির সাথে বিক্রিয়া করে ময়লাকে কঠিন পৃষ্ঠ হতে পৃথক করে।
- iii. ময়লাযুক্ত কঠিন পৃষ্ঠ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং পানির সাহায্যে ময়লাকে পৃথক করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

৩। ১৩০ গ্রাম ভরের একটি সাদা সাবান তৈরি করতে নারকেল তেল, কস্টিক সোডা ও জিঙ্ক অক্সাইডের ভরের অনুপাত কোনটি?

- ক. ২১:৮:৩৬
- খ. ২০:৯:৩৬
- গ. ২১:৯:৩৫
- ঘ. ২২:৯:৩৪

নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কাজল সাহেবের গ্রামে একটি মাত্র পুকুর। গ্রামের সকলেই পুকুরে গোসল করে, কাপড় পরিষ্কার করে এবং রান্নার পানি সংগ্রহ করে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল পুকুরের মাছ মারা যাচ্ছে এবং পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

৪। মাছগুলো মরে যাওয়ার জন্য কোন কারণটি সবচেয়ে দায়ী?

- ক. অধিক মানুষের গোসল করা
- খ. অধিক পরিমাণ সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা
- গ. পুকুরের পানি পচে যাওয়া
- ঘ. পানির উপরে সাবানের ফেনা ভেসে থাকা।

৫। মাছের মৃত্যু ও পানি দূষণ রোধে কাজল সাহেব তাঁর গ্রামের মানুষকে—

- i. কম সাবান ব্যবহার করতে বলবেন।
- ii. কাপড় কাচতে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে বলবেন।
- iii. পানি তুলে নিয়ে পুকুর পাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় কাপড় কাচতে বলবেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাছিমা বেগম পরিবারের সকলের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য হুইল, তিব্বত ৫৭০, আলমের পচা সাবান ব্যবহার করতেন। তিনি সম্প্রতি সাবানের পরিবর্তে সার্ব এজেল, হুইল পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এতে কাপড় পরিষ্কার করা খুব সহজ হচ্ছে। কিন্তু তিনি লক্ষ করেন যে, এতে কাপড়ের রং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

- ক. কাপড় কাচা সাবান কী?
- খ. হুইল, তিব্বত ৫৭০ সাবান এবং সার্ব এজেল, হুইল পাউডারের মধ্যে পার্থক্য কী?
- গ. কাপড়ের রং নষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. নাছিমা বেগম সাবানের পরিবর্তে সার্ব এজেল, হুইল পাউডার ব্যবহার করলেন কেন—ব্যাখ্যা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রসাধনী সামগ্রী

রূপচর্চা মানুষের একটি চিরন্তন অভ্যাস। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে, ধর্মীয় কারণে, যুদ্ধ ও উৎসবে, অত্যধিক ঠান্ডা বা গরম থেকে দেহত্বক রক্ষার জন্য মুখাবয়ব এবং দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে বিভিন্ন পদার্থের প্রলেপ ব্যবহার করত। দেহত্বকের বিশেষ যত্নের জন্য ব্যবহৃত এসব পদার্থের সাধারণ নাম প্রসাধনী। প্রাচীন গ্রিক, মিশর ও ভারত উপমহাদেশে এসব প্রসাধনী দ্রব্য তৈরি হত প্রধানত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উৎস থেকে, যেমন হলুদ, বেসন (ডাল), নিমপাতা, তেলাকুচার পাতা, পাথরকুচির পাতা, মোম, বিভিন্ন ধরনের তেল, কাজল, মধু, দুধ, দুধের সর, ডাবের পানি, ডিম, চন্দন, শংখচূর্ণ, শসা, আলু ইত্যাদি। খনিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত মূলত পানি মাটি, সাজি মাটি, হরিতাল, ইত্যাদিও প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হত।

প্রসাধনীর সংজ্ঞা

যে সমস্ত সামগ্রী বা পদার্থ দেহের বাহ্যিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন ত্বক, চুল, নখ, মুখ, মুখমণ্ডল, চোখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কমনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে সে সব সামগ্রীকে প্রসাধনী সামগ্রী বা সংক্ষেপে প্রসাধনী বলে। বিভিন্ন দুর্গন্ধনাশক সুগন্ধি, জীবাণুনাশক পদার্থ, ফেস পাউডার, লিপস্টিক, নেল পলিশ, স্যাম্পু, তেল, ইমালশান, ক্রিম, টুথপেস্ট ইত্যাদি অনেক ধরনের প্রসাধনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। প্রাচীন কাল থেকে প্রসাধনী প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ পদার্থ। অতি সম্প্রতি প্রসাধনী প্রস্তুতের জন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এসব পদার্থ দেহের জন্য যথেষ্ট উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ, এলকোহল, স্কার, গ্লিসারিন, ট্যালক, ধাতব অক্সাইড, ইত্যাদি। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচর্যার জন্য ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রসাধনী। ব্যবহারের বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রসাধনী সামগ্রীকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- (১) ত্বকের যত্নের প্রসাধনী
- (২) চুলের যত্নের প্রসাধনী
- (৩) মুখের ও দাঁতের যত্নের প্রসাধনী
- (৪) নখের যত্নের প্রসাধনী

ত্বকের যত্ন

ত্বকের যত্নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়। ত্বক দেহের আবরণ, দেহকে বাইরের পরিবেশ থেকে রক্ষা করে। দেহের অভ্যন্তরের দূষিত বর্জ্য পদার্থ, ঘাম নিষ্কাশিত হয় ত্বকের মাধ্যমে। ত্বকের কমনীয়তা, উজ্জ্বলতা ও বর্ণ দেহের সৌন্দর্যের পরিচায়ক। তাই ত্বকের যত্ন অপরিহার্য। ত্বকের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অংশের চামড়া, মুখমণ্ডলের বহির্ভাগ, চোখ ও ঠোঁট অন্তর্ভুক্ত। তাই ত্বকের যত্ন বলতে এসব অঙ্গের যত্নের কথাও আসে।

হাত, পা, দেহের চামড়া ও মুখমণ্ডলের ত্বকের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ক্রিম, ফেস পাউডার, টেলকাম পাউডার, ব্লুজ, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিলা ক্রিম, স্নো, হেয়ার রিমুভার, সানটান লোশান, ক্লিনজিং মিক্স, হ্যাডক্রিম, ইমালশান অয়েল, ডিওডোরেন্ট, ফুট পাউডার ইত্যাদি।

এখানে বেবি পাউডার তৈরির একটি ফরমুলা উল্লেখ করা হল—

ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট	৫ ভাগ
হালকা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	৫ ভাগ
ট্যালক	৮৭.৫ ভাগ
বোরিক এসিড	২.৫ ভাগ

প্রস্তুত পদ্ধতি : টেলকাম পাউডারের অনুরূপ।

নিচের উপাদানগুলো প্রদত্ত অনুপাতে মিশিয়ে পাউডার এবং ক্রিমের জন্য গন্ধদ্রব্য তৈরি করা যাবে।

ল্যাভেভার গন্ধ

কৃত্রিম ল্যাভেভার যৌগ	১০০
ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	৭০০
ওরিস রেজিনয়েড	১০০
ল্যাভেভা ফিক্সেটিভ	১০০
মাস্ক এমব্রোট	৫০
	<hr/>
	১০৫০

জেসমিন (যুঁই) গন্ধ

কৃত্রিম জেসমিন এসেন্স	১০০
ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	৭০০
হেলিওট্রপিন	৮০
জেসমিন ফিক্সেটিভ	১০০
মাস্ক জাইলেন	২০
	<hr/>
	১০০০

ক্রিম

ক্রিম মূলত পানি এবং তেলের মিশ্রণে তৈরি মাখনের মতো অর্ধঘন পদার্থ। সাধারণত দু ধরনের ক্রিম হয় পরিষ্কারক বা মালিশ জাতীয় ক্রিম এবং প্রলেপন জাতীয় ক্রিম। অনেক ক্রিমের মধ্যে আবার দু ধরনের গুণই থাকে। ত্বকের ওপর প্রথম প্রকারের ক্রিম অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু এ ক্রিম ত্বকের ওপর মালিশ করায় দেহ ও মন টাটকা সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ক্রিম তৈরিতে সাধারণত কনিফার অয়েল, কর্পূর সমৃদ্ধ তেল, রোজমেরী অয়েল, ল্যাভেভার অয়েল, স্পাইক অয়েল, ইউক্যালিপটাস অয়েল, থাইম অয়েল এবং পেটিটগ্রেইন অয়েল এবং প্রায় ০.২% থেকে ০.৫% পারফিউম বা গন্ধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিম ত্বকের ওপর অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, ত্বককে নরম এবং কোমল রাখে। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ক্রিম, ভিটামিন ক্রিম এবং হরমোন ক্রিম। এসব ক্রিমের উপাদানের মধ্যে থাকে মোম এবং কডলিভার অয়েল।

ভ্যানিশিং ক্রিম

ত্বকের উপর ঘষলে এ ক্রিম আপাতত অদৃশ্য হয়ে যায়। এতে ত্বকের উপর শূকনো কিছু আঠাল প্রলেপ সৃষ্টি করে, ফলে ত্বকে শূকনো অনুভূতি হয়। গরমের দিনে এর ব্যবহার আরামপ্রদ। তৈলাক্ত চামড়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী এ ক্রিম ত্বকের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো রক্ষা করে। ভ্যানিশিং ক্রিমের মূল উপাদান পানি, গ্লিসারিন, স্টিয়ারিক এসিড, মোম এবং বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য। ভ্যানিশিং ক্রিমে সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কিছু কিছু দ্রব্য। যেমন—ইনডোল, ভ্যানিলিন, এনজিল ইত্যাদি ক্রিমের শ্বেত বর্ণ নষ্ট করে। তাই ক্রিমে এগুলো পরিহার করে জেরানিয়াম, বোইস ডি রোজ, স্যাভাল উড, প্যাচুলী, লং লং, ল্যাভেন্ডার, তারপিনল, লিনোলল, পলিইথাইল এলকোহল ব্যবহার করা হয়। নিচে ভ্যানিশিং ক্রিম তৈরির একটি সহজ ফরমুলা উল্লেখ করা হল—

স্টিয়ারিক এসিড	২০ ভাগ
পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড	১.৪ ভাগ
গ্লিসারিন	৪ ভাগ
পানি	৭৪.৬ ভাগ

প্রস্তুত পদ্ধতি : ক এর উপাদান এবং খ এর উপাদানগুলোকে দুটি পাত্রে আলাদা আলাদাভাবে ৭৫ থেকে ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে। ক এর মধ্যে খ কে ধীরে ধীরে ঢেলে নাড়তে হবে। এরপর, তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এলে ০.৫% গন্ধ দ্রব্য মেশাতে হবে। এ পর্যায়ে পচন নিবারক (Preservan) হিসেবে ০.০২% প্রপাইল প্যারা হাইড্রক্সি বেনজয়েট এবং ০.১৫% মিথাইল প্যারা হাইড্রক্সি বেনজয়েট মেশানো যায়। এরপর একে কৌটা বা টিউবে (যান্ত্রিক উপায়ে) পুরে ব্যবহার বা বাজারজাত করা হয়।

কোল্ড ক্রিম

কোল্ড ক্রিম শীতকালে ব্যবহৃত হয়। এটি ত্বককে কোমল ও মসৃণ রাখে।

কোল্ড ক্রিম প্রস্তুতের ফরমুলা

ক. মিনারাল অয়েল	২ পাইন্ট (=০.২৫ গ্যালন)
প্যারাকল	২ আউন্স
হোয়াইট বি ওয়াস্ক	৭ আউন্স
খ. পানি	১ পাইন্ট
বোরাক্স	৫ আউন্স

প্রস্তুত পদ্ধতি : ভ্যানিশিং ক্রিম প্রস্তুতির অনুরূপ।

ম্নো

ম্নো একটি প্রলেপন জাতীয় আর্দ্র ক্রিম। নিচে ম্নো প্রস্তুতের একটি ফরমুলা দেওয়া হল :

ম্নো প্রস্তুতের ফরমুলা

ক. সয়াবিন অয়েল	৭.৫ ভাগ
এসিটাইল এলকোহল	২ ভাগ
আইসো প্রোপাইল লিনোলেট	১ ভাগ

পলিইথাইলিন গ্লাইকোল	১২.৫ ভাগ
গ্লিসারিন মনোস্টিয়ারেট	৭.৫ ভাগ
খ. পানি	৬১.৩ ভাগ
সোডিয়াম মিথাইল সালফেট	১.২ ভাগ
গ্লিসারিন	৮ ভাগ

প্রস্তুত পদ্ধতি : ভ্যানিশিং ক্রিম তৈরির অনুরূপ।

চুলের যত্ন : চুল আমাদের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গা মস্তিষ্ক, এর আবরণ করোটি বা খুলি। আর এ করোটির আচ্ছাদন হল চুল। চুল মাথাকে তাপ ও শৈত্যের হাত থেকে রক্ষা করে, ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে এবং দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। চুল অপরিষ্কার থাকলে মাথার খুলিতে খোসা পঁচড়া, খুশকি, ঘা, বিভিন্ন চর্ম রোগ হতে পারে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই চুলের যত্ন নেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। চুলের যত্নের জন্য আমরা সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করি। সাবান চুলের উপর একটি পাতলা পর্দা তৈরি করে। এর মধ্যে স্কার পদার্থ বেশি থাকে তাই একে প্রসাধনী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

চুলের জন্য ব্যবহৃত প্রসাধনীসমূহ হল : বিভিন্ন ধরনের কেশ তেল, হেয়ার টনিক, হেয়ার লোশান, সাবানবিহীন শ্যাম্পু, পমেড ইত্যাদি। শ্যাম্পু মূলত সুগন্ধী ডিটারজেন্ট। এতে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং স্বাস্থ্য সুন্দর হয়। এ ছাড়া রেজিন ভিত্তিক স্প্রে, পমেড; এলকোহল ভিত্তিক লোশানসমূহ এবং হেয়ার কন্ডিশনার চুলের ক্ষয়রোধ করে, চুল পাকা বন্ধ করে ও চুলের খুশকি দূর করে। কোনো কোনো রাসায়নিক পদার্থ চুলকে কঁকড়া করে। এদের বলে হেয়ার ওয়েভ প্রিপারেশন। আবার কঁকড়ানো চুলকে সোজা করার জন্যও ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ।

এছাড়া চুলকে রং করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের হেয়ার ডাই বা কলপ। এক সময় এসব কলপ স্বাস্থ্যের জন্য এমনকি চুলের জন্যও ক্ষতিকর ছিল। এখন অনেক ধরনের উন্নতমানের হেয়ার ডাই আবিষ্কৃত হয়েছে যা ক্ষতিকারক নয়, বরং চুলের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে।

কেশ তেল

চুলের যত্নের জন্য আমরা সবচাইতে বেশি ব্যবহার করি নারকেল তেল, এবং কেশ তেল। কেশ তেলের প্রধান উপাদান নারকেল তেল এবং ক্যাস্টর অয়েল, এর সঙ্গে থাকে সামান্য পারফিউম এবং রং।

সুগন্ধি কেশ তেল তৈরির দুটি সহজ ফরমুলা নিচে দেওয়া হল—

১। বিটা নেপথল	১ আউন্স
ক্যাস্টর অয়েল	১০ আউন্স
এলকোহল	১ গ্যালন
গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক	প্রয়োজনমত
২। ডাই গ্লাইকোল লরেট	৫০ সিসি
ক্যাম্ফোরাইডিন	১ গ্রাম
গ্লিসারিন	১৫০ গ্রাম
এলকোহল	৮০০ সিসি
গন্ধদ্রব্য ও রঞ্জক	প্রয়োজনমত

নিচের উপাদানগুলো প্রদত্ত অনুপাতে মিশিয়ে কেশ তেল এবং হেয়ার টনিকের জন্য উত্তম গন্ধদ্রব্য তৈরি করা যায় :

জেসমিন (যুঁই) গন্ধ

বেনজাইল এসিটেট	৪০০
এমাইল সিনামালডিহাইড	১৫০
তারপিনল	১৫০
সিডার উড	১৫০
স্টিরাক্স	১০০
মাস্ক জাইলেন	৫০
	<hr/>
	১০০০

গোলাপ গন্ধ

রোডিনল	৫০০
সাইট্রোনিলল	২০০
লিনালল	১৫০
জার্নাইল ফরমেট	৩০
প্যাচুলী তেল	২০
ফিনাইল ইথাইল এলকোহল	১০০
	<hr/>
	১০০০

প্রস্তুত পদ্ধতি : গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক ভিন্ন অন্যান্য উপাদানগুলো একটি পাত্রে নিয়ে প্রথমে উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। অতঃপর এ মিশ্রণের সাথে গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক পদার্থ দিয়ে পুনরায় উত্তমরূপে মিশাতে হবে।

মুখের যত্ন : মুখ আমাদের খাদ্য গ্রহণের পথ। খাবারের কণা, মুখ নিঃসৃত লালা, দাঁতের বিভিন্ন ক্ষত থেকে উৎপন্ন বর্জ্য ও ময়লা মুখের অভ্যন্তরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। এতে পেটের পীড়া, দাঁতের ক্ষয়, অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটতে পারে। তাই মুখ গহ্বর এবং দাঁতের যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখের ও দাঁতের যত্নের জন্য আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন প্রকার মাজন, টুথ পাউডার ও পেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ।

টুথ পাউডার

দাঁত মাজার জন্য ব্যবহার করা হয় টুথ পাউডার। টুথ পাউডার দু ধরনের। কালো রঙের টুথ পাউডার এবং সাদা রঙের টুথ পাউডার। কালো পাউডারের প্রধান উপাদান হল কাঠ কয়লা। এছাড়া থাকে ফিটকিরি, কর্পূর, ট্যানিক এসিড, ইউক্যালিপটাস অয়েল, মেনথল অয়েল এবং গ্লিসারিন। সাদা পাউডারের প্রধান উপাদান চক পাউডার। এছাড়া থাকে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম পারবোরেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, সোপ পাউডার, সুগার, মিথাইল সেলিসাইলেট, মেনথল, ক্রোভ অয়েল ও পিপারমেন্ট অয়েল। গ্লিসারিন পাউডারকে মিষ্টি স্বাদ এবং ঐটেল করে।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রধান উপাদান কাঠ কয়লার গুড়া অথবা চক পাউডারকে মিহি পাউডারে পরিণত করার জন্য পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়ে ভালোভাবে চেলে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে কয়লার গুড়া অথবা চক পাউডারের সঙ্গে অন্যান্য উপাদানগুলো মিশিয়ে একটি চামচ বা কাঠি দিয়ে উত্তমরূপে নাড়তে হবে। এরপর কর্পূর এলকোহলে দ্রবীভূত করে

কয়লার গুঁড়ার সাথে মেশাতে হবে। একইভাবে ট্যানিক এসিড, ইউক্যালিপটাস অয়েল, মেনথল অয়েল মেশাতে হবে। এ মিশ্রণে ফিটকিরি মেশাতে হলে ফিটকিরিকে উত্তপ্ত করে নিতে হবে। সবশেষে গন্ধদ্রব্য মেশাতে হবে।

টুথ পাউডার তৈরির একটি ফরমুলা

চক পাউডার	৭৪ ভাগ
সোডিয়াম বাইকার্বনেট	২ ভাগ
ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১৫ ভাগ
সাদা পাউডার ক্যাসটাইন সোপ	৬.৫ ভাগ
স্যাকারিন	০.৩ ভাগ
গন্ধ দ্রব্য	২.২ ভাগ

নিচের উপাদানগুলো প্রদত্ত অনুপাতে মিশিয়ে টুথ পাউডারের জন্য উত্তম গন্ধদ্রব্য তৈরি করা যায়।

মেনথল	৬ ভাগ
থাইমল	৬ ভাগ
ক্যাম্ফর (কর্পূর)	১৯ ভাগ

এছাড়া পিপারমেন্ট অয়েল, ক্লোভ অয়েল (লবঙ্গ তেল), ইউক্যালিপটাস তেল, মিথাইল সেলিসাইলেট, স্যাফরোল ইত্যাদিও বিভিন্ন স্বাদের জন্য টুথ পাউডারে মিশান যেতে পারে।

টুথ পেস্ট

টুথ পেস্ট তৈরির একটি ফরমুলা

ট্রাই এবং ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১০.২ ভাগ
চক পাউডার	৩০.০ ভাগ
গ্লিসারিন	১৫.০ ভাগ
গাম ট্রাগাকান্থ মিউসিলেজ	৫.৫ ভাগ
সোডিয়াম লরেল সালফেট	২.০ ভাগ
তরল প্যারারফিন	১.০ ভাগ
পিপারমেন্ট অয়েল	১.০ ভাগ
সোডিয়াম স্যাকারিন	০.১ ভাগ
সোডিয়াম বেনজিনেট	০.১ ভাগ
মেনথল	০.১ ভাগ
পাতিত পানি	৩৫.০ ভাগ

পদ্ধতি : একটি পাত্রে ১ : ৪ অনুপাতে গ্লিসারিন এবং পানি মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করা হয়। মিশ্রণটি ফুটতে থাকলে তাপ দেয়া বন্ধ করা হয় এবং এর মধ্যে অল্প অল্প করে সোডিয়াম স্যাকারিন ও গাম ট্রাগাকান্থ মিউসিলেজ মিশিয়ে নাড়ানো হয়। এরপর একে ২৪ ঘণ্টা ঠান্ডা করে মসলিন কাপড়ে চেলে নেয়া হয়। একটি আলাদা পাত্রে চক পাউডার এবং ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেটকে উত্তমরূপে মিশিয়ে আলাদা করে রাখা হয়।

স্যাকারিন, পানি, গ্লিসারিন মিউসিলেজ মিশ্রণকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে এর মধ্যে দ্বিতীয় পাত্রের চক পাউডার ও ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেটের মিশ্রণকে ঢেলে নাড়ানো হয় এবং তাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা হয়। মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হলে এতে ধীরে ধীরে আরও পানি মেশানো হয় এবং ঠান্ডা করা হয়। এ অবস্থায় মেনথল এবং পিপারমেন্ট অয়েল মেশানো হয় এবং পর্যাপ্ত ঠান্ডা হওয়ার জন্য নাড়ানো অব্যাহত রাখা হয়। অতঃপর দুদিন রেখে দেয়া হয়। এভাবে তৈরি হয় টুথ পেস্ট।

টুথ পেস্ট এবং টুথ পাউডার আমাদের নিত্য ব্যবহার্য প্রসাধনী। প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে, শূতে যাবার আগে এবং খাবার পর নরম ব্রাশ অথবা হাতের আঙ্গুলে পরিমাণ মতো টুথ পেস্ট অথবা টুথ পাউডার লাগিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুতে হবে। এতে দাঁত ও মাড়ি সুস্থ এবং মুখ দুর্গন্ধ ও জীবাণুমুক্ত থাকবে। স্বাস্থ্য ও মন সুস্থ থাকবে।

এন্টিসেপটিক সামগ্রী

সজীব কোষ কলার ওপর জীবাণুর জন্ম-বৃদ্ধি রোধক পদার্থের নাম এন্টিসেপটিক সামগ্রী। ত্বক এবং শৈল্পিক ঝিল্লির উপর প্রয়োগ করা হলে এন্টিসেপটিক সংক্রমণ রোধ করে। এসব বস্তু জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো শক্তিশালী এবং দেহকোষের জন্য ক্ষিপ্ত নমনীয় ও সহনীয় হতে হবে।

এন্টিসেপটিক এবং এন্টিবায়োটিক এক নয়। এন্টিসেপটিক হল প্রতিরোধক, রাসায়নিক পদার্থ থেকে তৈরি। এন্টিবায়োটিক জীবন্ত অণুজীব থেকে উৎপাদিত জীবাণু প্রতিষেধক। সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর এন্টিবায়োটিক জীবাণু ধ্বংস করে রোগ মুক্ত করে।

সার্জনরা অস্ত্র চিকিৎসার আগে তাদের হাত, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং রোগীর ত্বক পরিষ্কার করার জন্য এন্টিসেপটিক ব্যবহার করেন। মারাত্মক ক্ষতে যাতে সংক্রমণ না ঘটে সে জন্য ডাক্তার তাতে এন্টিসেপটিক স্প্রে করেন। কেটে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট এইড হিসেবে এন্টিসেপটিক ব্যবহৃত হয়।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের এন্টিসেপটিক পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে ক্রিম, মাউথ ওয়াশ, অয়েন্টমেন্ট, পাউডার, তরল স্প্রে। তাছাড়া শ্যাম্পু, সাবান ইত্যাদির মধ্যেও ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন এন্টিসেপটিক পদার্থ। জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযোগী এসব রাসায়নিক পদার্থ হল : এলকোহল, আয়োডিন ও পারদ জাত যৌগসমূহ, ফেনল, গন্ধকজাত যৌগ ইত্যাদি। আমাদের দেশে বাজারে প্রচলিত এবং বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি এন্টিসেপটিক হল স্যাভলন, ডেটল, এম এন্ড বি এন্টিসেপটিক ক্রিম, ওরাল মাউথ ওয়াশ, ফিটকিরি ইত্যাদি।

স্যাভলন

বাজারে তরল এবং ক্রিম দুই ধরনের স্যাভলন পাওয়া যায়। স্যাভলনের প্রধান উপাদান হল ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট ও সেন্টিমাইড। কাটা, ছেঁড়া, ফোড়া, কীট দংশনের স্থানে স্যাভলন ক্রিম হালকাভাবে মালিশ করে বা প্রলেপ লাগিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি উপশম হয় এবং সংক্রমণ রোধ হয়। ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত এভাবে দিনে কয়েক বার ক্রিম ব্যবহার করতে হয়। তরল স্যাভলনের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। স্যাভলনের সাথে পানি মিশিয়ে তুলো বা নরম কাপড় ভিজিয়ে কাটা, ছেঁড়া, কীটদ্রব্য স্থানে লাগাতে হয়। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। যেমন-গোসল, গৃহস্থালি ধোয়া মোছার কাজে প্রসূতি ও রোগীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, ঘরের মেঝে, গোসলখানা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন অনুপাতে পানির সঙ্গে স্যাভলন মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ডেটল

বাজারে তরল ডেটল পাওয়া যায়। ডেটলের প্রধান উপাদান ট্রাইক্লোরোফেনল। স্যাভলনের মতো ডেটলও পানির সঙ্গে মিশিয়ে কাটা, ছেঁড়া, কীটদ্রষ্ট স্থানে লাগাতে হয়। এছাড়া গৃহস্থালি ধোয়া মোছার কাজে, প্রসূতি ও রোগীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, ঘরের মেঝে, গোসলখানা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ডেটল ব্যবহার করা হয়। ডেটল এবং স্যাভলন নির্জলা অর্থাৎ পানি না মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ফিটকিরি

ফিটকিরি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট ও ২৪ অণু পানির যৌগ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে জীবাণুনাশক হিসেবে ফিটকিরি ব্যবহার প্রচলিত। কোথাও কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে, সেখানে পানিতে ভিজান ফিটকিরি ঘষে দেয়া হয়। অথবা ফিটকিরি পানিতে দ্রবীভূত করে তা ক্ষতস্থানে লাগানো হয়। পানীয় পানিকে বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য এর মধ্যে পরিমাণ মতো ফিটকিরি দিয়ে রাখা হয়। ফিটকিরি গলে গলে পানি হেঁকে নেওয়া হয়। দাড়ি কাটার পর অনেকে আফটার শেভ লোশনের পরিবর্তে ফিটকিরি ব্যবহার করেন। ফিটকিরি রক্তক্ষরণও বন্ধ করে।

অতিরিক্ত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের অসুবিধা : প্রসাধনী সামগ্রী মূলত বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ। পরিমাণ মতো ব্যবহারে এসব উপাদান আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখে, দেহের কোষ কলাকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করে, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু অধিক পরিমাণে প্রসাধনীর ব্যবহার দেহকোষে প্রদাহ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন চর্মরোগ জন্ম দিতে পারে। চামড়া পুড়ে মুখমন্ডলের রং নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। চুলের প্রসাধনীর অতিরিক্ত ব্যবহারে চুল পড়ে যাওয়া, মাথার খুলিতে ঘা হওয়া, এমনকি তাড়াতাড়ি চুল পেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অতিরিক্ত টুথ পেস্ট ব্যবহারে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়, মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। প্রসাধনীর উগ্রগন্ধ অন্যের জন্য অসহনীয় হতে পারে। অনেক সময় উগ্রগন্ধের প্রসাধনী ব্যবহারকারীদের স্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে কখনই যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার না করি।

প্রসাধনীর মতো এন্টিসেপটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যিক। এন্টিসেপটিকের জীবাণুনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের কিছু মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। অতিরিক্ত এন্টিসেপটিক ব্যবহারের ফলে দেহের কোষ তন্তুর ক্ষতি হতে পারে, ত্বকে ফুসকুড়ি এবং এলার্জি হতে পারে এমনকি ত্বক পুড়ে পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের এবং দেহের কোমল অংশে প্রসাধনী ও এন্টিসেপটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনই অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। এন্টিসেপটিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসব পদার্থ ব্যবহারের জন্য যে নির্দেশিকা বোতলের গায়ে লিখে দেয় তা মেনে চললে অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করলে বিপদমুক্ত থাকা যায়।

বিঃ দ্রঃ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী প্রস্তুতের একাধিক ফরমুলাসহ প্রস্তুত পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবুও এসব ফরমুলা ব্যবহার করে প্রস্তুত সামগ্রী ব্যবহারে কারও কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য লেখক দায়ী হবেন না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সুগন্ধি কেশ তেল তৈরির জন্য ১ গ্যালন এলকোহলের সাথে কী পরিমাণ বিটা নেপথল মিশাতে হয়?

- ক. ১ আউন্স
- খ. ৩ আউন্স
- গ. ৫ আউন্স
- ঘ. ১০ আউন্স।

২। নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

- ক. খর পানিতে উৎপন্ন সাবানের তলানী ময়লা পরিষ্কার করে।
- খ. এন্টিবায়োটিক অণুজীব হতে উৎপন্ন জীবাণু প্রতিষেধক।
- গ. এন্টিসেপটিকের যথেষ্ট ব্যবহার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- ঘ. বেবি পাউডারে সাইটোনিল এবং সয়াবিন তেল থাকে।

৩। শ্যাম্পু মূলত কী?

- ক. এক প্রকার সাবান
- খ. হেয়ার কন্ডিশনার
- গ. সুগন্ধি ডিটারজেন্ট
- ঘ. হেয়ার ওয়েভ প্রিপারেশন।

৪। নিচের বিবৃতিগুলোর ক্ষেত্রে হেয়ার কন্ডিশনার—

- (i). চুল পড়া, চুল পাকা বন্ধ করে এবং খুশকি দূর করে।
- (ii). চুলের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে।
- (iii). কৌঁকড়ানো চুলকে সোজা করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. ii ও iii

নিচের ছকের সাহায্যে ৫ নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপাদান	শতকরা হার
স্টিয়ারিক এসিড	২০ ভাগ
পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড	১.৪ ভাগ
গ্লিসারিন	৪ ভাগ
পানি	৭৪.৬ ভাগ

৫। উপরের ফরমুলাটি কী তৈরির উপাদান?

ক. কোল্ড ক্রিম

খ. ভ্যানিলা ক্রিম

গ. স্নো

ঘ. কেশ তেল।

৬। যদি উক্ত বস্তুর সাথে ইনডোল মিশানো হয় তাহলে কী ঘটে?

ক. লাল বর্ণ নষ্ট করে।

খ. হলুদ বর্ণ নষ্ট করে।

গ. শ্বেত বর্ণ নষ্ট করে।

ঘ. নীল বর্ণ নষ্ট করে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গৃহবধূ রহিমা বেগম রূপচর্চা করতে পছন্দ করেন। তিনি প্রত্যহ একাধিকবার ক্রিম, পাউডার, লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করেন। রহিমা বেগম একদিন লক্ষ করলেন তার কিছু চুল পড়ে যাচ্ছে এমনকি ত্বকের কিছু স্থানে ফোসকা পড়েছে। তিনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার রহিমা বেগমকে অতিরিক্ত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের সতর্ক করে দেন।

ক. একটি উদ্ভিজ্জ প্রসাধনীর নাম লিখ।

খ. ক্রিম তৈরির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

গ. রহিমা বেগমের চুল পড়া ও পেকে যাবার কারণ বর্ণনা কর।

ঘ. ডাক্তার রহিমা বেগমকে অতিরিক্ত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারে কেন সতর্ক করেন, যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তত্ত্ব ও বস্ত্র

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি হল বস্ত্র। বস্ত্র বা কাপড় তৈরির জন্য দরকার সুতা। সুতার উপাদান হল তত্ত্ব। তত্ত্ব মূলত আঁশ জাতীয় বস্তু। সাধারণ অর্থে যে কোনো আঁশকেই তত্ত্ব বলে। কিন্তু বয়ন শিল্পে যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন ও বুননের কাজ সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়ন তত্ত্ব বা সংক্ষেপে তত্ত্ব বলে। তত্ত্ব থেকে সুতা হয়। সুতা দিয়ে কাপড় হয়। এ ছাড়া কার্পেট, বিভিন্ন ধরনের বুনন, ফিস্টার, তড়িৎ নিরোধক ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজেও তত্ত্বের ব্যবহার ব্যাপক।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কার্পাস সুতা, রেশম, পশম ও লিনেন। এগুলো প্রকৃতি থেকে সহজেই আহরণ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মানুষ উদ্ভাবন করেছে রাসায়নিক তত্ত্ব-পলিথিন, নাইলন, পলিএস্টার ইত্যাদি। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হয়েছে আরও বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম বা সিনথেটিক তত্ত্ব। এর পরেও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গবেষক প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম খরচে উন্নতমানের তত্ত্ব ও সুতা তৈরির জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তত্ত্বের প্রকারভেদ

উৎস হিসেবে তত্ত্বকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও কৃত্রিম তত্ত্ব। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং খনিজ উৎস হতে প্রাপ্ত তত্ত্বসমূহকে বলা হয় প্রাকৃতিক তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন সেগুলোকে বলে কৃত্রিম তত্ত্ব।

প্রাকৃতিক তত্ত্ব

প্রাকৃতিক তত্ত্ব হল তুলা বা কটন, পাট, লিনেন, উল, সিল্ক ও অ্যাসবেস্টস। প্রাকৃতিক তত্ত্বসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদ্ভিদ তত্ত্ব, প্রাণিজ তত্ত্ব এবং খনিজ তত্ত্ব। এ তত্ত্বসমূহ থেকেই বিশ্বের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির অর্ধেকের বেশি চাহিদা মেটান হয়।

উদ্ভিদ তত্ত্ব

উদ্ভিদ ও গাছ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তাকে উদ্ভিদ তত্ত্ব বলে। এ জাতীয় তত্ত্বের মধ্যে কার্পাস তুলা বা কটন সব চাইতে অধিক পরিচিত। কার্পাস নামের গাছের ফল থেকে এ আঁশ সংগ্রহ করা হয়। আঁশগুলো থাকে ফলের মধ্যে বীজের চারদিকে। এ জন্য এ তত্ত্বের আরেক নাম বীজ তত্ত্ব। কার্পাস চাড়াও অতি পরিচিত বীজ তত্ত্ব হল শিমুল বা ক্যাপক।

উদ্ভিদের ছাল বা বাকল থেকে যে তত্ত্ব পাওয়া যায় তাদের নাম বৃক্ষকোষ তত্ত্ব। এ ধরনের তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাট। পাট গাছের ছাল থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয়। পাটের পরেই উল্লেখযোগ্য বৃক্ষকোষ তত্ত্ব লিনেন। তিসি বা মসিনা নামে পরিচিত আমাদের দেশের তেল বীজ উদ্ভিদের সাধারণ নাম ফ্লাক্স। ফ্লাক্স জাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে উৎপন্ন হয় লিনেন তত্ত্ব। বৃক্ষকোষ তত্ত্বের আরও উদাহরণ হচ্ছে শণ, র‍্যামি, মেস্তা ইত্যাদি। এসব দিয়ে দড়ি, চট, ছালা, বস্তা ইত্যাদি তৈরি হয়।

গাছের পাতা, মূল বা ডাঁটা থেকেও আঁশ উৎপাদন হয়। যেমন—ম্যানিলা, সিসল, আনারস ইত্যাদি। এগুলোকে বলে ভাসকুলার তন্তু।

প্রাণিজ তন্তু

এ তন্তু দু ধরনের— পশম বা উল এবং রেশম। পশম বা উল তৈরি হয় খরগোশ, উট বা বিভিন্ন প্রজাতির ভেড়া জাতীয় পশুর লোম বা চুল থেকে। উলের তন্তুর তল অমসৃণ। ফলে এর মধ্যে বাতাস আটকে থাকে, তাই উলের তৈরি পোশাক পরলে বেশ গরম অনুভূত হয়।

রেশম বা পলু পোকা নামে এক প্রজাতির পোকাকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তন্তু আহরণ করা হয়। এ তন্তুর নাম রেশম বা সিল্ক। সিল্ক প্রাকৃতিক আঁশের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত।

খনিজ তন্তু

খনি গর্ভে কঠিন শিলামাটির তলদেশে স্তরে স্তরে বা ভাঁজে ভাঁজে জমা হয় এক প্রকার আঁশ। এদের বলা হয় অ্যাসবেস্টস। অ্যাসবেস্টস শব্দ, উচ্চ তাপ ও বিদ্যুৎরোধক। ইনসুলেশন, অগ্নিরোধক, শব্দরোধক, ইত্যাদি তৈরিতে এ তন্তু ব্যবহার করা হয়। তবে এ তন্তু দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

কৃত্রিম তন্তু

যে সব তন্তু সরাসরি প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে গবেষণাগারে উৎপাদিত হয় সেগুলো হল কৃত্রিম তন্তু। বেশিরভাগ কৃত্রিম তন্তু হল প্লাস্টিক শ্রেণীর। প্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা করতে যেয়েই রসায়নবিদরা রাসায়নিক পদার্থ থেকে তন্তু তৈরির উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এ তন্তু বস্ত্র বয়নের গুণাগুণ সম্পন্ন। সাধারণত মেশিনের সাহায্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি গলিয়ে বিভিন্ন তরলে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর অন্য মেশিনের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চাকতির মধ্য দিয়ে ঐ তরলকে প্রচণ্ড চাপে ঠেলে দেয়া হয়। এভাবে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আঁশের আকারে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থ জমাট বেঁধে শক্ত হয় এবং তন্তু বা সুতায় পরিণত হয়।

এ ধরনের সুতা বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন গুণের হয়। এদের প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সেলুলোজিক তন্তু, এবং অসেলুলোজিক বা নন-সেলুলোজিক তন্তু।

সেলুলোজিক তন্তু

সেলুলোজ হল অতি সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ যা দ্বারা উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ কোষ গঠিত। সেলুলোজকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় সেলুলোজিক তন্তু। একে রিজেনারেটেড তন্তুও বলা হয়। ছোট আঁশের তুলা, বাঁশ, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি থেকে সেলুলোজ তন্তু উৎপাদন করা হয়। রেয়ন একটি সেলুলোজিক তন্তু। এটি প্রথম উৎপাদিত কৃত্রিম তন্তু। সেলুলোজকে এসিটিক এসিড দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করলে সেলুলোজ এসিটেট উৎপন্ন হয়। রেয়ন এবং এসিটেট বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। রেয়ন, গাড়ির টায়ার প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ভিসকোস রেয়ন, কিউপ্রাঅ্যামোনিয়াম রেয়ন, এসিটেট রেয়ন ইত্যাদি সেলুলোজিক তন্তু।

নন সেলুলোজিক তন্তু

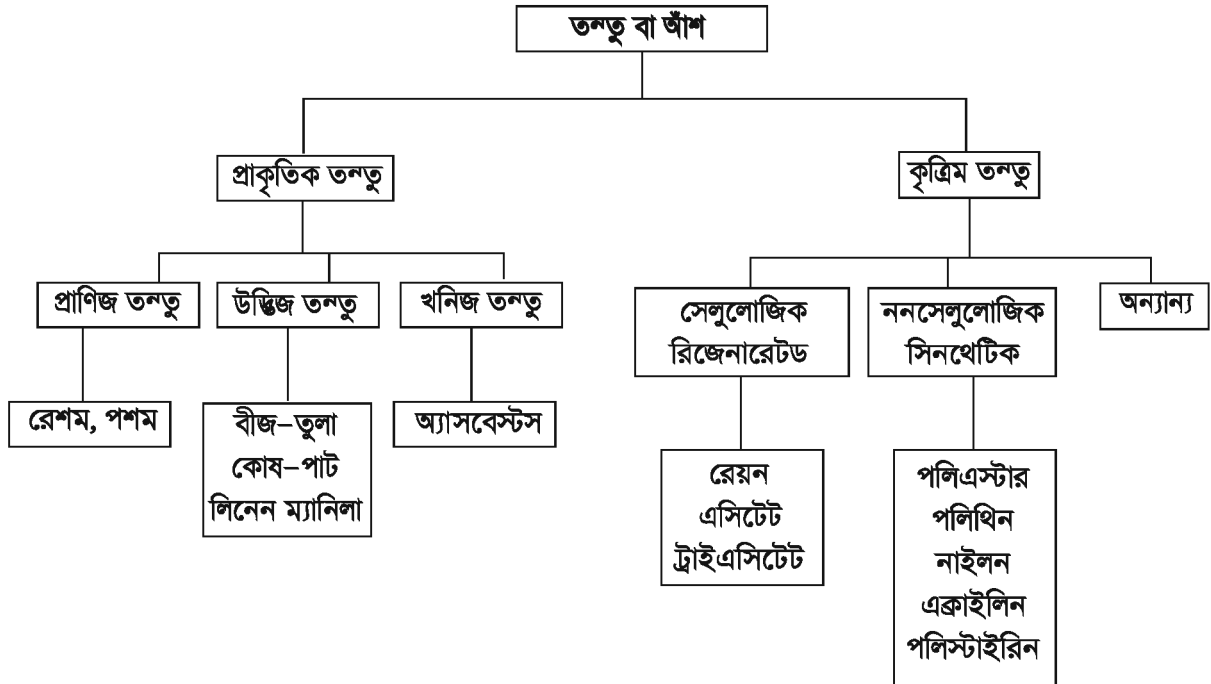
প্রাকৃতিক সেলুলোজ নয়। যেমন—কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এমন পদার্থ তৈরি করেছেন যার মধ্যে তন্তু গুণ বিদ্যমান। এগুলো হল নন সেলুলোজিক বা সিনথেটিক তন্তু। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইলন, পলিএস্টার, এক্রাইলিক, এরামিড, স্পানডেক্স, পলিপ্রপাইলিন ইত্যাদি।

প্রথম উদ্ভাবিত সিনথেটিক তন্তু হচ্ছে নাইলন। এটি হালকা ও শক্ত। কার্পেট, দড়ি, টায়ার ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। পলিএস্টার তন্তু দীর্ঘস্থায়ী। মোচড়ালে বা দোমড়ালে দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, শক্ত সিট, বালিশ ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া প্লাস্টিক তন্তু ফিল্টার, নৌকার পাল এবং অন্যান্য অনেক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এক্রাইলিক তন্তু নরম ও দীর্ঘস্থায়ী। এক্রাইলিক সুতা উলের সদৃশ। তাই এ থেকে কৃত্রিম উল বা পশম তৈরি হয়। একাধিক সেলুলোজিক এবং নন সেলুলোজিক তন্তু মিলিয়ে অধিক ব্যবহার গুণসম্পন্ন এ ধরনের নিত্যনতুন কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবিত হচ্ছে।

এ দুই প্রধান শ্রেণী ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকার কৃত্রিম তন্তু হল—

১। **ধাতব তন্তু** : যে কোনো নরম ধাতু। যেমন— সোনা, রূপা, তামা বা এদের সংকর ধাতুকে যান্ত্রিক উপায়ে টেনে অত্যন্ত মিহি তার বা সুতা তৈরি করা হয়। আবার বিভিন্ন ধাতব পদার্থ কখনও প্লাস্টিক দিয়ে বা অন্য কোনো মিশ্রিত ধাতব পদার্থ দিয়ে, কখনও প্লাস্টিক ধাতব পদার্থের সথর্মিশ্রণে আবারও কখনও একক কোনো পদার্থ দিয়ে আবৃত করে সুতা বা তন্তু তৈরি করা হয়। এ ধাতব তন্তুসমূহ সাধারণত ডেকোরেটিভ বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন— জরি, মাইলার, ড্রবাসট্রোন, রেমেট ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্তসার নিচের ছকে দেখান হল :



তন্তু থেকে সুতা তৈরি

বস্ত্র বয়নের জন্য প্রয়োজন সুতা। তন্তু থেকে সুতা তৈরি করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুতা তৈরিও হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সব ধরনের তন্তু থেকে সুতা তৈরির কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হল আঁশ বা তন্তু সংগ্রহ।

তন্তু সংগ্রহ

ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতি বিভিন্ন। যেমন— কটন বা তুলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাঠ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহের পর বীজ থেকে তুলা পৃথক করা হয়। বীজ থেকে তুলা পৃথকীকরণকে বলে জিনিং। জিনিং এর জন্য বিভিন্ন

পদ্ধতি প্রচলিত। জিনিং এর মাধ্যমে বীজ থেকে তুলা পৃথিকীকরণের পর প্রাথমিকভাবে যে তন্তু পাওয়া যায় তার নাম কটন লিট। এটাই সুতা তৈরির মৌলিক উপাদান। বেশ কিছু পরিমাণ কটন লিট নিয়ে গাঁইট বা বেল বাঁধা হয়। সুতা কাটার জন্য এ বেলগুলো আনা হয় স্পিনিং কারখানায়।

পাট, শণ, তিসি ইত্যাদি থেকে আঁশ সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণত পরিণত অবস্থায় এ সব উদ্ভিদ কেটে কয়েক দিনের জন্য পানিতে ডুবিয়ে পচান হয়। তারপর আঁশ ছাড়ান হয়। এ আঁশ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে গাঁইট বা বেল বাঁধা হয়। সুতা কাটার জন্য এ বেলগুলো স্পিনিং কারখানায় আনা হয়।

উল বা পশমী সুতার জন্য তন্তু হল প্রাণিজ পশম, লোম অথবা চুল। উলের সুতা তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর গা থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই লোম কেটে নেওয়া হয়। তন্তু সংগ্রহের পরও প্রাণী বেঁচে থাকে এবং পুনরায় লোম গজায়। এভাবে একই পশুর গা থেকে একাধিক বার পশম সংগ্রহ করা যায়। এই সংগৃহীত পশম বা লোমকে বলে ফ্রিজ উল। সুতা কাটার জন্য বস্তা ভর্তি ফ্রিজ উল স্পিনিং কারখানায় আনা হয়।

রেশম এবং কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রে উৎস থেকে সরাসরি সুতা সংগৃহীত বা উৎপাদিত হয়।

সুতা কাটা বা স্পিনিং

স্পিনিং বা সুতা কাটার জন্য গাঁইট বা বেল বাঁধা তুলা, পাট ইত্যাদি তন্তু কারখানায় আনা হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে একই কারখানায় সব ধরনের তন্তু থেকে সুতা কাটা যায় না। বিভিন্ন তন্তু থেকে সুতা কাটার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন তন্তু ও সুতা তৈরির কারখানাও ভিন্ন। বিভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সুতা কাটা হলেও পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে এগুলো নিয়ে সর্থাঙ্কিতভাবে আলোচনা করা হল।

রোভিং এন্ড মিক্সিং

কারখানার বেল ও গাঁইট বাধা কটন লিটকে প্রথমেই নেওয়া হয় রো বুমের। সেখানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তুলাকে পৈজা হয় এবং বিভিন্ন জাতের তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একে বলে রোভিং এন্ড মিক্সিং। কটনের বেলায় যাকে রোভিং বলা হয় পাটের বেলায় সেই প্রক্রিয়ার নাম ব্যাচিং।

কাডিং এন্ড কম্বিং

রোভিং বা ব্যাচিং এবং মিক্সিংকৃত তন্তুকে প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বিতীয় ধাপ আঁচড়ান। বস্ত্র শিল্পে এ আঁচড়ানকে বলে কাডিং এন্ড কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম ইত্যাদি তন্তুকে কাডিং এবং কম্বিং করা হয়। তন্তুর প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্য ভেদে কাডিং-কম্বিংয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য হয়। কাডিং এর মাধ্যমে তন্তু থেকে ধূলাবালি, অন্যান্য ময়লা, অতিরিক্ত ছোট আঁশ দূরীভূত হয়। কোনো কোনো তন্তুর শুধু কাডিং করলেই চলে, কম্বিং এর প্রয়োজন হয় না। মিহি, মসৃণ ও সরু সুতার জন্য কম্বিং প্রয়োজন। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ ধরনের কম্বিং করা হয় একে বলে হেলকিং। এতে সুতা অত্যন্ত মিহি হয়।

স্পিনিং

এভাবে কাডিং এবং কম্বিং করার ফলে তন্তুগুলো পাতলা আস্তরে পরিণত হয়। এ আস্তরকে বলে স্পিনার। এ স্পিনার থেকেই সুতা কাটা হয়। বস্ত্র শিল্পের সুতা কাটার সর্বশেষ ধাপ হল স্পিনার থেকে তন্তু পাকিয়ে সুতায় পরিণত করা। একেই বলে স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্পিনারকে টেনে ক্রমশ অধিকতর সরু করা হয়। এক সময় স্পিনারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গাছা আঁশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্পিনারকে মোচড় বা পাক দেওয়া হয়। স্পিনারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়াকে বলে রোভিং এবং মোচড় বা পাক দেয়ার প্রক্রিয়াকে বলে টুইস্টিং।

শ্রিতারকে মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে সুতায় পরিণত হয়। স্বভাবতই মোচড়ের পরিমাণ যত বেশি হবে সুতা তত শক্ত হবে। আবার অতিরিক্ত মোচড়ে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। মূল তন্তুর দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য গুণাগুণ ভেদে সুতা কাটার সময় মোচড়ের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। লম্বা তন্তু বিশিষ্ট পাট বা লিনেন তুলনামূলকভাবে কম মোচড় দিতে হয়। আবার খাটো মাপের তন্তু কটন, উলেন ইত্যাদিতে তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। সুতা কাটার সময় টুইস্ট কাউন্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুতার মোচড়ের দিক ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

রেশম সুতা

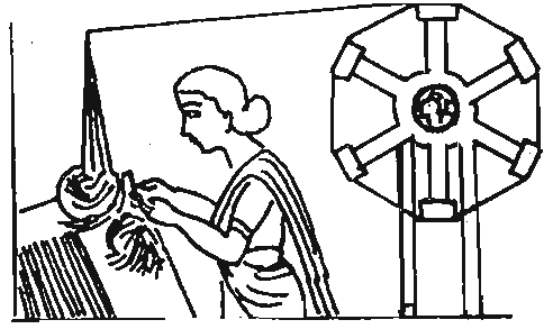
রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় এক ধরনের গুটি বা কোকন। পরিণত কোকন সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করা কোকন বেশ নরম হয় এবং ওপর থেকে একটি খোসা বা পরত উঠে যায়। এতে তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। নালকে সাবধানে টানলে লম্বা ঝাঁশ বা সুতা বেরিয়ে আসে। মিহি সুতার জন্য ৫ থেকে ৭টি কোকনের মাথা বা নাল এবং মোটা বা মাঝারি সুতার জন্য ১৫ থেকে ২০টি নল একত্র করে চরকার সাহায্যে সুতার ফেটি করা হয়। নালগুলো একত্র করলে পরস্পর আঠালভাবে লেগে এক গাছি সুতায় পরিণত হয়।



চিত্র ১৮.১ : রেশম পোকা, কোকন ও কোকন থেকে প্রজাপতি বের হওয়ার দৃশ্য

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা কাটা

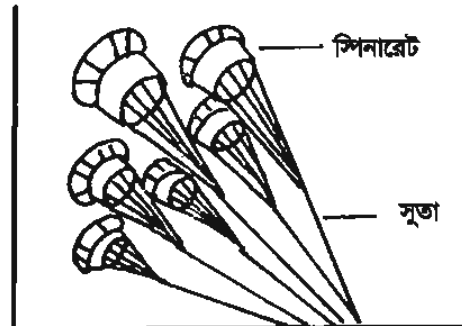
যাবতীয় কৃত্রিম তন্তু মোটামুটি একই নিয়মে প্রস্তুত করা হয়। সুতাও তৈরি হয় একই নিয়মে। একাধিক ক্ষুদ্র ঝাঁশ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়ায় এক ধরনের আঠাল দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর এই আঠাল দ্রবণ থেকে সুতার মতো লম্বা নলি প্রস্তুত করা হয়। এ দ্রবণকে বলে স্পিনিং দ্রবণ। স্পিনিং দ্রবণকে বিশেষ উপায়ে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে প্রবল চাপে ফোয়ারার মতো প্রবাহিত করা হয়। এ ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধানোর জন্য প্রবাহ পথে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত রাখা হয়। এতে ব্যবহার উপযোগী সুতার দীর্ঘ নাল অনায়াসে বের হয়ে আসে। এটি সরাসরি বয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। যে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সুতার নাল বের হয় তাকে বলে স্পিনারেট। চিত্রে একটি স্পিনারেট দেখান হল।



চিত্র ১৮.২ : কোকন থেকে রিলিং করে সুতা উত্তোলন

সুতার কাউন্ট

বয়ন শিল্পে মোটা, মাঝারি, সরু বিভিন্ন ধরনের সুতা ব্যবহার করা হয়। যে সুতার ব্যাস যত বেশি সে সুতা তত মোটা। মোটা সুতার তৈরি কাপড় মোটা এবং ভারী হয়। অন্যদিকে কম ব্যাসের সরু সুতার কাপড় হয় মিহি, মোলায়েম এবং হালকা। সুতা মোটা বা সরু তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সুতার কাউন্ট। কাপড় কিনতে গেলে আমরা শূনি ৮০ সুতার কাপড় বা ৮০ নম্বর সুতার কাপড়। অথবা ১০০ সুতার কাপড়। ৮০ থেকে ১০০ সুতার কাপড় মিহি ও



চিত্র ১৮.৩ : স্পিনারেট থেকে সুতা কাটা

হালকা হয়। সুতার এ নম্বর হিসেব করা হয় সুতার ব্যাসের বিভিন্নতার হিসেবে, একে বলে সুতার কাউন্ট। সুতার কাউন্ট নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি তিনটি হল—

- (১) পরোক্ষ বা ওজন পদ্ধতি,
- (২) প্রত্যক্ষ বা দৈর্ঘ্য পদ্ধতি
- (৩) সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি।

প্রথমোক্ত পদ্ধতি দুটি অনেক পুরাতন কিন্তু এখনও প্রচলিত আছে। এখনও আমাদের দেশে পুরাতন পদ্ধতিতেই সুতার কাউন্ট নির্ণয় করা হয়।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সুতা যত মোটা হয় তার নম্বর বা কাউন্ট তত বেশি। পরোক্ষ পদ্ধতিতে সুতা যত মোটা হয় তার নম্বর বা কাউন্ট তত কম। এতে কাউন্টের বর্ণনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আবার দুই পদ্ধতিতেই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন সুতার দৈর্ঘ্য এবং ওজনের এককের বিভিন্নতার জন্য পরিমাপ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুর জন্য এক এক দেশে এক এক ধরনের হিসাব। ফলে আমদানি রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক কাউন্ট পদ্ধতি প্রচলন হয়েছে। মূলত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পদ্ধতির জটিলতা এড়ানো এবং উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য International Organisation of Standardization (ISO) একটি বিশেষ কাউন্ট পদ্ধতি ঘোষণা করে। এ পদ্ধতির নাম টেক্স। এ পদ্ধতিতে মেট্রিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের সুতার ওজন দ্বারা কাউন্ট নির্ণয় করা হয়। এ জন্য গ্রামকে ওজনের একক এবং কিলোমিটারকে দৈর্ঘ্যের একক ধরা হয়। অর্থাৎ ১০০০ মিটার বা ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুতার ওজন এক গ্রাম হলে ঐ সুতার কাউন্ট হবে ১ টেক্স (Tex)। আবার ১ কিলোমিটার সুতার ওজন ২ গ্রাম হলে কাউন্ট হবে ২ টেক্স বা এ সুতার নম্বর হল ২।

সমস্যা : ৪০০ মিটার সুতার ওজন ৬ গ্রাম হলে কাউন্ট নির্ণয় কর।

সমাধান : সুতার ওজন = ৬ গ্রাম

দৈর্ঘ্য = ৪০০ মিটার = ০.৪ কিলোমিটার

০.৪ কিলোমিটার সুতার ওজন ৬ গ্রাম

$$১ \text{ কিলোমিটার সুতার ওজন} = \frac{৬}{০.৪} = ১৫ \text{ গ্রাম}$$

অতএব, কাউন্ট = ১৫ টেক্স।

টেক্স সকল প্রকার সুতার জন্য সকল বয়ন শিল্পে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে একই অর্থ জ্ঞাপক।

রং

পরিধেয় পোশাক বা বস্ত্রকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করতে হলে যেমন— দরকার বস্ত্রের অন্তর্নিহিত গুণাবলি তেমনি দরকার রং। সুনির্বাচিত রং বস্ত্রের ও পোশাকের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। অনেক সময় বস্ত্র বা তন্তুর নিজস্ব রং থাকলেও পৃথক রং প্রয়োগ করে তন্তুকে নতুনভাবে প্রতিভাত করা যেতে পারে। রঙের মতো ছাপার মাধ্যমেও বস্ত্রকে সুসজ্জিত করা যায়। তবে ছাপা এবং রং প্রয়োগের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। রং প্রয়োগ হচ্ছে বস্ত্র বা তন্তুর সম্পূর্ণ অংশে রং লাগানো। আর ছাপা হচ্ছে কেবল বস্ত্রের একপিঠে এবং নির্বাচিত অংশে রং লাগানো। বিভিন্ন রঙের সাহায্যে তন্তু, সুতা বা বস্ত্র রং লাগানো প্রক্রিয়াকে বলে ডায়িং (Dyeing)।

রঙের শ্রেণী বিভাগ

বস্ত্র শিল্পের প্রথম যুগে অতি অল্প সংখ্যক রং প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আমরা অসংখ্য ধরনের রং দেখতে পাই। রংকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী ভাগ করা যায়। এক ধরনের রং পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়, অন্য প্রকার রং দ্রবীভূত হয় না। দ্রবীভূত রংকে প্রকৃত রং বা ডাই (dye) এবং অদ্রবণীয় রংকে পিগমেন্ট (pigment) বলে। এসব রঙের মধ্যে কিছু প্রকৃতিজাত, কিছু কৃত্রিম।

প্রকৃতিজাত রং

প্রথম যুগে মানুষ প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি থেকে রং আহরণ করত, এখনও কিছু কিছু রং এভাবে আহরিত হয়। গাছের বাকল, ফুল, ফল, মূল, লতাপাতা ইত্যাদি থেকে যে রং আহরিত হয় এদের নাম উদ্ভিজ্জ রং (Vegetable dye)। আমাদের দেশে শেফালি, পলাশ, কুসুম ইত্যাদি ফুল থেকে রং তৈরি করা হয়। আবার জাফরান, হলুদ, চন্দন, তেজপাতা, হরীতকী, মেহেদি, জবাপাতা, রজন মূল ইত্যাদি থেকেও রং আহরণ করা যায়। এক সময় নীল গাছ থেকে প্রাপ্ত নীল রং করার কাজে ব্যবহৃত হত।

উদ্ভিদের মতো প্রাণিজ সূত্র থেকে রং আহরণের পদ্ধতিও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যেমন— রেশম ও পশমের জন্য কোচিনিট্রেপ, লাক্ষা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এদের নাম প্রাণিজ রং (animal dye)। উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎস ছাড়া ধাতব উৎস থেকে যে রং পাওয়া যায় এদের নাম ধাতব রং। যেমন—প্রুশিয়ান নীল, ক্রোম হলুদ ইত্যাদি।

কৃত্রিম রং

গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম হেনরী পারকিন সর্বপ্রথম রং তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এভাবে রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন রংকে বলা হয় কৃত্রিম বা সিনথেটিক রং। বর্তমানে অসংখ্য প্রকারের কৃত্রিম রং উৎপাদন হয়। দেশে দেশে বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি শত রকমের রঙের কারখানা গড়ে উঠেছে। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম রংগুলো ক্রমেই অধিকতর বৈচিত্র্যময় এবং স্থায়ী করে তোলা হচ্ছে।

কৃত্রিম রং আট প্রকার :

- (১) অম্ল জাতীয় (Acid dye)
- (২) ক্ষার জাতীয় (Basic dye)
- (৩) মরড্যান্ট বা আস্তর জাতীয় রং (Mordant dye)
- (৪) প্রত্যক্ষ রং (Direct dye)
- (৫) বিকশিত রং (Developed dye)
- (৬) ন্যাপথল বা অ্যাজোইক রং (Naphthol or Azoic dye)
- (৭) ভ্যাট রং (Vat dye)
- (৮) পিগমেন্ট রং (Pigment dye)

অম্ল রং

অম্ল রং হচ্ছে এসিড থেকে বিভিন্ন ধাতব লবণ। যেমন—সোডিয়াম সালফেট। এর ব্যবহারিক নাম গ্লোবার লবণ। এ রং সহজে পানিতে গলে যায়। এ রং প্রাণিজ তন্তু রেশম, পশম এবং সিনথেটিক তন্তু ওরলিন, এক্সাইলিন নাইলন ইত্যাদিতে

প্রয়োগ করা যায়। এ রংয়ের দাম কম। সুতি কাপড়ে এ রং মোটেই পাকা হয় না। পানিতে ধুলেই রং উঠে যায়। তবে রেশম ও পশমের ক্ষেত্রে এ রং বেশ পাকা। এ রংগুলোকে বাণিজ্যিক রংও বলে।

ক্ষারীয় রং

ক্ষারীয় রং হচ্ছে ক্ষার জাতীয় জৈব পদার্থ থেকে তৈরি রং। এ সব রং আবিষ্কার হয়েছিল এনিলিন নামের যৌগ থেকে তাই একে এনিলিন রংও বলে। এ রং সুতি, লিনেন, রেয়ন, রেশম এবং পশমে প্রয়োগ করা যায়। তবে সাধারণত রেশমে ও পশমে এ রং উজ্জ্বল ও পাকা হয়। প্রাণিজ তন্তু ছাড়া সুতি, লিনেন, এসিটেট বা নাইলন তন্তুতে এ রং প্রয়োগের জন্য একটা আস্তর জাতীয় রং ব্যবহার করতে হয়। এ জাতীয় রং বাজারে পাউডার বা দানা রং হিসেবে পরিচিত।

আস্তর জাতীয় রং

অনেক রং তন্তু বা বস্ত্রে ধরে না। রং করার পর সুতা বা কাপড় পানিতে ধুলেই রং উঠে যায়। এক্ষেত্রে কাপড়ে যাতে রং ধরে সে জন্য প্রয়োজনীয় রং দেওয়ার আগে সুতা বা কাপড় একটি প্রলেপ ধরাতে হয়। প্রলেপটি যদি সুতার গায়ে লেগে থাকে তবে রং করলে সুতার গায়ে রং বসে। এ প্রলেপকে বলে মরড্যান্ট বা আস্তর। মরড্যান্টের সাহায্যে যে সকল রং বস্ত্রে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে বলে মরড্যান্ট বা আস্তর জাতীয় রং। যেমন—ফটিকিরি একটি মরড্যান্ট। রং করার আগে কাপড়কে ফটিকিরির দ্রবণে ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে রং পাকা হয়। এছাড়া ক্রোমিয়াম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের ধাতব লবণ মরড্যান্ট হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যক্ষ রং

যেসব রং প্রয়োগের জন্য মরড্যান্ট ব্যবহার প্রয়োজন হয় না তাদের প্রত্যক্ষ রং বলে। এ রং পশমের জন্য বেশি পাকা এবং রেশমের জন্যও মোটামুটি পাকা হয়। তবে সুতি বস্ত্রে এ রঙের প্রয়োগ বেশি। ধোয়ার ফলে যাতে রং উঠে না যায় সে জন্য প্রত্যক্ষ রং দেওয়া বস্ত্রটিকে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটে এর পানিতে বিশ মিনিট গরম করে পরীক্ষার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। তুঁত প্রয়োগ করেও একই ফল পাওয়া যায়।

বিকশিত রং

কতকগুলো প্রত্যক্ষ রংকে বিশেষ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে যথেষ্ট পাকা রং উৎপন্ন করা হয়। এ পদ্ধতিকে ডায়োজোটাইজিং বা ডেভলপিং বলা হয়। এ জাতীয় রং প্রয়োগ করার সময় বস্ত্রটিকে রঙের গামলায় ডুবিয়ে নিয়ে পরে সোডিয়াম নাইট্রাইটের একটি ঠান্ডা দ্রবণে ডুবাতে হয়। এতে মূল রংটি একটি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এ জাতীয় রং সুতি, লিনেন, রেয়ন, এসিটেট, আরলেন, ডেক্রন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাজোইক রং

এ রং সাধারণত সুতি বস্ত্রে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাপড় প্রথমে ন্যাপথলে পরে ডায়োজোটাইজড রঙে ডুবানো হয়। রং লাগাবার পর কাপড়টি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। এ রং করার সময় রংগুলো বারবার বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা হয় তাই এ রংকে বরফ রং (ice-dye) বলে। এ জাতীয় রং সোডা, সাবান এমনকি ব্লিচিংয়েও পাকা, কিন্তু আলোতে আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায়।

ভ্যাট রং

সূতি, লিনেন এবং রেয়নের জন্য এ রং সবচেয়ে পাকা হয়। নাইলন, ডেক্রন, ওরলন, এক্রাইলিক, স্পানডেক্স ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তুতেও ব্যবহার করা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মরড্যান্ট ব্যবহার করতে হয়। রেশম ও পশমের জন্য ভ্যাট রং প্রযোজ্য নয়। ভ্যাট রং তিন ধরনের। নীল ভ্যাট, অ্যানথ্রাকুইনিনো ভ্যাট এবং সালফার ভ্যাট।

পিগমেন্ট রং

ছাপার কাজে এ রং ব্যবহৃত হয়।

বস্ত্রে রং প্রয়োগ

বস্ত্র বয়ন শিল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে রং লাগানো হয়। কোনো ক্ষেত্রে তন্তুতে, কোনো ক্ষেত্রে সুতায়, কোনো ক্ষেত্রে কাপড়ের পুরো থানটিতে, আবার কখনও বা পোশাক তৈরির পর। রং লাগানোর এ পদ্ধতিগুলো হল :

- (১) স্টক ডাই (Stock-dyeing) তন্তু কাঁচামাল অবস্থায় রং প্রয়োগ।
- (২) ইয়ার্ন ডাইং (Yarn dyeing)-সুতায় রং প্রয়োগ
- (৩) পিস ডাইং (Piece dyeing) খন্ড খন্ড বস্ত্রে বা পোশাকে রং প্রয়োগ
- (৪) ক্রস ডাইং— প্রথম দুটির সমন্বিত রূপ
- (৫) ডিগ ডাইং— খন্ড কাপড়ে বা কাপড়ের রোলে রং প্রয়োগ
- (৬) দ্রবণ পিগমেন্টিং (Solution pigmentation)—কৃত্রিম বা সিনথেটিক তন্তুগুলো স্পিনারেটের ছিদ্র দিয়ে বের হওয়ার পূর্বে এমন রং করা হয়।

স্টক ডাইং

স্টক ডাইং হল মজুদ বা কাঁচামাল অবস্থায় রং করা। এ পদ্ধতিতে তন্তুগুলো একটি রঙের পাত্র বা গামলায় ডুবিয়ে রং করা হয়। এর দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। দ্রবণ পদ্ধতি ও শীর্ষপদ্ধতি। দ্রবণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙের দ্রবণে সুতা কাটার আগেই তন্তুগুলো ভিজিয়ে নেওয়া হয়। এ পদ্ধতি কম ব্যয়বহুল। এভাবে করা রং সহজে ফিকে হয় না। তবে রং করার ফলে তন্তুগুলো বেশ শক্ত হয় বলে সুতা কাটা অধিকতর জটিল হয়।

শীর্ষ পদ্ধতিতে রং করার প্রক্রিয়া একটু আলাদা। কম্বিং যন্ত্র থেকে পশমের লম্বা লম্বা আলগা দড়ির শীর্ষে রং লাগানো হয়। ছিদ্রযুক্ত টেকোতে বল আকারে দড়িগুলো গুটিয়ে একটি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয়। এ চৌবাচ্চার ভেতর দিয়ে পাম্পের সাহায্যে রং ঢুকিয়ে বের করা হয়। এভাবে তন্তুতে রং লাগানো হয়। আবার কম্বিং এর পর স্নিভার করার সময় তন্তুর বিভিন্ন স্থানে রং লাগানো হয়। এতে সুতা কাটার পর সুতার বিভিন্ন স্থানে সুন্দর রং ফুটে ওঠে। একে স্ল্যাব ডাইং বলে।

ইয়ার্ন ডাইং

বস্ত্র বয়নের আগেই সুতায় রং করার প্রক্রিয়াকে বলে ইয়ার্ন ডাইং। তন্তু থেকে প্রস্তুত সুতা লাটাইয়ে (Spool) অথবা পেটিতে (Skein) জড়ান থাকে। এ অবস্থায় সুতাকে রঙের দ্রবণে ডুবিয়ে রং করা হয়। এভাবে সুতায় রং লাগালে রং খুব পাকা হয়।

পিস ডাইং

সম্পূর্ণ বস্ত্র তৈরি হওয়ার পর তাতে রং লাগানকে বলে পিস ডাইং। অনেক সময় একে ডিপ ডাইংও বলে। এতে রং খুব ঘনিষ্ঠভাবে সুতায় লাগে না ফলে রং খরচ কম হয়। তন্তু বা সুতার সব অংশে সুষমভাবে লাগে না বলে রং পাকা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। লিনেন, রেশম, ক্রেপ এবং খুব পাতলা সুতির কাপড়। যেমন—অরগ্যান্ডি, ভয়েল ইত্যাদিতে এই পদ্ধতিতে রং লাগানো হয়।

জিগ ডাইং

এই পদ্ধতিতে একটি রঙের পাত্র বা গামলার মধ্যে স্থাপিত দুটি রোলারের মাঝ দিয়ে বস্ত্রকে অতিক্রান্ত বা প্রবাহিত করান হয়। এতে বস্ত্রে রং লাগে। রেয়ন বা নাইলনকে এই পদ্ধতিতে রং করা হয়। বিশাল বিশাল কাপড়ের রোলকে কারখানায় এই পদ্ধতিতে অতি দ্রুত রং করা হয়।

প্রিন্টিং

প্রিন্টিং প্রক্রিয়াতে অনেক কাপড় রং করা হয়। আসলে প্রিন্টিংকে ডাই বা রঙের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। বস্ত্রে ছাপ দিয়ে রং লাগানোর প্রক্রিয়াকে প্রিন্টিং বলে। এতে বিভিন্ন রং দিয়ে কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন ডিজাইন খোদাই বা আঁকা হয়।

ডিজাইন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোলারের ভিন্ন ভিন্ন নক্সা খোদাই করা থাকে। রোলারে প্রয়োজনীয় রং লাগিয়ে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হয়। আবার ছোট ছোট ডাইসের সাহায্যেও কাপড়ে ছাপা দেওয়া যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ছাপা কাপড়ের এক পিঠ রং হয় অন্য পিঠ সাদা বা ছাপাবিহীন থাকে।

রং বস্ত্রকে সুন্দর ও মনোরম করে। কিন্তু অধিকাংশ রঙের উৎস বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। কারখানায় বস্ত্রে রং করার পর এসব রঙের বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে ধ্বংস না করলে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। বিশেষ করে জলাশয় বা নদীতে বর্জ্য রং ফেললে পানি দূষিত হয়, জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। ফসলের জমিতেও এসব বর্জ্য ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য রঙের বর্জ্যসমূহ নিষ্কাশনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি প্রাণিজ তন্তু?

- ক. ক্যাপক
- খ. অ্যাসবেস্টস
- গ. সিল্ক
- ঘ. ফ্লাক্স।

২। নিচে তিনটি বাক্য দেওয়া আছে—

- (i). সিল্ক প্রাকৃতিক আঁশের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত।
- (ii). উলের তন্তুর তল অমসৃণ।
- (iii). ইনসুলেশন, অগ্নিরোধক ও শব্দরোধক তৈরিতে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩। ১২০০ মিটার সুতার ওজন ১৮ গ্রাম হলে এর কাউন্ট কত?

- ক. ১২ টেক্স
খ. ১৫ টেক্স
গ. ১৮ টেক্স
ঘ. ২১ টেক্স

৪। কারখানায় বস্ত্র রং করার পর রঙের বর্জ্যসমূহ নিষ্কাশনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত, কারণ—

- (i). রঙের বর্জ্যসমূহ পরিবেশের দূষণ ঘটায়।
(ii). জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে।
(iii). ফসলের জমিতে এসব বর্জ্য ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুর রহমান তাত ব্যবসায়ী, বাজার হতে সুতা কিনে সে বস্ত্র তৈরি করে। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম সকল প্রকার সুতা আবদুর রহমান ব্যবহার করে। বস্ত্র তৈরির পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রহমান সুতায় রং করার কাজও করে। প্রতিদিন রহমানের প্রায় ৪ লক্ষ মিটার সুতা লাগে যার ওজন প্রায় ৬ কিলোগ্রাম।

- ক. প্রাকৃতিক সুতার ১টি উৎসের নাম লিখ।
খ. কৃত্রিম তন্তু ও প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।
গ. রহমানের ব্যবহৃত সুতার কাউন্ট নির্ণয় কর।
ঘ. সুতি বস্ত্রের জন্য কোন রথটি রহমানের জন্য লাভজনক বলে তুমি মনে কর—যুক্তিসহকারে লিখ।

উনবিংশ অধ্যায়

রঞ্জক সামগ্রী

রং আমাদের জীবন ও পরিবেশকে করেছে বৈচিত্রময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত। প্রকৃতির যে দিকে তাকাই সেদিকেই রঙের খেলা। প্রকৃতির ভাঙারে এ বিচিত্র রঙের সমাহার মূলত সূর্যের আলোর বিভিন্ন রঙের প্রতিফলন। প্রকৃতি থেকে আমরা যদি চোখ ফেরাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, জানালা দরজা, রাস্তা, গাড়ি, লঞ্চ, নৌকা সব কিছুই কোনো না কোনোভাবে রঙিন বা রং করা হয়েছে। দ্রব্য সামগ্রী রঙিন করার প্রক্রিয়া মানুষ আয়ত্ত্ব করেছে হাজার হাজার বছর ধরে। রং আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, বস্তুকে আকর্ষণীয় করে।

রঞ্জক পদার্থ

বস্তুকে রঙিন করার জন্য যে সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদের সাধারণ নাম রঞ্জক পদার্থ (Colorant)। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রাকৃতিক উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজ পদার্থকে রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে কৃত্রিম রঞ্জক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে বস্তুর রঙের মধ্যে যেমন এসেছে বৈচিত্র্য তেমনি মানও হয়েছে উন্নত।

রঞ্জক পদার্থের শ্রেণী

বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় : দ্রবণীয় রঞ্জক অদ্রবণীয় রঞ্জক। যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ পানিতে বা অন্য কোনো তরলে দ্রবীভূত হয় সেসব পদার্থের সাধারণ নাম দ্রবণীয় রং বা ডাই (dye)। যে সব রঞ্জক পদার্থ পানিতে বা অন্য কোনো তরলে দ্রবীভূত হয় না, অথচ অস্বচ্ছ তরল অবস্থায় বস্তুর উপরিতলে বা বস্তু পৃষ্ঠে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং বস্তু পৃষ্ঠে রঙিন হয় সেসব রঞ্জক পদার্থকে বলে অদ্রবণীয় রং বা পেইন্ট (paint)। ধাতু, কাঠ, বাঁশ, পাথর, কাগজ, কাপড়, চামড়া ইত্যাদি বস্তুপৃষ্ঠে পেইন্ট লাগানো যায়। কাপড়, কাগজ বা বিভিন্ন ধরনের তন্তু ও বস্ত্রে দ্রবণীয় রং বা ডাই ব্যবহার করা যায়।

পেইন্টের উপাদান

পেইন্টের মূল উপাদান তিনটি : (১) পিগমেন্ট বা রং চূর্ণ (Pigment) (২) মাধ্যম (Vehicle) ও (৩) দ্রাবক থিনার (Solvent thinner)

পেইন্ট মূলত পিগমেন্ট এবং মাধ্যম পদার্থের মিশ্রণ। মাধ্যম একটি তরল পদার্থ কিন্তু মাধ্যমের মধ্যে রং চূর্ণ বা পিগমেন্ট কখনো দ্রবীভূত হয় না। বরং সুসমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ চূর্ণগুলো মাধ্যমের মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয় যে, কণাগুলো সমান দূরত্বে ছড়িয়ে যায়। এ রং মিশ্রণকে পাতলা করার জন্য ব্যবহৃত হয় আর একটি তরল দ্রাবক পদার্থ। এতে মাধ্যম তরলটি দ্রবীভূত হয় কিন্তু মূল পিগমেন্ট দ্রবীভূত হয় না। একে বলে দ্রাবক থিনার। রংকে বা পেইন্টকে পাতলা করলে তা বস্তু পৃষ্ঠে প্রয়োগ সহজ ও সুসম হয়। বিশেষ করে স্প্রে পদ্ধতিতে রং করার সময় থিনারের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পেইন্টের শ্রেণী বিভাগ

পিগমেন্ট, মাধ্যম এবং খিনারের বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন পেইন্ট তৈরি হয়। ফলে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পেইন্টগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

- (১) ইমালশান বা ল্যাটেক্স রং (Emulsion or latex paint)
- (২) তেল রং (Oil based paint)
- (৩) কালাই বা ল্যাকার রং (Lacquer paint)
- (৪) অগ্নিরোধক রং (Fire retardant paint)
- (৫) তাপ রোধক রং (Heat-resistant paint)
- (৬) সিমেন্ট জল রং (Cement water paint)
- (৭) ধাতব রং (Metallic paint)
- (৮) কাঠ ও প্লাস্টার রং (Wood and plaster paint)
- (৯) এনামেল রং (Enamel paint)

ইমালশান বা ল্যাটেক্স পেইন্ট

কোনো কোনো গাছের ছাল বা বাকল থেকে দুধের মতো সাদা রস বা নির্যাস বের হয়। এর সাধারণ নাম ল্যাটেক্স। রবার গাছ থেকে এ ধরনের সাদা রস সংগ্রহ করা হয়। ল্যাটেক্স বলতে সাধারণভাবে রবার রসকেই বুঝায়। এ রস থেকে রবার তৈরি হয়। কৃত্রিম উপায়েও ল্যাটেক্স তৈরি হয়। পানির মধ্যে কৃত্রিম বা সিনথেটিক রজন মিশিয়েও ল্যাটেক্স তৈরি হয়। এ ল্যাটেক্স মাধ্যমের মধ্যে পিগমেন্ট মিশ্রিত করে যে রং তৈরি হয় তাকে ল্যাটেক্স বা ইমালশান পেইন্ট বলে।

দেয়াল, ধাতব পৃষ্ঠ, কাঠ, বাঁশ, বেত রং করতে এই পেইন্ট ব্যবহার করা হয়। এ পেইন্ট বা রং পানি দিয়ে পাতলা করা যায়। দেয়াল রং করার জন্য যে ইমালশান তৈরি হয় তাতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম পলিভিনাইল ল্যাটেক্স মাধ্যম এবং বিভিন্ন ধরনের পিগমেন্ট। কাঠের জন্য তৈরি ইমালশান পেইন্ট ইট, কংক্রিট, দেয়াল এবং ছাদেও লাগানো যেতে পারে। এই পেইন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় পলিভিনাইল এসিটেট অথবা এক্রাইলিক। এতে খিনার হিসেবে পানি ব্যবহৃত হয়। এ পেইন্টের পাতলা প্রলেপ বস্তু পৃষ্ঠকে ক্ষারীয় প্রভাব থেকে রক্ষা করে। পলি এক্রাইলিক ল্যাটেক্স এর সঙ্গে পিগমেন্ট মিশিয়েও ইমালশান তৈরি করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার পিগমেন্ট

পেইন্টের উপাদান হিসেবে যে সব পিগমেন্ট ব্যবহার করা হয় এদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মৌলিক পিগমেন্ট (Prime pigment) এবং নিষ্ক্রিয় পিগমেন্ট (Inert pigment)। মৌলিক পিগমেন্ট রঞ্জক পদার্থের রং সৃষ্টি করে। পূর্বে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ যেমন সীসার যৌগ মৌলিক পিগমেন্ট হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন কৃত্রিম বা সিনথেটিক পদার্থ মৌলিক পিগমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব সিনথেটিক পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড (সাদা পিগমেন্ট), থ্যালাসাইনাইন (নীল এবং সবুজ পিগমেন্ট), আয়রন অক্সাইড (বাদামি, লাল, হলুদ পিগমেন্ট)।

নিষ্ক্রিয় পিগমেন্ট রঞ্জকের বর্ণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে এসব বস্তু রঞ্জককে দীর্ঘস্থায়ী করে, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। নিষ্ক্রিয় পিগমেন্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্রে, ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, মাইকা, ট্যালক ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার ভার্নিশ

কাঠ, ধাতু এবং অন্যান্য পদার্থকে উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় করার জন্য এবং বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য বস্তুর উপর এক ধরনের স্ফটিক তরল প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। একে ভার্নিশ বলে। ভার্নিশ শুকিয়ে গেলে তরলের উপর একটি শক্ত চকচকে পাতলা প্রলেপ সৃষ্টি হয়। এতে প্রলেপের মধ্য দিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত বা ধাতব পৃষ্ঠ দৃশ্যমান হয়। কাঠের আঁশগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভার্নিশ দ্রব্যের নিজস্ব রং থাকে। এতে কাঠের রং কিছুটা পরিবর্তন হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও কাঠের আঁশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকে। ধাতু পৃষ্ঠে ভার্নিশকে অনেক সময় কালাই করা (lacquers) বলে। কালাই ধাতু পৃষ্ঠের ক্ষয় এবং মরিচা রোধ করে, ফলে ধাতুর উজ্জ্বলতা অপরিবর্তিত থাকে। বিদ্যুৎ নিরোধক তার, কাঠের জিনিসপত্র, কাগজ ইত্যাদি আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে ভার্নিশ ব্যবহৃত হয়।

ভার্নিশ প্রধানত দুই প্রকার। স্পিরিট ভার্নিশ এবং তেল রজন বা অলিওরেজিনাস (oleoresinous) ভার্নিশ।

স্পিরিট ভার্নিশ তৈরি হয় রজন বা চাঁচ জাতীয় দ্রব্যকে ইমাইল এলকোহল অথবা মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে দ্রবীভূত করে। এ দ্রবণ কাঠের উপর লাগালে স্পিরিট দ্রুত বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এবং কাঠের পিঠে ভার্নিশের প্রলেপ পড়ে। স্পিরিট ভার্নিশ ৪ প্রকার : চাঁচ-গালা ভার্নিশ, রজন ভার্নিশ, ফেনল রজন ভার্নিশ এবং ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রজন ভার্নিশ।

তেল-রজন ভার্নিশ তৈরি হয় রজন এবং বিশেষ শ্রেণীর তেলের মিশ্রণে। তেলের মধ্যে রজন দিয়ে উত্তপ্ত করা হয় এবং টার্পিন অথবা পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থে দ্রবীভূত করা হয়। এ দ্রবণ বাষ্পীভূত হয় এবং রজন তেলকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এ ধরনের ভার্নিশ ঘরের বাইরের বস্তুর জন্য সবচেয়ে উত্তম। তেল রজন ভার্নিশকে ৮ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বহিঃতেল ভার্নিশ, অন্তঃতেল ভার্নিশ, চার্চ ওক ভার্নিশ, ফ্লোর ভার্নিশ, ফ্লাটিং ভার্নিশ ও স্টোভ ভার্নিশ।

ভার্নিশ তৈরি

প্রাকৃতিক এবং সিনথেটিক উভয় প্রকার রজনই ভার্নিশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক রজন এক ধরনের গাছের রস থেকে সংগৃহীত হয়। চাঁচ-গালা, লাক্সা, ডেমার ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত রজন। কৃত্রিম রজন গবেষণাগারে প্রস্তুত কতকগুলো রাসায়নিক যৌগ, যেমন ফিনল-ফরমালডিহাইড, ইত্যাদি। স্পিরিট ভার্নিশ তৈরির জন্য একটি মাটির, কাঠের বা ধাতব পাত্রে প্রথমে কিছু পরিমাণ মেথিলেটেড স্পিরিট নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে পরিমাণ মতো রজন বা গালা ভিজিয়ে বা ডুবিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গালা স্পিরিটে গলে যাবে। গালাগুলোকে তাড়াতাড়ি গলাতে চাইলে একটি কাঠি দিয়ে এগুলোকে স্পিরিটে নাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজনে সামান্য তাপ প্রয়োগও করা যেতে পারে। এ তরল আঠাল দ্রবণে নরম কাপড় অথবা তুলা ভিজিয়ে কাঠের আসবাবপত্রের গা সুস্বভাবে মুছে নিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েকবার মুছে দিলে বস্তু পিঠে ভার্নিশের প্রলেপ পড়বে।

এখানে স্পিরিট ভার্নিশ তৈরির একটি ফরমুলা দেওয়া হল। উপাদানের অনুপাত ঠিক রেখে, অল্প পরিমাণ উপাদান নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ভার্নিশ প্রস্তুত ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

চাঁচ-গালা	৯০ কেজি
টারপিনটাইন অয়েল	৩.৫ কেজি
মেথিলেটেড স্পিরিট	৩৬০ লিটার

স্পিরিট ভার্নিশ আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত ভার্নিশ। কাঠ, বাঁশ, বেতের তৈরি ফার্নিচার, আসবাবপত্র প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে সংরক্ষণ করার জন্য এই ভার্নিশ ব্যবহার করা হয়। এতে আসবাবপত্র দীর্ঘদিন উজ্জ্বল ও চকচকে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোনটি নিষ্ক্রিয় পিগমেন্ট?

ক. ট্যালক

খ. জিঙ্ক অক্সাইড

গ. আয়রন অক্সাইড

ঘ. সীসা চূর্ণ।

২। ডাই এবং পেইন্ট এর জন্য নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

ক. ডাই পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু পেইন্ট দ্রবণীয়।

খ. ডাই তরলে দ্রবণীয় কিন্তু পেইন্ট নয়।

গ. ডাই প্রকৃতিজাত বা কৃত্রিম হলেও পেইন্ট প্রকৃতিজাত।

ঘ. কাপড়ে রং করতে ডাই ও পেইন্ট সমহারে ব্যবহৃত হয়।

৩। ভার্নিশ ব্যবহারে—

(i). মরিচা রোধ হয়

(ii). বেত বা কাঠের আঁশ দেখা যায়

(iii). পদার্থ রঙিন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ও ii

৪। নিচের কোনটি সঠিক?

ক. সকল প্রকার ভার্নিশে রং ব্যবহার করা হয়।

খ. সকল প্রকার ভার্নিশে রঙন ব্যবহার করা হয়।

গ. সকল প্রকার ভার্নিশে স্পিরিট ব্যবহার করা হয়।

ঘ. সকল প্রকার ভার্নিশে তেল ব্যবহার করা হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচে ভার্নিশ তৈরির একটি ফরমুলা দেখানো হল :

টাচ-গালা-৯০ কেজি

টারপিনটাইন তেল-৩.৫ কেজি

মেথিলেটেড স্পিরিট-৩৬০ লিটার।

ক. উপরের ফরমুলাটি কোন ধরনের ভার্নিশ?

খ. তেল রঙন এবং উল্লিখিত ভার্নিশের মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. যদি এ ভার্নিশে মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার না করা হত তাহলে কী হত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এ ধরনের ভার্নিশ ব্যবহারের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।

বিংশ অধ্যায়

বাস্তুসংস্থান

জড় ও জীবের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে পরিবেশ। জীব মাত্রই পরিবেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে যা আবার সম্পূর্ণভাবে পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। তাই পরিবেশে জড় ও জীব উপাদানের কোনো অভাব ঘটলে তার ওপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। গাছে পাখি আশ্রয় নিয়ে খাদ্য ও অক্সিজেন পায়। বিনিময়ে পাখি গাছের প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের যোগান দেয়। উদ্ভিদ উর্বর জমি হতে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে। প্রাণী আবার সেই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জীবের অন্যতম সহজ প্রকৃতি। এরূপ পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই সমতা বা স্থিতিাবস্থা বজায় থাকে।

বাস্তুসংস্থান

প্রকৃতিতে বিভিন্ন জীব শুধু যে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তাই নয়, তারা পরিবেশের মূল উপাদান মাটি, পানি, বায়ু এমনকি অন্যান্য গাছপালা ও পশু পাখির ওপরও সমভাবে নির্ভর করে। এ জন্য জীব ও তার পরিবেশকে কখনও পৃথকভাবে ভাবা যায় না। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জড় পরিবেশ ও জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীব সম্প্রদায়ের সাথে জড় পরিবেশের এই অন্তঃসম্পর্কই হল বাস্তুসংস্থান।

বাস্তুসংস্থানকে আবার বাস্তুতন্ত্র অথবা প্রকৃতি বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তবে বাস্তুসংস্থানকে সচরাচর প্রকৃতি বলা হয়। অতীতে মানুষ নিজেকে পরিবেশ বা বাস্তুসংস্থানের বাইরে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে ভাবলেও এখন আর তা ভাবে না। কেননা মানুষও অন্যান্য জীবের মতো পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ ও পরিবেশ পরস্পরের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পরিবেশ জীবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তেমনি জীবও পরিবেশকে ইচ্ছানুযায়ী সুন্দর করে গড়তে অথবা পরিবেশকে কলুষিত বা বিপন্ন করতে পারে।

বাস্তুসংস্থানের উপাদান

যে কোনো বাস্তুসংস্থানে দুটি মূল উপাদান আছে, যার একটি হচ্ছে জীব-সম্প্রদায় এবং অপরটি জড় পরিবেশ। সকল জীব মিলেই জীব সম্প্রদায় গঠিত। জড় পরিবেশই জীব সম্প্রদায়কে ধারণ করে রাখে। জীব সম্প্রদায় হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের জীব উপাদান এবং অবশিষ্ট সবই হচ্ছে জড় উপাদান।

ক) জড় উপাদান : বাস্তুসংস্থানের জড় উপাদানগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন অজৈব উপাদান, জৈব উপাদান ও ভৌত উপাদান। এগুলোই জীব উপাদানগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

(১) অজৈব উপাদান : মাটি, পানি এবং ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ লবণ হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের অজৈব উপাদান। এছাড়াও রয়েছে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন জাতীয় বায়বীয় পদার্থ। এসবই সবুজ উদ্ভিদের প্রাথমিক খাদ্য উপাদান।

(২) জৈব উপাদান : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ বিশ্লিষ্ট হয়ে ইউরিয়া ও হিউমাস তৈরি হয়। এগুলোই মাটির জৈব উপাদান। মৃতজীবী ছত্রাক ও জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে এসব জৈব উপাদান আবার অজৈব লবণে পরিণত হয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অজৈব লবণ শোষণ করে পুষ্টি লাভ করে। এ থেকে বোঝা যায়, জৈব পদার্থগুলোই জীব ও জড় উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে।

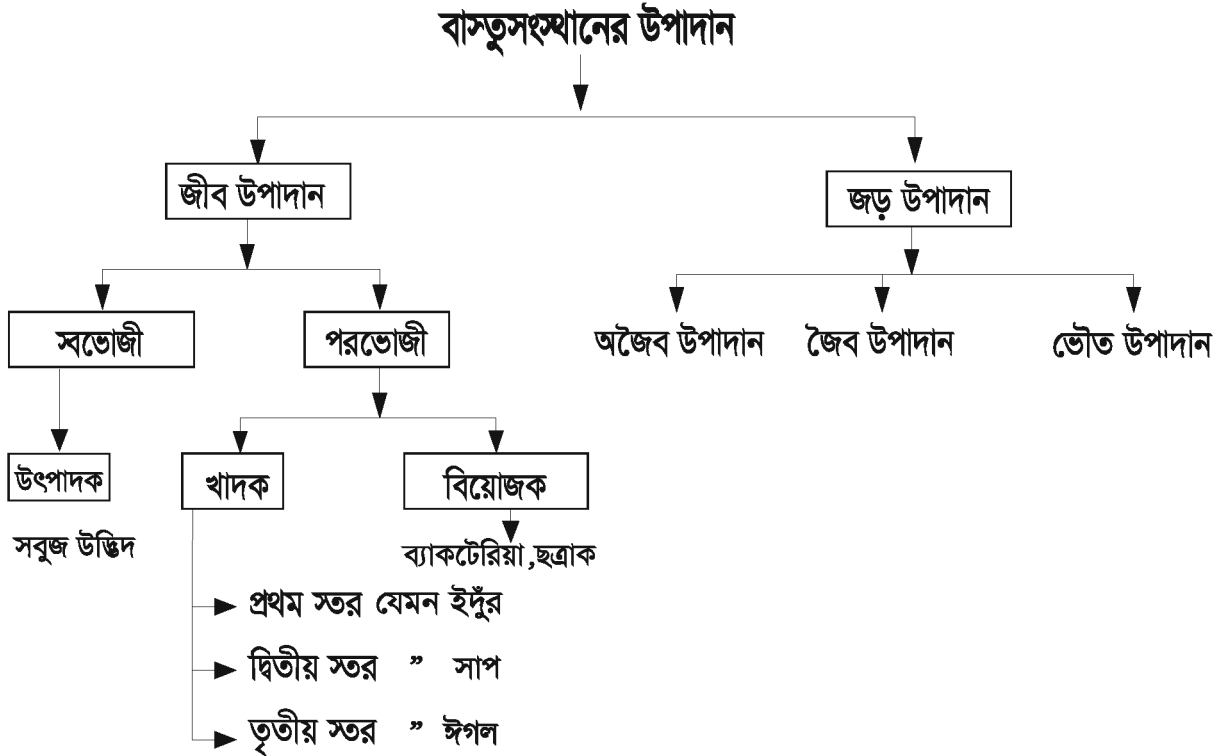
(৩) **ভৌত উপাদান** : পরিবেশের জড় অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য যে সব শর্তের ওপর নির্ভর করে তা হচ্ছে— আবহাওয়া—জলবায়ু, মাটির গুণাগুণ ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণ।

আবহাওয়া ও জলবায়ু, মাটির গুণাগুণ এবং ভূ-প্রাকৃতিক কারণসমূহ বাস্তুসংস্থানের নির্জীব বা জড় উপাদানগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সৌরশক্তি। সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোপ্লাস্টের সাহায্যে সৌরশক্তিকে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে নিজ দেহে সঞ্চিত রাখে। এ সবুজ উদ্ভিদ থেকেই সৌরশক্তি সব জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এ জন্যই পৃথিবীতে প্রাণ প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে।

খ) **জীব উপাদান** : প্রতিটি জীবই বাস্তুসংস্থানের উপাদান। বাস্তুসংস্থানের জড় ও জীব উপাদান পরস্পরের ওপর এমনই নির্ভরশীল যে একের অনুপস্থিতিতে অপরটির অসুবিধা ঘটে। উদ্ভিদের প্রকৃতি বাস্তুসংস্থানের প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রতিটি জীব জীবনধারণ, দৈহিক বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এ খাদ্যই জীবকে জীবনশক্তি প্রদান করে। বাস্তুসংস্থানের সমস্ত জীব উপাদানের মধ্যে প্রবাহিত সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য।

একটি আদর্শ বাস্তুসংস্থানের গঠন বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝার জন্য এর উপাদানগুলোকে নিম্নরূপ প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়।



বায়োম

বাস্তুসংস্থানের সজীব উপাদানগুলো হচ্ছে কতকগুলো স্বতন্ত্র জীব বা একই প্রজাতির জীব। যেমন— উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু। এ সব জীব বিভিন্ন পরিবেশে নানানভাবে সংগঠিত হয়ে সমষ্টিবদ্ধ জীবন-যাপন করে। তাই বায়োম সম্পর্কে ধারণা লাভের পূর্বে প্রজাতি-সমষ্টি ও জীব-সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা দরকার।

নির্দিষ্ট বসতিতে একই প্রজাতির সব জীব সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে এক একটি প্রজাতি সমষ্টি (population)। প্রজাতি-সমষ্টি কখনই এককভাবে কোনো কাজ সমাধান করতে পারে না। তবে একটি নির্দিষ্ট বসতিতে বসবাসরত

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি সমষ্টির মধ্যে নিয়ত মিথোস্ক্রিমার শর্ত বজায় থাকায় প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রজাতির সদস্য সংখ্যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমতা বা ভারসাম্য প্রায় স্থিতিাবস্থায় থাকে।

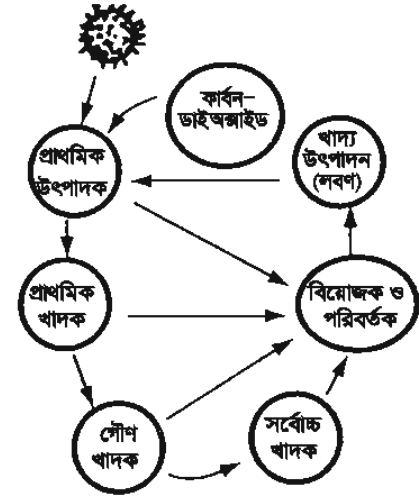
একইভাবে কোনো নির্দিষ্ট বসতির সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সমষ্টি সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে জীব সম্প্রদায়। একই সম্প্রদায়ের জীবগুলো পারস্পরিক বিনিময় বা মিথোস্ক্রিমার মাধ্যমে একে অন্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এবং একটি বাস্তুসংস্থান গড়ে তোলে। জীব নিজে থেকে বাস্তুসংস্থানের একটি স্বতন্ত্র অংশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। জড় পরিবেশে জীব বেঁচে থাকার সঙ্গ্রামে সফল হওয়ায় তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে কখনও জড় পরিবেশে কোনো পরিবর্তন ঘটলে বেঁচে থাকার সঙ্গ্রামে এরা অপেক্ষাকৃত কম সাফল্য লাভ করে।

পৃথিবীর কোনো কোনো বিশাল অঞ্চলে প্রায় একই সম্প্রদায়ের বা নৈকট্য সম্পন্ন জীবসম্প্রদায় বাস করে। এসব অঞ্চলের সাদৃশ্য সম্পন্ন জীবসম্প্রদায় একত্রে বা সুসংহত হয়ে গড়ে তোলে বায়োম। সংক্ষেপে বলা যায়, সপ্ট ও একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব নিয়ে গড়ে ওঠে বায়োম। যেমন, সুন্দরবন অঞ্চলের একই রকম আবহাওয়া এবং ভূমিরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি বায়োম। এমনিভাবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু ও মাটির প্রভাবে গঠিত হয়েছে কতকগুলো বায়োম। যেমন— ভূগভূমি, মরুভূমি, অরণ্য, মেরু অঞ্চল প্রভৃতি।

পৃথিবীর সব বায়োম বা সজীব বস্তু একত্রে গড়ে তোলে জীবমণ্ডল। বলা যায়, জল, স্থল ও বায়ু—যেসব স্থানে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানেই তারা একত্রে গড়ে তোলে জীবমণ্ডল। প্রকৃতপক্ষে, জীবনমণ্ডল, হচ্ছে এক বিশাল বাস্তুসংস্থান।

খাদ্য শৃঙ্খল

একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই স্বনির্ভর। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে। প্রাণীরা পরভোজী, খাদ্যের জন্য তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। সবুজ উদ্ভিদ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদক। এদের দেহে সৌরশক্তি স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে, তার কিছু অংশ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে দেহে জমা থাকে যা ভূগভোজী প্রাণীরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবার মাংসাশী প্রাণীরা ভূগভোজী প্রাণীদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে খাদ্যের উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শৃঙ্খল আকারে খাদ্য ও খাদকের যে সরল ধারাবাহিকতা দেখা যায়, তাকে বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খল।



চিত্র ২০.১ : খাদ্য শৃঙ্খল

শক্তির মূল উৎস সূর্য। এ সৌরশক্তি (১) উৎপাদক (২) খাদক (৩) বিয়োজক (৪) পরিবর্তক এই চার প্রকার জীবে স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়।

(১) উৎপাদক : সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে। এরা এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর ফলে জীবের ও পরিবেশের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে। এভাবে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

সালোকসংশ্লেষণ পরিচালনায় সক্ষম উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক উৎপাদক। নিজেদের খাদ্য প্রস্তুতে সমর্থ বলে এ জাতীয় উৎপাদকেরা স্বনির্ভর। তাই এদের স্বভোজী উদ্ভিদ বলা হয়।

(২) খাদক বা ভক্ষক : বাস্তুসংস্থানের পরভোজী জীবগুলোকে খাদক বলা হয়। এরা সবুজ উদ্ভিদের মতো নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত শর্করা জাতীয় খাদ্য খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। খাদক বলতে সাধারণত প্রাণীদের বোঝায়। কারণ প্রাণী দেহে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে না। তাই খাদ্যের জন্য প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। খাদকদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন—

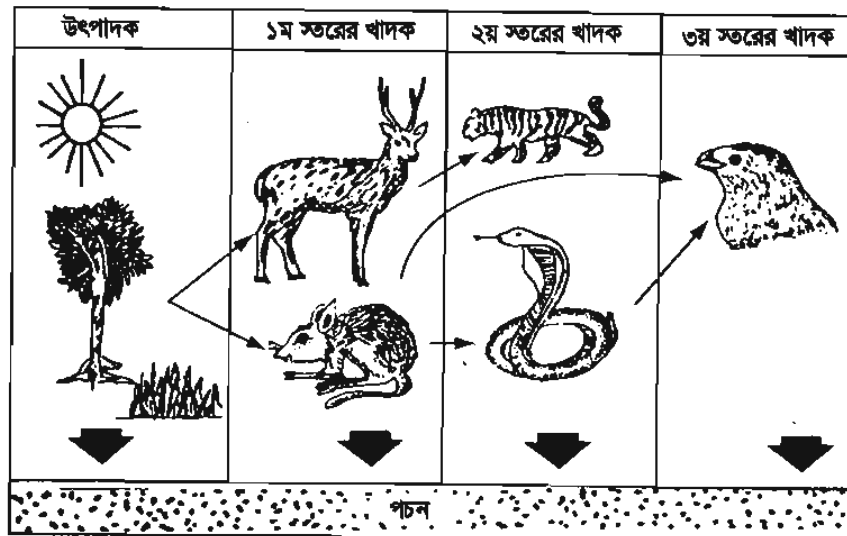
(অ) প্রথম স্তরের খাদক বা প্রাথমিক খাদক বা তৃণভোজী : যে সব প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা প্রথম স্তরের খাদক। খাদ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর তৃণভোজী প্রাণী। যেমন— পানিতে ভাসমান প্রাণী গ্রাজকটন, কীটপতঙ্গ, ফড়িং, প্রজাপতি, পায়রা, গরু, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি সরাসরি উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

(আ) দ্বিতীয় স্তরের খাদক বা গৌণখাদক বা মাংসাশী : প্রথম স্তরের খাদকদেরকে যারা খেয়ে বেঁচে থাকে সে সব প্রাণীদেরকে বলা হয় দ্বিতীয় স্তরের খাদক।

ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়; সিংহ, বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খায়। তাই এরা দ্বিতীয় স্তরের খাদক। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের জন্য এরা পরোক্ষভাবে খাদ্য উৎপাদকের (উদ্ভিদের) ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের মধ্যে মাছ, দোয়েল, কাক, সারস, সাপ, কুকুর, নেকড়ে, মাকড়সা, টিকটিকি উল্লেখযোগ্য।

(ই) তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক : দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তাদের বলা হয় তৃতীয় স্তরের খাদক। শকুন, বাজপাখি, হাঙ্গার, কুমির, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী তৃতীয় স্তরের খাদক। অবশ্য, কোনো কোনো প্রাণী একাধিক স্তরের খাদক হয়ে থাকে। এদের সর্বভুক (omnivores) প্রাণী বলে। ময়ূর যখন উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় তখন সে প্রথম স্তরের খাদক। আবার যখন ছোট ছোট সাপ খায় তখন সে তৃতীয় স্তরের খাদক। তেমনিভাবে মানুষও বিভিন্ন স্তরের খাদ্য খায়। মানুষ যখন ভাত ও ডাল খায় তখন সে প্রথম স্তরের খাদক। আবার যখন মাছ, মাংস, দুধ খায় তখন সে দ্বিতীয় স্তরের খাদক।

(৩) বিয়োজক বা পচনকারী : বাস্তুসংস্থানে আর এক প্রকার পরভোজী জীব আছে যাদের সমষ্টিগতভাবে বিয়োজক বলে। এরা উৎপাদকের ও খাদকদের মৃতদেহ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে। বিয়োজক জীবগুলো প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। এরা অন্য জীবের মৃতদেহ থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। এ সময় পর্যায়ক্রমে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিয়োজিত হয়ে নানা রকম সরল অজৈব বা জৈব যৌগ পদার্থে পরিণত হয়। একেই জীবদেহের পচন বলে। ফলে মৃতদেহ বিনষ্ট হয় এবং উদ্ভিদের শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদান মাটিতে বা বায়ুতে জমা হয়। এ জন্য বাস্তুসংস্থানে বিয়োজকদের উপস্থিতি অপরিহার্য।



চিত্র ২০.২ : বাস্তুসংস্থানের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

(৪) **পরিবর্তক বা রূপান্তরক** : কয়েক প্রকার জীবাণু পরিবর্তকের ভূমিকা পালন করে। মাটিতে বসবাসকারী ছত্রাক ও অণুজীব মৃতদেহ হতে খাদ্য সংগ্রহকালে সেসব মৃতদেহ বিয়োজিত হয়। বিয়োজকরা যে সব সরল জৈব যৌগ পদার্থ তৈরি করে, কতকগুলো জীবাণু সেগুলোকে আবার অজৈব যৌগ (লবণ) অথবা মৌলে পরিবর্তন করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। উৎপাদক উদ্ভিদ আবার পরবর্তীতে এসব উপাদান শোষণ করে। এভাবে বিয়োজিত পদার্থ পুনরায় আবর্তিত হতে থাকে। বাস্তুসংস্থানের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে বিয়োজক ও পরিবর্তনকারীরা প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৫) **আবর্জনাভুক** : কিছু মাংসাশী প্রাণী শুধু তৃণভোজী প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে না, তারা মাংসাশী প্রাণীও খায়। যেমন— বনে কোনো প্রাণীর মৃতদেহ থাকলে, হায়েনা, কুকুর, শকুন, কাক তা খেয়ে ফেলে। তাই এদের বলা হয় আবর্জনাভুক বা প্রকৃতির ধাজাড়া। এরা তৃতীয় স্তরের খাদক। খাদক, বিয়োজক এবং পরিবর্তক শ্রেণীর সব জীব পরভোজী। কেননা এরা সকলেই খাদ্যের জন্য স্বভোজীদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে।

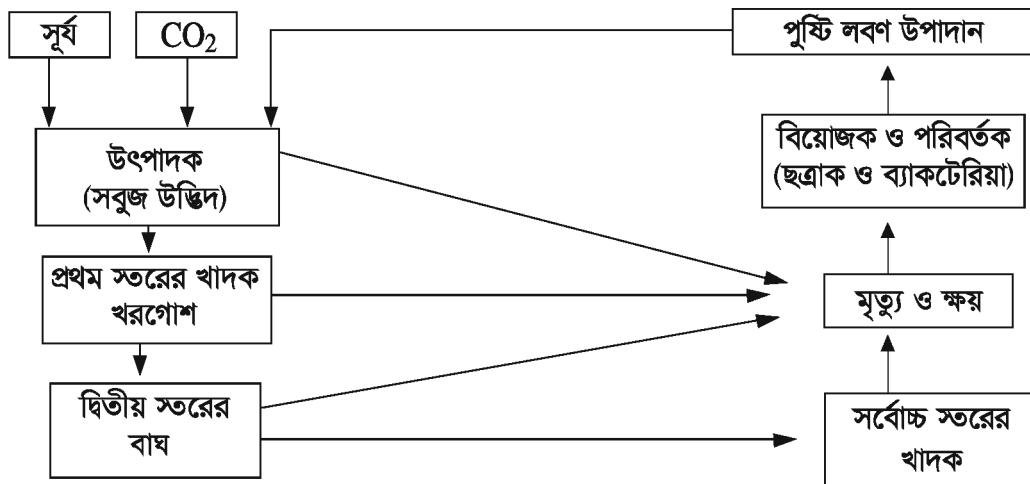
যুগ যুগ ধরে উৎপাদক ও খাদকের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে মৌলিক পদার্থের আবর্তন ঘটছে।

বাস্তুসংস্থানের কার্যপদ্ধতি

বাস্তুসংস্থানকে সচল রাখার জন্য যেসব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ :

- ১) সালোকসংশ্লেষণে সূর্য হতে আলোকশক্তি শোষণ
- ২) উৎপাদক কর্তৃক মাটি হতে শোষিত পানি ও অজৈব লবণের সমন্বয়ে শর্করা, আমিষ ও কোষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন
- ৩) বিভিন্ন স্তরের খাদক কর্তৃক উৎপাদক ও নিম্নস্তরের খাদকদের খাদ্যরূপে গ্রহণ এবং গৃহীত বস্তু আত্মীকরণ
- ৪) নিম্নস্তরের খাদকের উচ্চস্তরের খাদকদের খাদ্যে পরিণত হওয়া এবং
- ৫) উৎপাদক ও খাদকের মৃত্যুর পর তাদের দেহস্থিত জটিল জৈব যৌগগুলোকে ক্ষয় সাধন এবং পরিশেষে তাকে উৎপাদক উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য উপাদানে রূপান্তর ঘটানো।

নিচে প্রবাহ-চিত্রের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানের কার্যপদ্ধতির প্রধান ধাপগুলো অবলম্বনে খাদ্য শৃঙ্খলের একটি সামগ্রিক রূপরেখা দেখানো হল :



খাদ্য উৎপাদকের অস্তিত্বের ওপর খাদক স্তরের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নিচে স্থল ও জলজ খাদ্য শৃঙ্খলের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বাস্তুসংস্থান	উৎপাদক	খাদক			
		প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর	সর্বোচ্চ স্তর
স্থলজ	১। স্বজল উদ্ভিদ ২। ঘাস ৩। ঘাস ৪। শস্য ৫। ঘাস	→ মানুষ → গবাদিপশু → খরগোশ → ইদুর → ঘাস ফড়িং	→ মানুষ → বাঘ, সিংহ → সাপ → ব্যাঙ	→ ঈগল → সাপ	→ ময়ূর
জলজ	৬। জলজ উদ্ভিদ ৭। শেওলা ৮। শেওলা ৯। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন	→ জলজ কীটপতঙ্গ → মশার শূককীট বা → পানির পোকা → অ্যামিবা → জুয়োগ্র্যাকটন	→ মাছ → ব্যাঙ বা ছোটমাছ → জলজ কীটপতঙ্গ → কীটপতঙ্গ	→ মানুষ → বক বা মাছ → ছোট মাছ → ছোট মাছ	→ মানুষ → বড় মাছ → বড় মাছ (যেমন হাঙর)

পৃথিবীতে এ রকম আরও অনেক খাদ্য শৃঙ্খল আছে। এ থেকে ধারণা করা হয় খাদ্যের জন্য একে অন্যের ওপর কতটা নির্ভরশীল। এ খাদ্য শৃঙ্খলে একটি উৎপাদক ও সাধারণত তিন-চারটি খাদক থাকে। সর্বোচ্চ খাদককে সাধারণত অন্য কোনো প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। রোগ, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে সর্বোচ্চ খাদকদের মৃত্যু ঘটে। প্রকৃতিতে খাদ্য শৃঙ্খল তিন রকম হয়ে থাকে। যেমন—

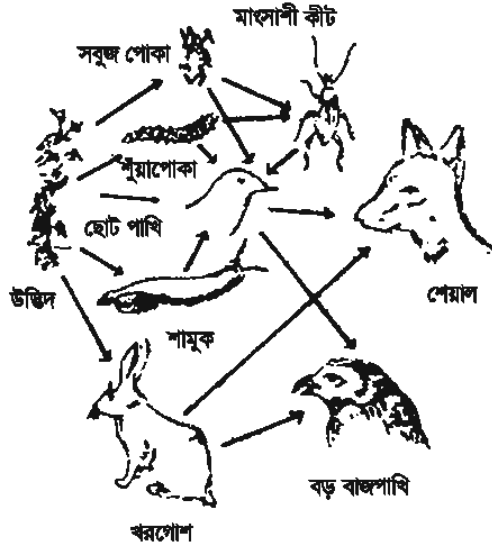
১। পরভোজী : উদ্ভিদ উৎস থেকে ক্রমে ছোট এবং বড় প্রাণীর মধ্যে গড়ে ওঠা খাদ্য শৃঙ্খলকে পরভোজী শৃঙ্খল বলে। উদ্ভিদ উৎস থেকে ক্রমে ক্রমে বড় প্রাণীর মধ্যে এ খাদ্য শৃঙ্খলটি গড়ে ওঠে। এমনি একটি পরভোজী খাদ্য শৃঙ্খল হচ্ছে : ঘাস—গরু—মানুষ।

২। পরজীবী শৃঙ্খল : বড় জীব থেকে শুরু করে ক্রমে ছোট জীবের মধ্যে পরজীবী ধরনের যে খাদ্য শৃঙ্খল গড়ে ওঠে তাকে বলে পরজীবী শৃঙ্খল। পরজীবীরা বিভিন্ন জীবের কোষ হতে খাদ্য আহরণ করে এমনি একটি পরজীবী শৃঙ্খল হচ্ছে : মানুষ—মশা—ম্যালেরিয়া জীবাণু।

৩। মৃতজীবী শৃঙ্খল : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের সঙ্গে বিভিন্ন অণুজীবের এবং প্রাণীর মধ্যে যে খাদ্য—শৃঙ্খল গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় মৃতজীবী শৃঙ্খল। মৃতজীবীরা বিভিন্ন মৃতদেহ হতে খাদ্য আহরণ করে। এমনি একটি মৃতজীবী শৃঙ্খল হচ্ছে : মৃতদেহ—ছত্রাক—কৈঁচো।

খাদ্য জাল

প্রকৃতিতে খাদ্য শৃঙ্খলগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। উৎপাদক থেকে শুরু করে খাদক পরস্পর যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে জটিল পথ অতিক্রম করে। একই উৎপাদক একই সঙ্গে একাধিক প্রথম স্তরের খাদকদের খাদ্যে পরিণত হতে পারে। আবার একই প্রাথমিক স্তরের খাদক একই সঙ্গে একাধিক দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খাদ্যে পরিণত হতে পারে। ফলে জীবসম্প্রদায়ে বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খল এক একটি খাদ্য জাল তৈরি করে।



চিত্র ২০.৩ : খাদ্য জাল



চিত্র ২০.৪ : বাস্তুসংস্থানের শক্তিপ্রবাহ

বাস্তুসংস্থানে শক্তির প্রবাহ

এ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীব সূর্যরশ্মি থেকে প্রাথমিকভাবে শক্তি পায়। যতটুকু রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছায় ক্ষেত্রভেদে তার মাত্র শতকরা ১-২ ভাগ কাছে লাগিয়ে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। যেসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তাদের মধ্যে সালোকসংশ্লেষণ অন্যতম। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জড় জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে সংযোগ ঘটে।

উৎপাদক উদ্ভিদ দেহ থেকে এই শক্তি বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। উৎপাদক থেকে শুরু করে প্রতিটি খাদ্য শৃঙ্খল কয়েকটি ধাপে সাজানো। উৎপাদক ও খাদকদের শ্বসন ও অন্যান্য বিপাক ক্রিয়ার সময় শর্করায় জমা থাকা স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। উৎপাদক হতে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শক্তি রূপান্তরের সময় শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়। উৎপাদকের দেহে আবদ্ধ শক্তি ভূগভোজী প্রাণীর দেহে যায়। সেখান থেকে যায় দ্বিতীয় স্তরের খাদকের দেহে। এভাবে শক্তির প্রবাহ চলে।

মানুষ বিভিন্ন খাদ্যচক্রের সঙ্গে জড়িত এবং সব সময়ই এর শেষ সদস্য। তবে মানুষের খাদ্যচক্র ছোট অথবা বড় হতে পারে। যেমন, শেওলা-চিহড়ি-ছোটমাছ-বোয়ালমাছ-মানুষ। এ চক্র লম্বা এবং এতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ অনুন্নত দেশের মানুষ নিরামিষ ভোজী। ফলে এ চক্র খুব ছোট হয়। যেমন, ধান (ভাত)-মানুষ এক খাদ্য স্তর থেকে অন্য স্তরে শক্তি প্রবাহকালে শ্বসন, তাপ উৎপাদন ইত্যাদি কারণে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়। খাদ্যচক্র ছোট হলে তাতে শক্তির ব্যয় সেই অনুপাতে কম হবে। সৌরশক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ প্রথম স্তরে যে পরিমাণ খাদ্য বা শক্তি উৎপাদন করে তা ক্রমাগত প্রতিস্তরে কিছু হারায়। আর সে জন্যই খাদ্যশৃঙ্খল যত ছোট হবে শক্তির অপচয় ততই কম হবে। যেমন-ঘাস তার দেহের বৃদ্ধির জন্য সূর্যরশ্মি থেকে সর্বোচ্চ দুই শতাংশ শক্তি আহরণ করতে পারে। তেমনিভাবে গরুর কলেবর বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ চার শতাংশ সৌরশক্তি গরুর দেহে যুক্ত হয়। এ নিয়ম থেকে বোঝা যায়, উৎপাদক থেকে যতই উপরের দিকে ধাপে ধাপে শক্তির স্থানান্তর ঘটে শক্তির অনুপাত ততই কমতে থাকে। শক্তির ক্রমহ্রাসের ফলে কোনো খাদ্যশৃঙ্খলে খাদকের সারির সংখ্যা খুব বেশি হয় না।

বিয়োজন ও শক্তিমুক্তকরণ

অব্যবহৃত খাদ্য (শক্তি) জীবদেহ হতে রেচন (বর্জ্য) পদার্থ হিসেবে অর্থাৎ রেচনজনিত শক্তি হিসাবে বের হয়। অবশেষে নানা কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে ও শক্তির অপচয় হয়। এই শক্তিকে বিনষ্ট শক্তি বলে। বিভিন্ন রূপান্তরকারী জীব কিংবা বিয়োজকরা বিভিন্ন সারির মৃতদেহ ও বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে।

এভাবেই বিভিন্ন ভূ-জৈব রাসায়নিক প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থের উপাদান যোগায়। যে কোনো খাদ্য শৃঙ্খলেই শক্তির স্থানান্তর বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি বাস্তুসংস্থানে সামগ্রিক অঞ্জিভেনের ব্যয় এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডের উৎস সরবরাহ সমান থাকে।

বাস্তুসংস্থানের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে বাস্তুসংস্থান প্রধানত দু'প্রকার :

১) স্থলজ বাস্তুসংস্থান এবং (২) জলজ বাস্তুসংস্থান। এছাড়া মানুষও নানা প্রকার কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান তৈরি করে থাকে।

নিচে উদাহরণসহ স্থলজ ও জলজ এবং কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান আলোচনা করা হল :

(অ) স্থলজ বাস্তুসংস্থান

এ বাস্তুসংস্থান আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন-ভূগর্ভমির বাস্তুসংস্থান, বনভূমির বাস্তুসংস্থান, মরুভূমির বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের বিখ্যাত গরান বনভূমি অর্থাৎ সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। খুলনা জেলার দক্ষিণের এই বনাঞ্চল বঙ্গোপসাগর থেকে অভ্যন্তরভাগের দিকে প্রায় ১.১২ কি.মি. প্রসারিত। জোয়ার-ভাটায় প্রভাবিত বনের মাটিতে লবণের পরিমাণ খুব বেশি থাকে। এখানকার মাটি ঐটেল ও কর্দমাক্ত হয়। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, গোলপাতা, কেওড়া, পসুর প্রভৃতি। প্রাণী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হরিণ, শূয়োর, বানর, বাঘ, কচ্ছপ, কুমির প্রভৃতি এবং মুরগি, বক, সারস, মাছরাঙ্গা ইত্যাদি পাখি। লবণাক্ত পরিবেশে জন্মায় বলে এখানকার উদ্ভিদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী নানা রকমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ রকম উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বসত অঞ্চল গরান বন বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হিসাবে পরিচিত।



চিত্র ২০.৫ : কয়েক প্রকার গরান উদ্ভিদ স্থানমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

গরান বনের উদ্ভিদ কাণ্ড থেকে অসংখ্য ঠেস মূল জন্মায় বলে জোয়ার-ভাটার টানে উদ্ভিদ মাটি উপড়ে পড়ে যায় না। এছাড়া কর্দমাক্ত মাটিতে বায়ু না থাকায় এসব উদ্ভিদের অনেক মূল মাটির নিচে না গিয়ে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এসব মূলের আগায় রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র যার মাধ্যমে উদ্ভিদ শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদেরকে শ্বাসমূল বলা হয়।

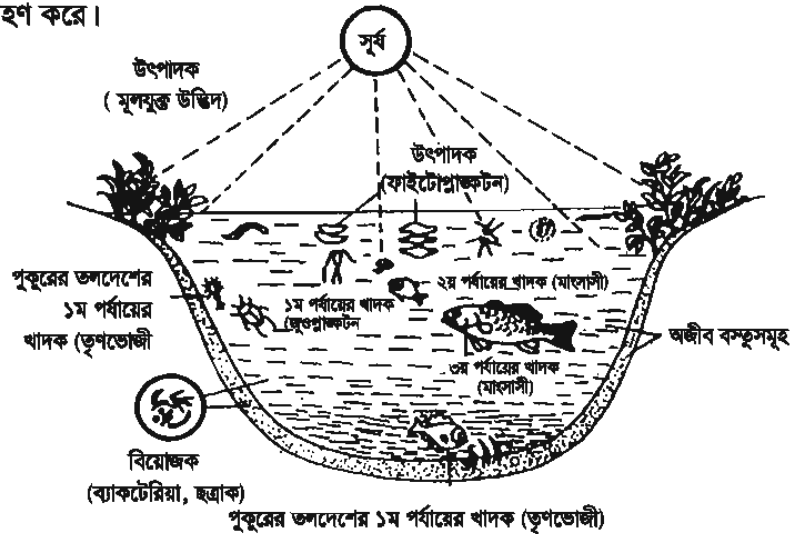
মাটিতে লবণের মাত্রা বেশি থাকায় একদিকে বীজ পচে যেতে পারে, অন্যদিকে জোয়ার-ভাটার টানে বীজ ভেসে যেতে পারে, তাই গাছে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। এতে চারা গাছ মাটিতে পড়েই বৃদ্ধি লাভ করে। এরূপ অঙ্কুরোদগমকে বলা হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম। সুন্দরী, গরান, গোলপাতা ও নানা ধরনের উদ্ভিদ হচ্ছে উৎপাদক। পোকামাকড়, মুরগি, পাখি, হরিণ হচ্ছে প্রথম সারির খাদক। বাঘ, কুমির হচ্ছে তৃতীয় সারির খাদক। তবে এদের মধ্যে শূয়োর, বানর, সারস হচ্ছে সর্বভুক।

(আ) জলজ বাস্তুসংস্থান

জলজ বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধে সূষ্ঠা ধারণা লাভের জন্য পুকুর সবচেয়ে উপযোগী কেননা পুকুরের বাস্তুসংস্থানে সংঘটিত যাবতীয় ক্রিয়া বিক্রিয়ায় উৎপাদিত বস্তু প্রায় সবই পুকুরের পানি ও তলদেশে থাকে, শুধু বায়বীয় আকারে পানির উপরিভাগ থেকে কিছু পদার্থ বাইরে চলে যায়। আবার বাইরে থেকে বায়বীয় ও বৃষ্টিপাতের ফলে কিছু যোগ হয়। এতে পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিবিড় সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। তাই এ বাস্তুসংস্থানে পরিবর্তন হলে অথবা কিছু ঘটলে তা ভালোভাবে জানা যায়, যা স্থলজ বাস্তুসংস্থানে সহজে সম্ভব হয় না। জলজ বাস্তুসংস্থানকে আবদ্ধ বাস্তুসংস্থানও বলা হয়।

পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে ভাসমান ও সঞ্চারণমান ক্ষুদ্র জীব, অর্থাৎ প্রাজকটন। প্রাজকটন জাতীয় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকে উদ্ভিদ প্রাজকটন এবং আণুবীক্ষণিক প্রাণীকে জুয়োপ্রাজকটন বলা হয়। এছাড়াও আছে সবুজ শেওলা ও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী। এর জড় উপাদানগুলো হচ্ছে মাটি, পানি, সৌরশক্তি ইত্যাদি।

পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক হচ্ছে সাধারণত ভাসমান ও অগভীর পানির নানা ধরনের উদ্ভিদ, যেমন শাপলা, কচুরিপানা, হাইড্রিলা ফাইটোপ্রাজকটন ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার ভাসমান ক্ষুদ্রপোকা, জুয়োপ্রাজকটন মশার শূককীট প্রভৃতি প্রথম স্তরের খাদক। দ্বিতীয় স্তরের খাদক প্রধানত মাংসাশী। এরা প্রাথমিক খাদকদের ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন ছোট মাছ, জলজ পতঙ্গ, চিহড়ি, ব্যাঙ ইত্যাদি। বড় মাছ, বক, গাংচিল প্রভৃতি হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক। মৃত্যুর পর একই নিয়মে মৃতজীবী ছত্রাক, জীবাণু, এমনকি পুকুরের তলায় কাদার মধ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও বিয়োজকের কাজ করে। সাধারণ নিয়মে বিয়োজিত অজৈব লবণগুলো আবার পুকুরের উৎপাদক সম্প্রদায় খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে।



চিত্র ২০.৬ : পুকুরের বাস্তুসংস্থান

(ই) কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান : প্রকৃতি ও মানব পরিবেশের জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রতিপালনের যে ব্যবস্থা করেছেন তাকেই বলা হয় কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—একোয়ারিয়াম, চন্দ্রযান ইত্যাদি। শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যবহার ছাড়াও বাসাবাড়ি ও অফিসে ছোট বড় একোয়ারিয়ামে সৌন্দর্য ও মনোরঞ্জননের জন্য বিশেষ ধরনের মাছ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশালাকার একোয়ারিয়াম তৈরি করে তাতে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সামুদ্রিক মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, যা প্রতিদিন শত সহস্র লোক দেখে থাকে।

কাচের তৈরি এ সব একোয়ারিয়ামে সাধারণত পানি, বিশেষ ধরনের কিছু জলজ উদ্ভিদ ও পোকামাকড় এবং অজৈব উপাদান ছাড়াও এতে আলোকশক্তি নিয়মিতভাবে বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে মাছ প্রতিপালন করা হয়। তাই এতে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের যাবতীয় স্বাভাবিক সরবরাহ ও কার্যধারা সংঘটনের ব্যবস্থা নেই। কৃত্রিম উপায়ে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলেও এতে স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থানের মতো বস্তুর পুণঃজাতকরণ ও বিয়ক্রিয়া দূরীকরণ, পুনঃবিয়োজন এবং শক্তি প্রবাহের স্বাভাবিকতা নেই। এরূপ একটি বাস্তুসংস্থানকেই কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান বলা হয়।

অণুবাস্তুসংস্থান : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে মহাকাশ গবেষণা, চন্দ্রাভিযান, মহাশূন্যে স্টেশন স্থাপন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন মহাশূন্যযান। যেমন—সমুজ, স্পুটনিক, চন্দ্রযান, খেয়াযান, ডিসকভারি, এন্ডেভার প্রভৃতিতে আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে এগুলোর প্রায় সবই ছিল মাত্র কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহের স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে নির্মিত। এগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থকে স্বল্পকালের জন্য যান্ত্রিকভাবে দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল, যা দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের জন্য উপযোগী নয়।

মহাশূন্যে অবস্থান এবং গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণের কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উপযোগী স্বয়ংক্রিয় বাস্তুসংস্থান সম্বলিত মহাশূন্যযান ও মহাশূন্য স্টেশনের প্রয়োজন হবে। নভোচারীদের ধারণকারী এরূপ একটি কৃত্রিম স্বয়ংক্রিয় পরিবেশকে বলা হয় অণুবাস্তুসংস্থান। মহাশূন্য গবেষণার এরূপ যান তৈরিতে ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

পরিবেশের ভারসাম্য

বাস্তুসংস্থানের শক্তির উৎস সূর্য। এ উৎস হতে শক্তি উৎপাদকের অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের দিকে প্রবাহিত হয়। উৎপাদক হতে তা ক্রমানুসারে উচ্চ শ্রেণীর খাদকের কাছে যায়। খাদকদের দেহ হতে শক্তি পরিবেশের মুক্ত হয়। শক্তি প্রাথমিক উৎসের কাছে ফিরে যায় না। অর্থাৎ বাস্তুসংস্থানে শক্তি প্রবাহ একমুখী।

বাস্তুসংস্থান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। এতে জীবগুলো পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য খাদক শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। এ জন্য কোনো জীবই সংখ্যায় বেশি বাড়তে পারে না। আবার সহজে নির্মূল হয়েও যায় না। সব সময় বিভিন্ন স্তরের জীব সংখ্যায় আপেক্ষিক অনুপাতের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

প্রকৃতিতে নানা রকম পরিবর্তন ঘটলেও সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেই বাস্তুসংস্থানের অন্যান্য জীবের সংখ্যা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে শীঘ্রই বাড়তি জীবের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে আবার পূর্বের মতো অবস্থায় ফিরে আসে।

উদাহরণস্বরূপ, হঠাৎ কোনো কারণে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেখানে হরিণের সংখ্যা বাড়বে না বরং তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। ফলে হরিণের (খাদ্যের) পরিমাণ হতে বাঘের (খাদকের) পরিমাণ অনেক বেশি হবে।

তখন খাদ্য (হরিণ) না পেয়ে অনেক খাদক (বাঘ) মারা যাবে। এভাবে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। আবার কোনো কারণে বনে বাঘের সংখ্যা হঠাৎ কমে গেলে হরিণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু বনে হরিণের চারণভূমি সীমিত। সে জন্য বনে বাড়তি খাদ্যের অভাবে বহু হরিণ মারা যাবে। এভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে বাস্তুসংস্থানে খাদ্য-খাদকের পরিমাণ বা সংখ্যায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাব

মানুষ বুদ্ধি বলে প্রকৃতি থেকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করে নিচ্ছে। রোগ ব্যাধিকে জয় করার মাধ্যমে সে বংশবিস্তার করে চলেছে দ্রুতগতিতে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিত্যনতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রসারিত হয়েছে প্রকৃতির ওপর। উদ্ভিজ্জ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে; মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়েই চলেছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে আবহাওয়ার ওপর। মানুষের নিত্যনতুন চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে সে যথেষ্টভাবে ব্যবহার করে চলেছে। বনজঙ্গল, পাহাড়ের গা ও মরুভূমিতে চাষাবাদ করেও বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। কৃত্রিম সার প্রয়োগসহ একই জমিতে বছরে তিনবার ফসল ফলানো হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কৃষি বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পানি দূষিত হচ্ছে। ফলে মিষ্টি পানির মাছ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের দেহে ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশ করছে। শাক-সবজি, মাছ-মাংসের মাধ্যমে প্রবেশ করছে মানব দেহে। এভাবে মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলও কলুষিত ও বিষাক্ত হচ্ছে। তাই সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবেশকে ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কেননা আমাদেরকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আদর্শ পরিবেশ উপহার দিতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক কোনটি?

- ক. জুয়োগ্লাঙ্কটন
- খ. ফাইটোপ্লাঙ্কটন
- গ. ছত্রাক
- ঘ. জীবাণু।

২। কোনটি দ্বিতীয় স্তরের খাদক?

- ক. ছাগল
- খ. নেকড়ে
- গ. কুমির
- ঘ. দোয়েল।

৩। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাদৃশ্য সম্পন্ন জীব সম্প্রদায় একত্রে সুসংহত হয়ে গড়ে তোলে—

- (i). বাস্তুসংস্থান
- (ii). খাদ্যজাল
- (iii). বায়োম

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪। নিচের কোন খাদ্য শৃঙ্খলাটি সঠিক?

- ক. মানুষ → শস্য → গাবিদপশু।
 খ. ব্যাঙ → সাপ → ঈগল
 গ. স্থলজ উদ্ভিদ → খরগোশ → বাঘ
 ঘ. ছোট মাছ → জলজ কীটপতঙ্গ → বড় মাছ।

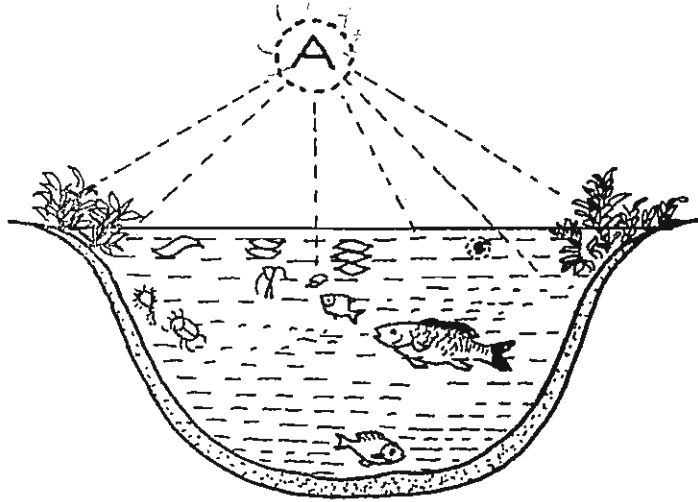
৫। জীব ও জড় পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হওয়ার কারণ-

- (i). নদী হতে শুধুমাত্র এক প্রজাতির মাছ আহরণ
 (ii). ফসলের মাঠে অত্যধিক সার প্রয়োগ
 (iii). শিল্প-কারখানার গরম পানি নদীতে ফেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
 খ. ii
 গ. ii এবং iii
 ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



উপরের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. A চিহ্নিত অংশটির নাম কি?
 খ. খাদক ও বিয়োজকের মধ্যে পার্থক্য কী?
 গ. ফাইটোপ্লাঙ্কটন না থাকলে চিত্রের বাস্তুসংস্থানের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?
 ঘ. পুকুরের বাস্তুসংস্থান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক-বিশ্লেষণ কর।

একবিংশ অধ্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতি সাধন করে থাকে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থিতিই এসব দুর্যোগের অন্যতম কারণ। নদীমাতৃক, প্রায় সমতল এদেশটির উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের উৎস হয় ভারতে না হয় নেপালে। দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলা বা এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই, যা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে হিমালয়ে পুঞ্জীভূত বরফগলা পানি নিচে নামতে শুরু করলে অথবা অতিবৃষ্টি হলে আমাদের দেশে বন্যা হয়ে থাকে। অপরদিকে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ থাকাসহ অন্যান্য কারণে সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হচ্ছে।

তাই আমাদের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিপর্যয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। দুর্যোগ হচ্ছে এরূপ ঘটনা, যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এ ক্ষতি মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে বাইরের সাহায্য বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিপর্যয় (Hazard) বলতে বুঝানো হয়েছে কোনো এক আকস্মিক ও চরম প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট ঘটনাকে। এ ঘটনা জীবন, সম্পদ ইত্যাদির ওপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে পরবর্তীতে দুর্যোগ (Disaster) এর সৃষ্টি করতে পারে।

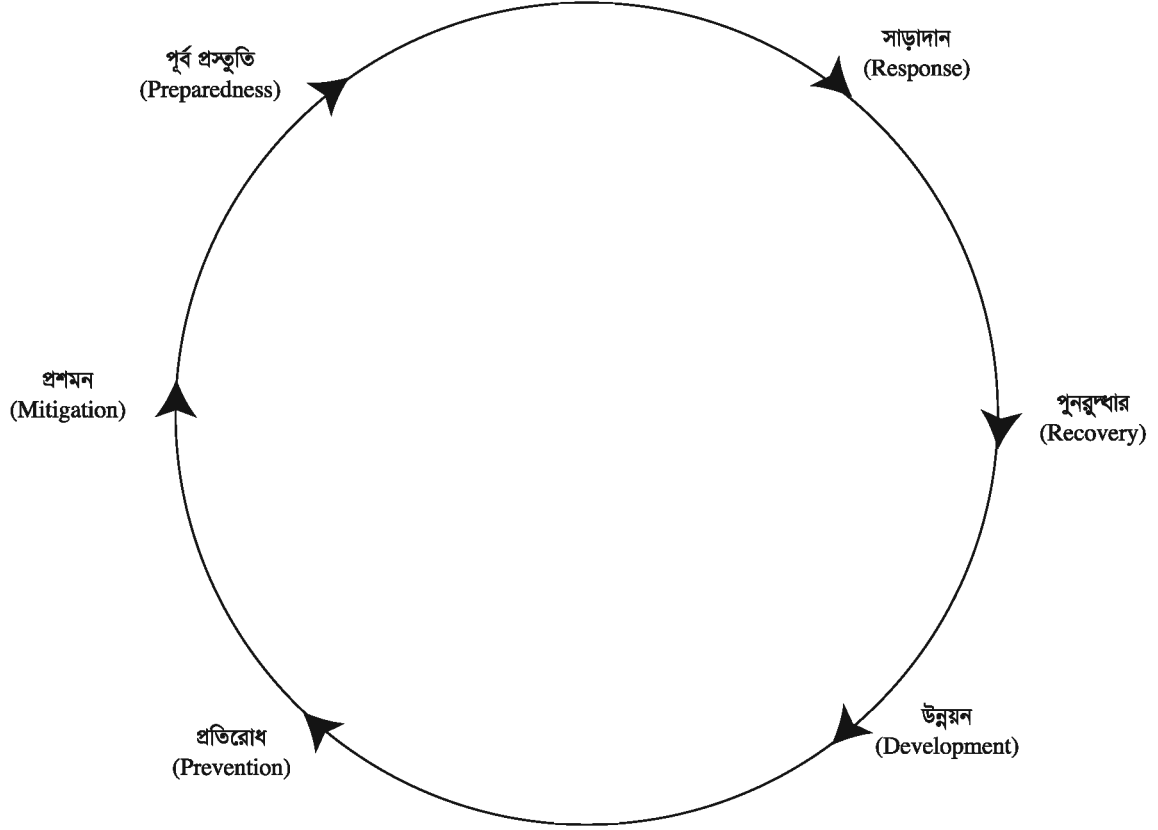
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ, যা প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়সমূহের কার্যক্রমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার আওতায় পড়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে কাজ করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সম্ভাব্য দুর্যোগ সংঘটন কমানো এবং এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আসন্ন দুর্যোগের বিষয়ে সতর্ক সংকেত প্রচারের ব্যবস্থাাদি প্রস্তুত রাখা, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অবস্থাাদি সর্বদা পরীক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হল তিনটি :

ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানোর বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস, করা,

খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং

গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বুঝায়। নিচে প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ ও দুর্যোগের কোন স্তরে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হল :



অতীতে দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনাকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে মনে করা হত। বস্তুত ত্রাণকার্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান মাত্র। ওপরের চক্রে দেখা যাচ্ছে যে, দুর্যোগপূর্ব কার্যকলাপে যেমন- দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। এসব উপাদানের সার্বিক বাস্তবায়ন দুর্যোগ সংঘটনের পূর্বে নিশ্চিত করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এর যে কোনোটি অসম্পন্ন থাকলে গোটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দেবে। সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাড়া দান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। অতীতে দুর্যোগে সাড়া দানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হত। সাড়া দান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়া দানের প্রয়োজন হয়। সাড়া দান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বুঝায়।

দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বুঝায়। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই ঐ এলাকায় উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে এলাকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর লক্ষ রাখতে হবে। যদিও বাংলাদেশ একটি প্রায় সমভূমি অঞ্চল, তথাপি এর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তোলা বা অন্যান্য দ্বীপসমূহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ইত্যাদি খরাপ্রবণ অঞ্চল। এ দুটি বৈশিষ্ট্য সামনে রেখে আমরা যদি সরকারি ভবনসমূহ যেমন-থানা প্রশিক্ষণ ও

উন্নয়ন কেন্দ্র, স্কুল ভবন এবং সরকারি অফিসাদি নির্মাণ করি তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজন যথাযথভাবে নির্মিত এসব ভবনকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারকে পৃথকভাবে ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে না। সুতরাং উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে এলাকাভিত্তিক ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সুফল বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের কাঠামোগত (Structural) এবং অকাঠামোগত (Non-Structural) প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যথা- বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকেই বুঝায়। কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন খুবই ব্যয়বহুল, যা অনেক দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এতে এককালীন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে সরকার দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো জুন, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার লোককে দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দেশের সকল শ্রেণীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর অন্তত দুই ঘণ্টার একটি অধিবেশন রাখাও আবশ্যিক করা হয়েছে। জেলা ও থানা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা সরকারি সফরে গ্রামাঞ্চলে গেলে সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর জনসাধারণের নিকট অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করার জন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের এই দরিদ্র দেশে দুর্যোগের অকাঠামোগত প্রতিরোধের ব্যাপারে জোরালো এবং অর্থবহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাসের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলা হয়। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ প্রশমন ব্যয়বহুল হলেও সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বুঝায়। আগের থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল (Drill) বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু আমাদের দেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল, সেহেতু দুর্যোগ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছি। এ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি সর্থাংশই সকলের অবশ্যই পালনীয়। এতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী সময়ের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্ব এবং বিভিন্ন দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট আটটি কমিটি এবং ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। জাতীয় পর্যায়ে এসব কমিটি হল :

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাউন্সিলের সভাপতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী/বর্গ, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এ কাউন্সিলের সদস্য। এ কাউন্সিলের প্রধান কাজ হল দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

খ) **আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানগণ কমিটির সদস্য। কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন এবং কাউন্সিলকে যথাযথ পরামর্শদান ইত্যাদি।

গ) **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি** : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ/ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সাহায্যদাতা সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে দুর্যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, রেডক্রিসেন্ট ও চেম্বার অব কর্মাস এর চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রেসিডেন্ট, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, এসোসিয়েশন, কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমিটির সদস্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটি প্রধানত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে প্রজ্ঞানীয় পরামর্শ দেবে। সংঘটিত দুর্যোগসমূহের মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের পোস্টমর্টেম ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে কমিটি সরকার ও বিভিন্ন কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

ঘ) **ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বোর্ডের সভাপতি। তাছাড়া মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ‘স্পারসো’ এর চেয়ারম্যান, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বোর্ডের সদস্য রয়েছেন এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এর পরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং যথসময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

ঙ) **দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ‘ফোকাল পয়েন্ট’দের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক সমন্বয়কারী দলের সভাপতি। স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রভৃতি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক, ‘স্পারসো’ এর চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের প্রধানগণ দলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর পরিচালক (পরিকল্পনা) দলের সদস্য সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত। সমন্বয়কারী দলের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন বিভাগের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন, বিভিন্ন বিভাগের দুর্যোগ বিষয়ক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এ সবার সম্ভাব্য সমস্যা ও প্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায় সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুদ রাখার ব্যাপারেও আলোচনা করা।

চ) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক টাস্কফোর্স এর সভাপতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজ করে, তারা ঐ টাস্ক ফোর্সের সদস্য। টাস্ক ফোর্স এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বিষয়ক পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা।

ছ) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক এ কমিটির সভাপতি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রধানগণ কমিটির সদস্য। কমিটির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন, সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার দ্বৈততা পরিহার এবং পরিকল্পিত উপায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা।

জ) **দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি** : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক এ কমিটির সভাপতি। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণসংযোগ অধিদপ্তর, ফিল্ম ও পাবলিসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, বন্যা পূর্বাভাসের পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক এবং ‘স্পারসো’ এর চেয়ারম্যান কমিটির সদস্য। কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা এ ব্যাপারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় পর্যায়ে আটটি কমিটি ছাড়াও দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ রয়েছে :

অ) **জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি** : সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কমিটির সভাপতি। জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের প্রধানগণ, ঐ জেলার থানা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এ কমিটির সদস্য-সচিব। কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা, জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং দুর্যোগকালে উপযুক্ত সাড়াদানসহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

আ) **থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি** : সংশ্লিষ্ট থানার থানা নির্বাহী অফিসার এ কমিটির সভাপতি। থানার সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, থানায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও আধাসরকারি দফতরসমূহের প্রধানগণ, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি, থানায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি কমিটিতে সদস্য রয়েছেন। থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিব। কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে থানায় অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং ঐ কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান এবং সক্রিয়করণ। প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম ছাড়াও দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগকালে উপযুক্ত সাড়াদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

ই) **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি** : সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ কমিটির সভাপতি। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়নে কর্মরত শিক্ষক প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখ কমিটিতে সদস্য রয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি কমিটির সদস্য সচিব। কমিটির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগকালে উপযুক্ত সাড়াদান ইত্যাদি।

দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে ও দুর্যোগপরবর্তী সময়ে সারাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/দপ্তরের বহুমুখী বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারি দফতরের প্রয়োজনীয়তা দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হতে থাকে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের মারাত্মক বন্যা এবং ১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে বিষয়টি আরও প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, দুর্যোগ ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা ও সেবা কার্যের

ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ব্যুরো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে আসছে। সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব ব্যুরোর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়কের ভূমিকায় ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি’ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। সংগঠনটি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদান, যোগাযোগ রক্ষা, প্রস্তুতি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় উপকূলীয় জেলাসমূহে বত্রিশ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজ এবং ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত যোগাযোগের ব্যাপারে খুবই প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল সময়মত আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দফতর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার জন্য সরকারি আর একটি সংস্থা হচ্ছে ‘স্পারসো’। ‘স্পারসো’ ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহ করে, রাডার চিত্র নিয়ে অঙ্কন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। যদিও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো কলাকৌশল অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি, তথাপি রিকটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্তদের চিকিৎসা, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিভিবি, বিডিপিসি (বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুত কেন্দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যক্রম যেমন-উন্নয়ন, প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রস্তুতি ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়েই অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় সফলভাবে পরিচালিত করলে দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করতে সক্ষম হব। তাই যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে আমাদেরকে দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত আপদকালীন পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে তৈরি করে অনুশীলনের মাধ্যমে এ সবার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে ধারণা, নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া এবং কিল্লাসমূহে গবাদি পশু প্রেরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, শুকনা খাবার, পানীয়জল, দিয়শলাই ও মোমবাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখার বিষয়গুলো আমাদের জেনে রাখা আবশ্যিক। ইউনিয়ন, থানা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও এগুলোর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার পদ্ধতি এবং দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা পূর্বাঙ্কেই তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের মনে রাখা উচিত, আগে থেকে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকলেই যে কোনো বিপদের যথাযথ মোকাবিলা করা সম্ভব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ কোনটি?

- ক. গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া।
- খ. দেশের ভৌগোলিক অবস্থান।
- গ. উত্তরের বিশাল পর্বতমালা।
- ঘ. দক্ষিণে বিশাল পাহাড় না থাকা।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করার গুরুত্বপূর্ণ উপায় কী?

- ক. দুর্যোগের ওপর গণসচেতনতা বৃদ্ধি।
- খ. দুর্যোগ প্রশমনে কর্মপরিকল্পনা তৈরি।
- গ. পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ।
- ঘ. অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ।

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায়—

- i. দুর্যোগ সংঘটনের পরে ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনা।
- ii. দুর্যোগ পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরি।
- iii. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং এ সংক্রান্ত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে গ্রহীত কার্যক্রম।

নিচের কোন সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ প্রশমনের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে নিচের কোন বিষয়টির প্রতি সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে?

- ক. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যায় তার ওপর।
- খ. কতগুলো আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা যায় তার ওপর।
- গ. কত সংখ্যক মানুষ ঐ এলাকায় বসবাস করে তার ওপর।
- ঘ. এলাকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর।

৫। মহাবিপদ সংকেত পেয়ে মনু মিয়াসহ কয়েকজন জেলে সমুদ্র থেকে দ্রুত নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। অতঃপর ফিরে এসে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের কী ধরনের প্রস্তুতি নেয়া উচিত—

- ক. তাড়াতাড়ি আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া।
- খ. প্রয়োজনীয় পানীয় ও শূকনো খাদ্য সংরক্ষণ করে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া।
- গ. ঘরবাড়ি মেরামতে ব্যস্ত থাকা যাতে এগুলোর ক্ষতি না হয়।
- ঘ. ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ঘরে অবস্থান করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

কক্সবাজার সদর থানার সমুদ্র তীরবর্তী একটি গ্রামে অপূদের বাড়ি। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে অপূদের গ্রামসহ সমগ্র কক্সবাজার সংলগ্ন উপকূল এলাকায়। কিন্তু অপূদের পরিবার এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায়। সে এলাকার একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে দুর্যোগ মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে শিখেছিল এবং সে অনুযায়ী অন্যান্য পূর্বপ্রস্তুতিসহ নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল।

- ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে?
- খ. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক কী?
- গ. আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া ছাড়াও আর কোন কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল বলে অপূর পরিবার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়?
- ঘ. দুর্যোগ প্রশমনে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।



সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্মক্ষমতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য